আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে মানবপ্রেম ও বিজ্ঞানচেতনা

পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক
ড. কাজী নূরুল ইসলাম
অধ্যাপক
বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
অধ্যাপক ফেরদৌসী বেগম
পি-এইচ.ডি. গবেষক
বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

448528
Dhaka University Library
448528

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সেপ্টেম্বর-২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, 'আরজ আলী মাতুব্বরের মানবপ্রেম ও বিজ্ঞান চেতনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। পি-এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

448528

পি-এইচ.ডি গবেষক
ফেরদৌসী বেগম
রেজিঃ নং- ০২
শিক্ষাবর্ষ- ২০০৬-২০০৭
বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা
বিশ্ব

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ফেরদৌসী বেগম কর্তৃক পি-এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য রচিত 'আরজ আলী মাতুব্বরের মানবপ্রেম ও বিজ্ঞান চেতনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধায়নে তার এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে তিনি এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নাই।

448528

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

১৬.১.০৯

(অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম)
বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়: পৃষ্ঠা সংখ্যা

প্রথম অধ্যায়

১.	**আরজ আলী মাতুব্বর ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে মানবতাবাদ**	১-৭৭
১.১	আরজ আলী মাতুব্বর ও প্রাচীন যুগের মানবতাবাদ	৬
১.২	আরজ আলী মাতুব্বর ও আধুনিক যুগের মানবতাবাদ	৩১
১.৩	আরজ আলী মাতুব্বর ও সমকালীন মানবতাবাদ	৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.	**আরজ আলী মাতুব্বর ও সমকালীন বাংলাদেশ**	৭৮-১৩৬
২.১	আরজ আলী মাতুব্বর ও বেগম রোকেয়া	৭৯
২.২	আরজ আলী মাতুব্বর ও মানবেন্দ্রনাথ রায়	৯৭
২.৩	আরজ আলী মাতুব্বর ও কাজী নজরুল ইসলাম	১১৩

তৃতীয় অধ্যায়

৩.	**আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মানবতাবাদ**	১৩৭-১৭২

চতুর্থ অধ্যায়

৪.	**আরজ আলী মাতুব্বর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদ**	১৭৩-২০৬

পঞ্চম অধ্যায়

৫.	**আরজ আলী মাতুব্বর ও গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মানবতাবাদ**	২০৭-২২৯
৬.	উপসংহার	২৩০-২৫৬
৭.	গ্রন্থপঞ্জি	২৫৭-২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন হতেন। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। তিনি রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয় সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন, বিজ্ঞানীরাই চাঁদের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বর মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন যুক্তিবাদী কথার বিপরীতে উপহার পেয়েছিলেন হাজতবাস।

আরজ আলী মাতুব্বর অনুভব করেন, যুগ যুগ ধরে মানুষের অন্ধবিশ্বাসের কাছে কোনো যুক্তি স্থান পায় না, পরাজিত হয় মানুষের মানবিক আশা আকাঙ্খা, আন্তরিক ইচ্ছাবোধ, উপেক্ষিত হয় ব্যক্তি চাহিদা। এ ঘটনা থেকে আরজ আলী মাতুব্বরের বোধের যে উন্মেষ ঘটে তা ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে। জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করার প্রত্যয় নেন মানুষকে যুক্তিবাদী হিসেবে গড়ে তোলার। সে লক্ষ্যে তিনি গ্রামে একটি লাইব্রেরীও স্থাপন করেছিলেন। ধর্মের সাথে যুক্ত উদ্ভট ও অলৌকিক কাহিনীগুলোকে উপড়ে ফেলতে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি।

কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনায় আঘাত করে মুক্তচিন্তার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা ছিল তাঁর সংকল্প। তিনি সংলাপের ভঙ্গিতে যুক্তি, যুক্তি-খণ্ডন ও নতুন যুক্তি প্রয়োগ করে এক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর রচনায়। সমাজের অচলায়তনে তাঁর রচনায় এক একটি বাক্য হয়েছে এক একটি আঘাত। তাই সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব অস্বীকার করার অপেক্ষা রাখে না। আজকের সমাজের এ অস্থিরতায় আরজ আলীর দর্শন-চর্চা তথা মানবতাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ আশাবাদী ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করা যায়, যা বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কল্যাণার্থে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে। আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে মানবপ্রেম ও বিজ্ঞানচেতনার যৌক্তিক বিতর্ক অত্যন্ত আকর্ষণীয় যা গভীর মনোযোগের দাবি রাখে। অথচ এ পর্যন্ত তাঁর মানবতাবাদী দিকের উপর কোনো বিচার-বিশ্লেষণমূলক তেমন উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এ কারণে আমার এ গবেষণার সূত্রপাত। গবেষণায় দেখানো হয়েছে আরজ আলী মাতুব্বরের মধ্যে একটি বস্তুবাদী মানবিক দিক রয়েছে যা ভাববাদ থেকে স্বতন্ত্র।

এ অভিসন্দর্ভটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিবরণমূলক ও বিচার-বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের লেখার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং পাশ্চাত্য ও সমকালীন মানবতাবাদী দার্শনিকদের সাথে তাঁর দর্শন বিচার-বিশ্লেষণের সাথে মূল্যায়ন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভে আরজ আলী মাতুব্বরের বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গিসহ মানবতাবাদী দর্শনের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে, প্রাচীন গ্রিসে থেলেস থেকে শুরু করে প্লোটিনাস প্রমুখ দার্শনিকগণ বৈজ্ঞানিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বমানবের উৎপত্তি ও মানুষের মানবিক মর্যাদার লক্ষ্যে যুক্তি স্থাপন করেছেন; মানুষের জীবনের স্বাধীনতার মর্যাদার গুরুত্ব দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীতে আরজ আলী মাতুব্বরও গ্রিস দর্শনের সূত্র ধরে যৌক্তিক চিন্তা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের যে জীবন দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তাঁর চিন্তাধারার যৌক্তিক মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈতিক ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর দর্শনের তাত্ত্বিক দিকের চেয়ে প্রায়োগিক দিকের গুরুত্বই বেশি গ্রহণযোগ্য। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে বেকন, ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ, লক, হিউম যেমন মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জ্ঞান চর্চার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদসহ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের দর্শন প্রায়োগিক দর্শন – যার প্রতিফলন আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনেও পরিলক্ষিত হয়। আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের বিশৃঙ্খলা ও অসাম্প্রদায়িকতার জন্য মানুষকে দায়ী করেছেন। তিনি যুক্তির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনার করুণ চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরে তা থেকে অবসানের পথও নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর মতে সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদ হচ্ছে বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানের একমাত্র মাধ্যম। সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের মার্কস, রাসেল, সার্ত্রে প্রমুখ দার্শনিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জীবনমুখিতা। সমকালীন যুগে দর্শনকে মানুষের প্রয়োজনে এবং মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করার কথা বলা হয়। তাঁরা সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা বলেন। তাঁদের দর্শনে বিজ্ঞানের প্রতি অধিকতর ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। আরজ আলী মাতুব্বর মানুষের সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে থেকে মানবিক দিকটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং মানবিক মূল্যবোধ ব্যতিরেকে সবকিছুই তিনি প্রতিহত করতে চেয়েছেন।

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুসন্ধান করা হয়, সমকালীন বাংলাদেশের সমাজ সংস্কারক, দার্শনিক, বেগম রোকেয়া, এম.এন রায় এবং কাজী নজরুল ইসলামের, মতো ব্যক্তিত্ব – যাঁরা নতুন স্বাধীন সমাজ গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে সাম্যতা বজায় রেখে যাঁদের আচরণ ছিল যুক্তিনির্ভর ও নীতিসম্মত, আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন নিঃসন্দেহে তাঁদের সফল উত্তরসূরি। তাঁদেরই মতো আরজ আলী মাতুব্বর সমগ্র বিশ্বকে এক মানবতাবাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ দেখতে চেয়েছিলেন। অভিসন্দর্ভে এভাবে তাঁর মানবতাবোধের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে অক্ষয়কুমার দত্তের মানবতাবাদের তুলনার সংগে ধর্মকে যুক্তিনিষ্ঠ ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে সমীকরণের সাহায্যে প্রার্থনার অসারতা প্রমাণ করে মানবিক মর্যাদর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তেমনি একইভাবে আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনেও মানবতাবাদের নিদর্শন

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে, প্রাচীন গ্রিসে থেলেস থেকে শুরু করে প্লোটিনাস প্রমুখ দার্শনিকগণ বৈজ্ঞানিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বমানবের উৎপত্তি ও মানুষের মানবিক মর্যাদার লক্ষ্যে যুক্তি স্থাপন করেছেন; মানুষের জীবনের স্বাধীনতায় মর্যাদার গুরুত্ব দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীতে আরজ আলী মাতুব্বরও গ্রিস দর্শনের সূত্র ধরে যৌক্তিক চিন্তা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের যে জীবন দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তাঁর চিন্তাধারায় যৌক্তিক মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈতিক ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর দর্শনের তাত্ত্বিক দিকের চেয়ে প্রায়োগিক দিকের গুরুত্বই বেশি গ্রহণযোগ্য। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে বেকন, ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ, লক, হিউম যেমন মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জ্ঞান চর্চার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, ব্যক্তিস্বাত্ন্ত্র্যবাদসহ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের দর্শন প্রায়োগিক দর্শন – যার প্রতিফলন আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনেও পরিলক্ষিত হয়। আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের বিশৃঙ্খলা ও অসাম্প্রদায়িকতার জন্য মানুষকে দায়ী করেছেন। তিনি যুক্তির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনার করুণ চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরে তা থেকে অবসানের পথও নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর মতে সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদ হচ্ছে বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানের একমাত্র মাধ্যম। সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের মার্কস, রাসেল, সার্ত্রে প্রমুখ দার্শনিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জীবনমুখিতা। সমকালীন যুগে দর্শনকে মানুষের প্রয়োজনে এবং মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করার কথা বলা হয়। তাঁরা সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা বলেন। তাঁদের দর্শনে বিজ্ঞানের প্রতি অধিকতর ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। আরজ আলী মাতুব্বর মানুষের সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে থেকে মানবিক দিকটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং মানবিক মূল্যবোধ ব্যতিরেকে সবকিছুই তিনি প্রতিহত করতে চেয়েছেন।

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুসন্ধান করা হয়, সমকালীন বাংলাদেশের সমাজ সংস্কারক, দার্শনিক, বেগম রোকেয়া, এম.এন রায় এবং কাজী নজরুল ইসলামের, মতো ব্যক্তিত্ব – যাঁরা নতুন স্বাধীন সমাজ গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে সাম্যতা বজায় রেখে যাঁদের আচরণ ছিল যুক্তিনির্ভর ও নীতিসম্মত, আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন নিঃসন্দেহে তাঁদের সফল উত্তরসূরি। তাঁদেরই মতো আরজ আলী মাতুব্বর সমগ্র বিশ্বকে এক মানবতাবাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ দেখতে চেয়েছিলেন। অভিসন্দর্ভে এভাবে তাঁর মানবতাবোধের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে অক্ষয়কুমার দত্তের মানবতাবাদের তুলনার সংগে ধর্মকে যুক্তিনিষ্ঠ ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে সমীকরণের সাহায্যে প্রার্থনার অসারতা প্রমাণ করে মানবিক মর্যাদর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তেমনি একইভাবে আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনেও মানবতাবাদের নিদর্শন

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়। তাঁর দর্শন বিশ্লেষণে বিজ্ঞানভিত্তিক সত্যজ্ঞানের অনুসন্ধান করে ধর্মাচারের অসারতা প্রমাণের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। এভাবে আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে বাঙালি জাতিকে নতুন চিন্তা-চেতনা, মত ও পথের ইত্যাদি সব দিক থেকে নির্মাণ করার এক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রচেষ্টার অনুসন্ধান পাওয়া যায়। অক্ষয় কুমার দত্তের মতো আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী পুরুষ। অভিসন্দর্ভের ধর্ম চিন্তার ক্রমঅভিব্যক্তিতে তাঁর দর্শন সরাসরি প্রকৃতিবাদী ও নিরীশ্বরবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে হিতবাদী হিসেবে আরজ আলী মাতুববরকে দেখানো হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো, আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনেও হিতবাদী দর্শনকে অনুসন্ধান করা হয়েছে। হিতবাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য হলো মানব স্বীকৃতি। হিতবাদী আন্দোলনের আদর্শ হলো, শাস্ত্রীয় কুসংস্কার অনাচার ও অবাঞ্ছিত দেশাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করা এবং সেই সঙ্গে সামাজিক নিপীড়ন ও সাধারণ মানুষকে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর অত্যাচার নির্যাতনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। হিতবাদী দর্শনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে মুক্ত ব্যক্তিসত্তায় উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবন জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করে জীবন চর্চায় মানুষকে অন্বিত করা, যাতে মানুষের সামাজিক এবং জাগতিক সম্পর্ক ত্বরান্বিত হয়। হিতবাদী দর্শনের লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষ যাতে মানুষকে নিয়ে ভাবতে পারে। আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনের এ অধ্যায়ে এদিকটিই অনুসন্ধান করা হয়েছে। তিনি জীবনের মৌলিক বিষয়গুলোকে বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন – যা মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়ে, অনুসন্ধান করা হয়েছে যে বিষয়, তাহলো সমাজের কল্যাণের অন্তরায় হিসেবে ধর্মের অসাধু প্রয়োগকারীদের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা। আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনের মূল মন্ত্র ছিল এক নিরাপদ, অভাবমুক্ত ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মানুষের জন্য পৃথিবী গড়ে তোলা। যাতে সকল সুস্থ মানুষ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধমুক্ত বিশ্বে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মতো আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনেও সমন্বয় দর্শনের অনুসন্ধান করা হয়েছে। গোবিন্দ চন্দ্র দেব যেমন মানবজাতির কল্যাণার্থে বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকবাদের সমন্বয় সাধন করেছেন, আরজ আলী মাতুব্বরও পৃথিবীতে প্রচলিত সব ধর্মের স্বীকৃত যে মতবাদ 'মানবতা' – তার সমন্বয় করেছেন। তাঁর ভাষায় মানবতাই হবে আগামী দিনের মানুষের আন্তর্জাতিক ধর্ম তথা 'মানবধর্ম'।

গবেষণায় পাশ্চাত্য দর্শনের মানবতাবাদের মৌলিক দিকগুলির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে গবেষণায় প্রাথমিক সূত্র বা আকর অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। গবেষণার গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ দার্শনিকের দর্শন ও রচনাবলির সহায়তা গ্রহণ করা হয়। এই সাথে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের বেগম রোকেয়া, নজরুল ও মানবেন্দ্রনাথের মানবতাবাদ বিষয়ক বিতর্ক সম্পর্কিত লভ্য রচনাবলির পাঠ ও পর্যালোচনা গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। জার্নালে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলি গবেষণার পর্যালোচনাভুক্ত হয়েছে। গবেষণার সংশ্লিষ্ট রচনাবলির পাঠ ও যৌক্তিক

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আরজ আলী মাতুব্বরের মানবপ্রেম ও বিজ্ঞানমনস্কতার গুরুত্ব নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর এই মানবতাবাদের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর নিজস্ব অবস্থান ও এ বিষয়ক বিতর্ক পর্যালোচনা মধ্য দিয়ে সমস্যার একটি নতুন সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণার একটি সাধারণ রূপরেখা ও অধ্যায় বিন্যাস তুলে ধরার মাধ্যমে গবেষণাকর্মটির একটি সাধারণ চিত্র প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিকের মানবতাবাদের ধারণা ও উৎসকে ব্যাখ্যা করা হয় এবং নৈতিক ও আইনগত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য, মানবতাবাদের ধরন, বর্ণনা ও মূল্যায়নমূলক দিকের বিরোধ ও সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিকের মানবতাবাদ পর্যালোচনা করে আরজ আলী মাতুব্বরের সাথে তাঁদের পার্থক্য এবং মতের মিল সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে। যদিও তৎকালীন দার্শনিকদের মধ্যে পক্ষের ও বিপক্ষের উভয় ধারার ভাবাদর্শ সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তবুও আরজ আলী মাতুব্বরের ক্ষেত্রে মানবতার স্থান কিভাবে আছে তা দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন আধুনিক দার্শনিকদের সাথে আরজ আলী মাতুব্বরের মানবতাবাদের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। আরজ আলী মাতুব্বরের ভাবাদর্শ অনুসারে তাঁর মানবতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতার বাস্তব ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। পার্থক্যও নির্ণয় করা হয়েছে, যা থেকে মানবতাবাদের প্রসঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের অবস্থান বেরিয়ে এসেছে। আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে মানব মুক্তির কথা উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয়। ব্যক্তির সমস্ত ক্ষমতা ও সামর্থ্য প্রয়োগের বাস্তব পরিবেশ প্রতিষ্ঠাই মানবিক মুক্তি। আরজ আলী মাতুব্বর মানবিক মুক্তিকে বাস্তব ও ব্যবহারিক মুক্তি হিসেবে দেখেছেন। সমাজের শোষণমূলক ব্যবস্থার বাস্তব ও ব্যবহারিক অবস্থানের মধ্যে মানুষের মুক্তির বিষয়টিকে ভেবেছেন। এভাবে মানবিক মুক্তির প্রসঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

অভিসন্দর্ভে মানবিকতাবাদের মধ্যে ন্যায়পরতা ও নৈতিকতার অবস্থান অনুসন্ধান করা হয়। তিনি শোষণকে কিভাবে দেখেছেন তা বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরজ আলী মাতুব্বরের আত্মরূপায়ণের (Self-realization) ধারণার মধ্যে কোনো নৈতিক বিবেচনা আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রচলিত মানবতাবাদের সাথে আরজ আলী মাতুব্বরের আলোচনা করা হয়। মানবিক মূল্যবোধ ব্যতীত আরজ আলী মাতুব্বরের মধ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তির দিক রয়েছে। তাঁর মানবিক স্বাধীনতার আদর্শের দিকটি অনুসন্ধান করা হয়েছে। সমাজে সমাজ গতির সার্বভৌম কর্তৃত্ব, শ্রম-বিভাজন, কুসংস্কার এবং কুসংস্কারের দাসত্ব - এ সবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রসঙ্গটি তিনি কিভাবে ব্যবহারিক ও নৈতিক উভয়ভাবেই বিবেচনা করেন তা তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে যৌক্তিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেন তা উল্লেখ করা হয়। মানবতাবাদের মধ্যে তাঁর নৈতিকতা তৈরি হয়েছে কিনা গবেষণায় সে দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি সনাতনী

Dhaka University Institutional Repository

মানবতাবাদীদের মতো পদ্ধতিগতভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট মানবিক তত্ত্ব প্রদান না করলেও মানবতাবাদিকতার একটি বৃহত্তর স্বার্থে তাঁর মধ্যে যে মানবতাবাদের দিক ছড়িয়ে আছে, বর্তমান গবেষণার মধ্যে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সর্বোপরি গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আরজ আলী মাতুব্বরের মধ্যে একটি বিশেষ মানবতাবোধ দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা অন্যান্য মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। এ অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত সময়ের সমস্ত প্রধান দার্শনিক ও তাঁদের সমস্ত প্রধান মতবাদ গৃহীত হয়েছে। অভিসন্দর্ভের শেষে যে রচনাপঞ্জিটি দেয়া হয়েছে তা আধুনিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত। গ্রন্থপঞ্জিতে শুধু সে সব গ্রন্থের নামই উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো অভিসন্দর্ভে ব্যবহার করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ রচনা সম্পন্ন হওয়ায় যিনি সবচেয়ে সুখীবোধ করতেন, যাঁর হাতে তুলে দিয়ে আমি সব চেয়ে বেশি সুখীবোধ করতাম, তিনি আজ আমার কাছ থেকে মহাকালের মতো সুদূরতম। তিনি আমার বাবা জনাব হাবিবুর রহমান, যিনি সরকারি চাকরিরত থেকে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সাথে কাজ করেও অকপটে মুক্তমনের পরিচয় দিয়েছেন। যাঁর হাত এটিকে কোনোদিন স্পর্শ করবে না। আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. কাজী নুরুল ইসলামের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যাঁর স্নেহ ও তত্ত্বাবধানে আমার জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পেয়েছে। দর্শনে তাঁর অশেষ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ফলেই আমার পক্ষে এ অভিসন্দর্ভের রচনা সম্ভব হয়েছে। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তিনি অভিসন্দর্ভ রচনাকালে সর্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন ও সুপরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আমার অভিসন্দর্ভের খসড়া থেকে শুরু করে শেষাবধি অত্যন্ত যত্ন ও ধৈর্য সহকারে পাঠ করে প্রয়োজনীয় অভিমত, উপদেশ ও সংশোধনসহ জটিল প্রসঙ্গসমূহের মীমাংসা দিয়েছেন। তাঁর প্রাজ্ঞ পরামর্শ আমাকে আন্তরিকভাবে ঋণী করে রেখেছে। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম, অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. আবদুল মতিন, অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার রায় এবং অধ্যাপক কবির চৌধুরী, অগ্রজ অধ্যাপক বদিউর রহমান, ড. কাজী মোজাম্মেল হোসেন প্রমুখের মূল্যবান উপদেশ, পরামর্শ ও উৎসাহের জন্য তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে ঋণ স্বীকার করছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আরজ আলী মাতুব্বর ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে মানবতাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে মানবতাবাদ

যুগে যুগে সমাজের অস্থিরতার চরম সন্ধিক্ষণে মোকাবিলা করতে হচ্ছে মানবজাতিকে। এ বিষয়ে সাড়া জেগেছে সমকালীন ব্যক্তিমানস, আরজ আলী মাতুব্বরের (১৯০০খ্রি.- ১৯৮৬খ্রি.) মতো স্বশিক্ষিত একজন মানুষের মনে। জীবনকে দর্শন থেকে আলাদা করা যায় না। এক কথায় সার্থক দর্শনের অপর নাম জীবন দর্শন। সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই জীবনমুখী অর্থ ও ব্যঞ্জনার নিরিখেই বিচার করতে হবে আরজ আলী মাতুব্বরের মানবতাবাদকে। প্রাচীনযুগের সক্রেটিস থেকে সমকালীন দার্শনিক রাসেল, সার্ত্রে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে প্রমাণ করেছেন একজন দার্শনিকের কাছে জ্ঞান, সত্য ও সুনীতির চেয়ে আর কিছু প্রিয় পৃথিবীতে নেই। দর্শন কোনো পূর্বসংস্কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়াকে প্রশ্রয় দেয় না। দর্শন মুক্তবুদ্ধির আলোকে অনুভব, বিশ্বাস ও ধারণাকে বিশ্লেষণ করার কথাই বলে। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব মতামত থাকে, থাকে নিজস্ব সিদ্ধান্ত। যুক্তিবিদ্যার যুক্তিমালার গতি যেমন সিদ্ধান্তের দিকে; দার্শনিক চিন্তা-চেতনার গতিও তেমনি ধাবিত হয় নৈতিক ও পারমার্থিক জ্ঞানের দিকে এবং সর্বোপরি তা রূপ নেয় মানব কল্যাণের মহান লক্ষ্যে। তাই সমাজ বিজ্ঞানীদের মতো দার্শনিকরা মানুষের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি নিয়ে ভাবেন। অনেক সময় দেখা গেছে বৃহত্তর মানব কল্যাণের জন্য আন্দোলন জোরদার করতে দার্শনিকরা প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। তাই দেখা যায় সত্যিকারের জ্ঞানপিপাসু এবং সত্যানুসন্ধান ব্যক্তি অবশ্যই উদার, যুক্তিবাদী এবং নীতিবোধসম্পন্ন হয়ে থাকেন। কোনো সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতা স্পর্শ করতে পারে না এ ধরনের মানুষকে। সেই সঙ্গে কোনো রকম অন্ধ গোঁড়ামিও এদেরকে আকর্ষণ করতে পারে না। মোট কথা দর্শন যৌক্তিক চিন্তা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করতে চায় না। দর্শন তার বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করে যুক্তির নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তাই দর্শনের তাত্ত্বিক দিকের চেয়ে প্রায়োগিক দিকটাই বেশি গ্রহণযোগ্য। আরজ আলীর চিন্তা-চেতনার অনুসন্ধানে যে ধরনের দর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকের কথাই বলে, সমকালীন প্রেক্ষাপটে যা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এভাবে আরজ আলী জগতের স্বরূপ অনুসন্ধান এবং সব কিছুকে যুক্তির নিরিখে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন, যা মানবকল্যাণে অপরিহার্য। তিনি তাঁর মানসপটে লালিত নানা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যুক্তির নিরিখে। এ সমস্ত প্রশ্ন আমাদের নিকট অভিনব মনে হলেও যুক্তি ও তাৎপর্যের বিচারে তা অবহেলা করা যায় না বরং মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

স্বশিক্ষিত আরজ আলী মাতুব্বর কোনো ব্যাপারে বাহুল্য পছন্দ করেননি। নিজস্ব মতবিরুদ্ধ কোনো ব্যাপারে উত্তেজিত না হয়ে, যুক্তিসহকারে শান্তভাবে অন্যের মত খণ্ডন করতেন এবং অপরের যুক্তিপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

মত সহজে গ্রহণ করতেন। সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, তিনি অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকের মধ্যে অন্ধ কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা লক্ষ করে উদ্বিগ্ন হতেন। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয় সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন, বিজ্ঞানীরাই চাঁদের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি কোনো তত্ত্বমূলক বিষয়ে এবং যুক্তিহীন কথার আদৌ কোনো গুরুত্ব দেননি। আরজ আলী মাতুব্বর মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন যুক্তিবাদী কথার বিপরীতে উপহার পেয়েছিলেন হাজতবাস।

কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনায় আঘাত করে মুক্তচিন্তার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা ছিল তাঁর সংকল্প। তিনি সংলাপের ভঙ্গিতে যুক্তি, যুক্তি-খণ্ডন ও নতুন যুক্তি প্রয়োগ করে এক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর রচনায়। সমাজের অচলায়তনে তাঁর রচনায় এক একটি বাক্য হয়েছে এক একটি আঘাত। তাই সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব অস্বীকার করার অপেক্ষা রাখে না। আজকের সমাজের এ অস্থিরতায় আরজ আলী মাতুব্বরের মানবতাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ আশাবাদী মতবাদ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণার্থে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে।

অহিংসা ও শান্তির নাম করে আজ সারা বিশ্বে হিংসার প্রতিযোগিতা চলছে। এর একমাত্র কারণ, মানবতায় এবং নিষ্ঠার প্রতি মানুষের অবজ্ঞা। মানুষের হিংসার অলক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে মানবতাবোধকে স্বীকার করে নিতেই হচ্ছে; তবে মানবতাবাদ ও মানবিকতাবাদ এক নয়। মানবিকতাবাদে পরোপকারের প্রেরণা আছে, কিন্তু মানুষ হিসাবে মানুষের পূর্ণ মর্যাদা সেখানে নেই। মানবতাবাদ হলো, 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই'। মানবতাবাদ মানবকেন্দ্রিক জীবন দর্শন। মানবপ্রীতি ছিল তাঁর মধ্যে অপরিসীম। তাঁর চিন্তাচেতনায় সর্বদাই বিরাজ করত মানব কল্যাণ। তাই তিনি যুক্তির আলোকে বিজ্ঞানের প্রসার প্রতিষ্ঠা ও প্রচার চেয়েছিলেন কুসংস্কারমুক্ত মানুষের মঙ্গলের লক্ষ্যে। স্বশিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক, আপোসহীন ও প্রতিবাদী দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর সারাজীবন লড়াই করে গেছেন।

মানবতাবাদী মানুষের জীবনে ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃতিক কোনো শক্তির সাহায্যের বিষয়টি মূখ্য নয়। মানুষ নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এবং তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই নৈতিক আদর্শের সৃষ্টি। প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণীর জন্ম এবং পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলাই তার লক্ষ্য। ব্যক্তির বা বিশ্বের কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ঈশ্বরের হাত নেই। একজন মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তাঁর সকল অধিকার ও সুযোগ থাকা দরকার। বিজ্ঞানের দান মানুষের জীবনকে মুক্ত ও উন্নত জীবনযাপনে সাহায্য করতে পারে। মানুষ সুখী হওয়ার জন্য একে অপরের সাহায্য নিতে পারে। এক

Dhaka University Institutional Repository

কথায় মানবতাবাদীর চিন্তা ও কাজ অর্থাৎ যা কিছু এ পৃথিবীতে আছে তার সবেরই মূল্য নির্ধারণ করা হবে মানুষের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে। বিশ্ব সমস্যার সমাধান করার জন্য দরকার মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা, সাম্য ও মৈত্রী। সমগ্র মানবজাতি থাকবে এক ভ্রাতৃমণ্ডলে আবদ্ধ। প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হবে জীবন, মনুষ্যরচিত কৃত্রিম নিয়মকে অতিক্রম করে।

খ্রিস্টধর্মের বিখ্যাত মনীষী ও লেখক এমারসনের নেতৃত্বে ইউনিটেরিয়ান আন্দোলন থেকেই ধর্মীয় মানবতাবোধের উদ্ভব হয়। ১৯৩৩ সালে তাঁরই পক্ষ থেকে 'মানবতাবাদী ইস্তেহার' প্রকাশ এক স্মরণীয় ঘটনা। ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যক্তিস্বাধীনতাই ছিল এই আন্দোলনের মূলমন্ত্র। মানব প্রকৃতির মূল্য ও গৌরব, মানব জীবনের পবিত্রতা বিজ্ঞাপিত হলো গোঁড়া খ্রিস্টধর্মে। মানুষকে যে অদৃশ্য শক্তির ক্রীড়নক ও ধরাধামে সে শক্তির যাঁরা প্রতিনিধি তাঁদের দাস বলে গণ্য করা হয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠল। সর্বজনীন খ্রিস্টধর্ম নামে আরেকটি মতবাদও দেখা দিল- তারই কারবার ছিল সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ে। ভগবান সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তি দিয়ে পবিত্র আনন্দলোকে তাকে উত্তীর্ণ করে দেবেন- এই ছিল সেই মতবাদের মর্ম। খ্রিস্টধর্মে মানবীয় পর্যায়ে যিশুর জীবনে মূল্য নির্ধারণের কথা বলার অপরাধে ১৫৫৩ সালে মিগুয়েল সার্ভিটাসকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। তাঁর ভস্মাবশেষ থেকে উৎপত্তি হয়- 'ইউনিটেরিয়ান' আন্দোলনের। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, অমানবিকতার স্থান নেই তাঁর মধ্যে, মানবিকতাই যিশু খ্রিস্টের প্রাণ।[১] এভাবে খ্রিস্ট ধর্মে মানবিক ধারার প্রবর্তন হলো।

প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির অধ্যয়ন, গবেষণা, মূল্যায়ন ও অনুশীলনে মানবতাবাদ গুরুত্ব পেত। যেমন দর্শনের জনক ও পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা থেলিস প্রাকৃতিক ঘটনাবলিতে ঐশ্বরিক কোনো কিছুতে বিশ্বাস করেননি। তাঁর মতে মানুষকেই বাস্তব যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে জ্ঞানকে খুঁজে নিতে হবে। মনুষ্যকেন্দ্রিক এ 'জগত', একার্থক এ জগত ও জীবন – গ্রীসে এ মতবাদের ধারক ও বাহকদের সফিস্ট বলা হতো। মধ্যযুগে নিশ্চিহ্ন হতে যাওয়া প্রাচীন সাহিত্য, গ্রিক-ল্যাটিন জ্ঞান ইত্যাদি চর্চাকারীকে মানবতাবাদী বলা হতো। আবার বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ হিসাবে সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকারীকেও মানবতাবাদী বলা হতো।

প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় মানবতাবাদ ব্যবহৃত হতো। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে পাশ্চাত্য মনীষীরা প্রোটাগোরাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০-৪১০)-কে মানবতাবাদের জনক হিসাবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সফিষ্টদের চাইতেও অনেক পূর্বে মানবতাবাদের প্রচার করেছিলেন প্রাচ্য মণীষী গৌতমবুদ্ধ। প্রোটাগোরাসের মতে মানুষের সীমিত আয়ুর মধ্যে দেবতাকে জানার পথে অনেক বাধা আছে। কাজেই তাঁর মতে মানুষের বিচারেই সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। সক্রেটিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৭০-৪৯৯অব্দে) মানুষের নিজেদের কাজের বিচার – ন্যায়, সততা,পুণ্য প্রভৃতির মানদণ্ড নিজেদেরই করার

Dhaka University Institutional Repository

কথা বলেছেন। তবে প্রোটাগোরাসের সঙ্গে তাঁর পদ্ধতির মিল ছিল। সক্রেটিসের মতে মানুষের কাজের বিচারের মানদণ্ডে ন্যায়, সততা, পুণ্য ইত্যাদির ব্যবহার করতে হবে। উল্লেখ্য, সক্রেটিস মানুষকে নিজ চেতনায় উপলব্ধি করার কথা বলার কারণে তাঁকে বিষপানে জীবন দিতে হয়েছিল। পরমাণুবিদ ডেমোক্রিটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০-৩৭০)এর মতে মানুষকে অতিপ্রাকৃতিক কোনো শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং মানবীয় অনুভূতিতেই মানবজীবন পরিচালিত হয়।

মধ্যযুগ ছিল ঈশ্বরকেন্দ্রিক ক্ষমতার উৎস। ঈশ্বরের সাথে যিশুর মানবীয় সম্পর্কের আলোচনার ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সময় সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪ খ্রি.-৪৩০ খ্রি.) ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম। মধ্যযুগে ইহুদী ধর্ম ও ইসলামে মরমীবাদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট বার্নার্ড (১০৯১ খ্রি.-১১৫৩ খ্রি.), সেন্ট ফ্রান্সিস (১১৮২ খ্রি.-১২৪৪ খ্রি.) প্রমুখ মধ্যযুগীয় মরমীবাদীরা মরমী অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মরমীবাদের অনেকেই চার্চের উপর আস্থাশীল ছিলেন। তবুও তাঁরা ব্যক্তিকে ঈশ্বরের অংশ হিসেবে গণ্য করে ঈশ্বর ও মানুষের দূরত্ব অগ্রাহ্য করেছেন। ইন্দ্রিয়ের দেয়া পরিবর্তন এবং বহুত্বের ধারণাকে তাঁরা বাস্তব বলে মেনে নেননি। তাঁরা মানুষের অন্তরে ঐশী আলোকচ্ছটার উপস্থিতি দেখাতে সচেষ্ট ছিলেন। মধ্যযুগের মানুষের জীবন ছিল শুধু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি। কিন্তু রেনেসাঁ এনে দিয়েছিল ব্যাপক জাগরণ, মানুষের ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি। এক কথায় মানুষ নিজেকে সব দিক দিয়ে প্রকাশ করার সংকল্পে ব্রতী হলো। রেনেসাঁতে মানবতাবাদের অভ্যুদয় হলো। রেনেসাঁয় ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব পুনরায় স্বীকৃতি পেল। মানবতাবাদীগণ প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ফিরিয়ে আনলেন তো বটেই এবং সেই সঙ্গে ধর্মীয় ঐতিহ্যকেও মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে বিচার করলেন।

মধ্য যুগে নিশ্চিহ্ন হতে যাওয়া সাহিত্য, গ্রিক, ল্যাটিন জ্ঞান ইত্যাদি চর্চাকারীকে মানবতাবাদী বলা হতো। ইতিহাসবেত্তাদের মতে রেনেসাঁর অভিযান ছিল বৈরাগ্যবাদের বিরুদ্ধে সৌন্দর্যানুভূতির লক্ষ্যে। প্রাচীনকাল থেকেই নীতি ও সৌন্দর্যানুভূতির পারস্পরিক সম্পর্কের যে সমস্যা ছিল, রেনেসাঁ যুগে মানবতাবাদে তা নতুন সমাধানের পথ প্রত্যক্ষ করল। রেনেসাঁ আন্দোলন প্রমাণ করতে চেয়েছে কিভাবে শিল্পসৌন্দর্যানুভূতির মাধ্যমে জীবনের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে এবং নীতিগত জীবন যাপনের প্রশ্নের সমাধান আপনা থেকেই হয়ে যায়। তাইতো বোধ করি রেনেসাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের মধ্যে অন্যতম। তিনি নিয়ম ও পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন।[২] এভাবে প্রকৃতিকে অনুশীলন করে সত্যকে বের করে আনাই ছিল শিল্পের লক্ষ্য। একইভাবে মানুষ নিজেকে প্রকৃতির অঙ্গ মনে করে। ফলে অতিপ্রাকৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

শক্তির অস্তিত্বের কল্পনা মানুষের কাছে আর গ্রহণীয় হলো না। অধিকাংশ যাজক শিল্পীগণও সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে রক্ত-মাংসের মানুষের রূপ নিলেন।

আধুনিককালে বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগঠিত হয় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। শুরু হয় মানুষের দ্রুত ও ব্যাপক অগ্রগতির অভিযান। যদিও ষোলোশতকের শেষের দিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার প্রকৃত সূত্রপাত ঘটে, কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে ১৭ শতকে। মানবতাবাদী ধারার প্রথম পরিচয় মেলে অগাস্ট কোঁতে (১৭৯৮ খ্রি.-১৮৫৭ খ্রি.)-এর প্রত্যক্ষবাদী চিন্তাধারায়। কোঁতে চিন্তা করেছিলেন এমন এক সমাজ ব্যবস্থার যেখানে মানুষ ঈশ্বরের পরিবর্তে আরাধনা করবে মানবতাকে। যার লক্ষ্য হবে মানুষের মঙ্গল ও অগ্রগতি। মানবতাবোধ থেকে মানবতাবাদী দর্শনের উদ্ভব। মানবতাবাদ এমন একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি– যা মানুষের মর্যাদা ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি সবিশেষ আস্থাশীল এবং যা মানুষের চেয়ে শ্রেয়তর বাহ্যিক কোনো ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাস করতে নারাজ।

উনিশ শতকের শেষের দিকে গ্রেট ব্রিটেনে ভাববাদ যে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে, তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নিয়ে আবির্ভাব ঘটে সমকালীন বস্তুবাদী চিন্তাধারার। এদের মতে, দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সব রকম জ্ঞান অর্জন সম্ভব। তবে দর্শনের পরিসর বিজ্ঞানের চেয়ে ব্যাপক হওয়ায় অর্থাৎ দর্শন যে সব অনুমান ও প্রকল্পের কথা বলে সেগুলোর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আদৌ সম্ভব নয়। তবু বলা যায় বিজ্ঞানের মতো দর্শনও বিশ্লেষণের সাহায্যে জগতের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জনের লক্ষ্যে প্রায়োগিক পদ্ধতি অর্জন করে। সমকালীন প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রভৃতি আদর্শ – মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্বুদ্ধ।

প্রাথমিক ও রেনেসাঁর সময়ে মানবতাবাদের পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্তমান যুগে এ মতবাদ পূর্ণতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বাংলার রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আবুল ফজল 'হিউম্যানিজম'- কে যথাক্রমে 'বিশ্বরূপী ব্রহ্মবাদ' (মানুষ ও ব্রহ্ম এক), 'মানবীয়তন্ত্র' ও 'মানবতন্ত্র' বলে আখ্যা দেন।[৩] মূলত বিশ্বরূপী-ব্রহ্মবাদ, মানবীয়তন্ত্র ও মানবতন্ত্র- এ তিনটি মানবতাবাদ শব্দটির সমার্থক।

Dhaka University Institutional Repository

১.১. আরজ আলী মাতুব্বর ও প্রাচীন যুগের মানবতাবাদ

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব বলেই অতি সাধারণভাবে বাঁচতে চায় না বরং যথার্থ মর্যাদা নিয়ে উচ্চতর মানবিক জীবনযাপন করতে চায়। এ ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তির কারণে মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করতে পারে, যুক্তি প্রদান করতে পারে; আর এ জন্য প্রয়োজন হবে সঠিক চিন্তার বিধি-বিধান যা মহৎ মানবোচিত জীবনের জন্য অপরিহার্য। মানুষ যখন সর্বপ্রকার সংস্কার অন্ধবিশ্বাসমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে যুক্তিনির্ভর হয়ে ওঠে, তখনই সৃষ্টি হয় দর্শন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রিসে সর্বপ্রথম দার্শনিক চিন্তার বহির্প্রকাশ ঘটে এবং দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচানা করলে দেখা যায় পাশ্চাত্যেই এর গোড়াপত্তন হয় এবং তা সূচিত হয় প্রাচীন গ্রীসে। পৃথিবীর ইতিহাসে মাইলেসিয়া[৪] দার্শনিকরাই সর্বপ্রথম জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হন বলে তাঁদের গুরুত্ব আছে, যদিও তাঁদের তেমন দার্শনিক অবদান নেই। প্রাকৃতিক ঘটনাবলির মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির উপস্থিতি মাইলেসিয়া দার্শনিকরা কখনো গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন সৃষ্টির রহস্যের পিছনে কোনো দেব-দেবীর কল্পনা করতে গেলে সৃষ্টির কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেয়া বা কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা তাঁদের বাস্তব যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের কথা বলেন। এভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের পরস্পর সম্পর্কের কথা বলেন। মাইলেসিয়া দার্শনিকদের মধ্যে থেলিস (খ্রিস্টপূর্ব ৬২৪-৫৪৬)-কেই দর্শনের জনক বলে অভিহিত করা হয়।[৫] তিনি সর্বপ্রথম তাঁর যুগের প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস, গল্প-কবিতা, সাহিত্যের প্রচলিত বিশ্বাসসমূহ তথা সর্বপ্রকার সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জগৎ জীবন সম্পর্কে ভেবেছিলেন। তাঁর ভাবনার প্রথম এবং প্রধান বিষয় ছিল জগতের উৎপত্তি নিয়ে; যে ব্যাপারটি নিয়ে তৎকালীন গ্রীসে বিভিন্ন উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এই সকল ধর্মীয় ও সাহিত্যকেন্দ্রিক উপাখ্যানকেই বিশ্বাস করত অথবা বিশ্বাস না হলেও মেনে নিত। কিন্তু দার্শনিকরা সব কিছুকে বিচার-বিবেচনা করে বুঝতে চান। তাঁরা কোনো কিছুকেই বিনা বিচারে গ্রহণ করতে চান না। থেলিসই এমন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যিনি নিজের মনন দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন। জগতের উৎপত্তি নিয়ে তাঁর মননিষ্ঠ মত ছিল খুবই সাদামাটা, এমনকি আজকের বিচারে নিতান্তই অবাস্তব। তিনি তাঁর যুগের প্রচলিত ধর্মমত ও পৌরাণিকদের কাল্পনিক দেব-দেবীর সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা বদলে দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর দর্শনে ঈশ্বর (God) কথাটির উল্লেখ দেখা গেলেও, ঈশ্বর বলতে তিনি সমস্ত বিশ্বকেই বুঝিয়েছেন, কোনো সত্তাকে নয়।[৬] এভাবে সর্বপ্রথম সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে থেলিস জগৎ সম্পর্কে ভেবেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন মানবিক মর্যাদা। এভাবে মুক্তচিন্তার প্রয়োগ ও বিস্তারের মাধ্যমে শুরু হয় পাশ্চাত্য দর্শনের অভিযাত্রা। কারণ দর্শন মুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তার উপর নির্ভরশীল। জগতের মূল উপাদান কি হতে পারে এ প্রসঙ্গে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মূলত এ প্রশ্নের উত্থাপন ও উত্তর অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় তিনি যে কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনের জনকের মর্যদায় অধিষ্ঠিত হন – তা হলো তাঁর মুক্তবুদ্ধির প্রয়োগের ফসল। জগতের উৎপত্তি নিয়ে তাঁর মননিষ্ঠ সিদ্ধান্ত অনেকেই গ্রহণ করেননি। আদিসত্তা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল – পানি জগতের আদি উপাদান। সবকিছু পানি দ্বারাই সৃষ্ট।[৭] থেলিসের এ উক্তি ছিল অত্যন্ত সাহসিক এবং স্বাধীন চিন্তার এক অত্যুজ্জ্বল আলোর দিশারী। থেলিসের এ উত্তরে যুগান্তকারী কিছু থাক বা না-ই থাক, তাঁর প্রশ্নটি ছিল দর্শনের এক যুগান্তকারী ইতিহাস স্রষ্টা। থেলিস তাঁর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে তদানীন্তন সমাজের প্রচলিত উত্তরসমূহের বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমন সব উত্তর পরিহার করেছিলেন যা পৌরাণিক এবং যুক্তিগ্রাহ্য নয়।[৮] জগৎ ব্যাখ্যায় তাঁর নীতি ও পদ্ধতির অনুশীলন ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক। থেলিসের এই মুক্তবুদ্ধির পথ ধরে তৎকালীন আইয়নিয় দার্শনিক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এই সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন দার্শনিক এ্যানাক্সিমেন্ডার (খ্রিস্টপূর্ব-৬১০-৫৪৫)। তিনি থেলিস প্রবর্তিত যুক্তিবাদী চিন্তাধারাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। থেলিস বিশ্বতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা ও পঠনের যে সূচনা করেছেন, এ্যানাক্সিমেন্ডার স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে তা অব্যাহত রাখেন। গ্রিক লেখক ও দার্শনিক গ্রন্থকারদের মধ্যে তিনিই প্রথম ছিলেন বলে জানা যায়।[৯] এ্যানাক্সিমেন্ডার বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, বিশ্বের আদি উপাদান অসীম (boundless) এবং শীতল-উষ্ণ, শুষ্ক-সিক্ত প্রভৃতি যাবতীয় বিপরীতধর্মী গুণ অসীম থেকেই সৃষ্ট। আবার মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি মানুষকে জীবজগতের অংশ বিশেষ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর এ মতকে একজন আধুনিক চিন্তাবিদদের মত বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তাঁর এ মতে, ডারউইন (১৮০৯ খ্রি. -১৮৮২ খ্রি.)-এর মতের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।[১০] এভাবে এনাক্সিমেন্ডারের দর্শনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানুষের মানবিক মর্যাদা তুলে ধরার প্রয়াস দেখা যায়। এ্যানাক্সিমিনিস (খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৮-৫২৪) তাঁর দার্শনিক চিন্তার বাহ্যসত্তা ও মানসসত্তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে, বাহ্যতত্ত্ব ও মানসিক অবস্থার মধ্যে একটি মৌলিক সম্পর্কের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। এ কথায় বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তিনি বলেছিলেন যে, বিশ্বসত্তা বায়ু ও আত্মা এই দুই রূপে আবির্ভূত হতে পারে। সুতরাং বলা চলে যে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের চেয়ে আত্মার ও মনের ধারণার অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যায় তিনি গ্রন্থসমূহ এবং স্থির নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ এবং ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।[১১] এভাবে আইয়নীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের অনুপ্রেরণায়ই সূচিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

গ্রিক সভ্যতার সোনালি যুগ। প্রাচীন আইয়নীয় দার্শনিকদের মতবাদ আজকের দিনের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও দর্শনের গোড়াপত্তন এবং দার্শনিক আলোচনার অগ্রগতি সূচিত করার ক্ষেত্রে তাদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। রাসেল আইয়নীয় দর্শনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, "The Milesian school is important, not for what it achieved, but for what it attempted."[১২] দর্শনের ইতিহাস আলোচনায় মাইলেসীয় সম্প্রদায়ের প্রথম দার্শনিক থেলিস থেকেই শুরু। এ কথা মোটামুটি সর্বজন স্বীকৃত যে, আইয়নীয় দার্শনিক থেলিস থেকেই দর্শনের যাত্রা শুরু।[১৩]

আইয়নীয় দার্শনিকদের এই মুক্তচিন্তার পথ ধরে দার্শনিক চিন্তা– জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভাবনা অগ্রসর হতে থাকে । স্থান ও কালের বিচারে স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত চিন্তাপদ্ধতি ও বাস্তব অবস্থা তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করে, যা বিশেষ ধরণের প্রতিক্রিয়া করে। তাই রাসেল যেমন বলেছিলেন – যদি তিনি যথেষ্ট শক্তিমান হন এবং সে কারণে ভাগ্যবানও, তাহলে তিনি তাঁর যুগ ও পরিবেশকে প্রভাবান্বিত করেন; আরো শক্তিশালী হলে তাঁর প্রতিভার ফসল দেশকালোত্তীর্ণ হয়। এভাবে প্রতিটি শক্তিমান চিন্তাশীল ব্যক্তি একই সময়ে তাঁর কালের সৃষ্টি ও স্রষ্টা।[১৪] আবার কোনো দার্শনিক চিন্তাই শূন্যকে আশ্রয় নিয়ে জন্ম নিতে পারে না এবং বিকশিত হতে পারে না। আইয়নীয় দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই জগতের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারে ব্রতী ছিলেন। মানুষ নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যাই ছিল প্রথম ও প্রধান সমস্যা। রাসেল বলেন:

> থেলিস, এনাক্সিম্যান্ডার এবং এনাক্সিমিনিসের দার্শনিক অনুষ্যাঙ্গী চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক প্রকল্প হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। তাঁদের চিন্তাধারায় খুব কমই অযৌক্তিক মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বা নৈতিক ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁদের উত্থাপিত প্রশ্ন ছিল উন্নতমানের। এ ছাড়া তাঁদের মানসিক শক্তি পরবর্তী গবেষকদের অনুপ্রাণিত করে।[১৫]

থেলিস, এনাক্সিম্যান্ডার এবং এনাক্সিমিনিস প্রমুখ দার্শনিকগন গ্রিক দর্শনের আদি পথিকৃৎ। তাঁদের দর্শনের তাত্ত্বিক দিকের চেয়ে প্রায়োগিক দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের পথে আজকের সূক্ষ্মদর্শন চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে এখানে থেলিসকে আমরা মুক্তমনের সর্বপ্রথম দার্শনিক হিসেবে পাই। মানুষের প্রশ্নার্ত জিজ্ঞাসার উৎস থেকেই এমনিভাবে দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল ইতিহাসের এক ধূসরযুগে। ধর্মের নির্মোহ ভেঙ্গে, বুদ্ধির শাণিত অসিতে বস্তু-বলয়িত জ্ঞানের বিচিত্র সম্ভাবনাময় বর্ণ-বিন্যাসকে বিজ্ঞাননুখী করে তোলার লক্ষ্যে দর্শন তার যাত্রা শুরু করেছিল। আয়জ আলী মাতুব্বরও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে জীবনকে দর্শন থেকে আলাদা করে দেখেননি। দর্শনকে বিজ্ঞাননুখী ও জীবননুখী করার লক্ষ্যে তিনি ঐশ্বরিক শক্তির চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব যুক্তি ও বিচারের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন দর্শন কোনো পূর্বসংস্কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়াকে প্রশ্রয় দেয় না। তিনি বিশ্বাস করতেন সত্যিকারের জ্ঞানপিপাসু এবং সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি অবশ্যই উদার, যুক্তিবাদী এবং নীতিবোধসম্পন্ন হয়ে থাকেন। কোনো সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতা স্পর্শ করতে পারে না এ ধরনের মানুষকে। সেই সঙ্গে কোনো অন্ধ গোঁড়ামিও এলেরকে আকর্ষণ করতে পারে না। মোটকথা দর্শন যৌক্তিক চিন্তা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করতে চায় না। দর্শন তাঁর বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করে যুক্তির নিরিখে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তাই দর্শনের তাত্ত্বিক দিকের চেয়ে প্রায়োগিক দিকটাই বেশি গ্রহণযোগ্য। আর আরজ আলী মাতুব্বরও আইয়নীয় দর্শনের চিন্তার সূত্র ধরে-তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় যে দার্শনিক অনুসন্ধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকেই বেশি গুরুত্বের ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট দার্শনিক সরদার ফজলুল করিমের ভাষায়:

> তাঁর সত্যের সন্ধান গ্রন্থে আরজ আলী মাতুব্বার যে মৌলিক প্রশ্নগুলির নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে রয়েছে (১) আমি কে ? (২) প্রাণ কি অরূপ না স্বরূপ (৩) মন ও প্রাণ কি এ ... ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রশ্নে আরজ আলী মাতুব্বর জিজ্ঞাসা করেছেন, 'স্রষ্টা কি সৃষ্টি হতে ভিন্ন? ঈশ্বর কি স্বেচ্ছাচারী না নিয়মতান্ত্রিক?[১৬]

জীবন জগত, সৃষ্টিকর্তা, ন্যায়, অন্যায়, সত্য, মিথ্যা, বস্তুজীবনের সত্তা, জীব-অজীবে পার্থক্য প্রভৃতি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর কৈশোরকাল থেকেই নিজের মনে প্রশ্ন তুলেছেন, চিন্তা করেছেন।[১৭] এভাবেই মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। বিজ্ঞানমনস্ক আরজ আলী প্রশ্ন তুলেছেন জগত ও মানুষ সম্পর্কে। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তার বয়স কত? কিভাবে এর উৎপত্তি? দিনরাত কিভাবে হয়? কিভাবে মৌসুমের পরিবর্তন ঘটে? কোন্ প্রাণ দিয়ে প্রাণী জগতের শুরু? এ পৃথিবীর সঙ্গে বাকি জগতের সম্পর্ক? এ জগতের শেষ কোথায়? আরজ আলী মাতুব্বর এ সব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য যত ধরনের ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায় তা দেখেছেন, প্রচলিত ভাষ্যে নোট করেছেন। আর পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রত্নবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আবিষ্কার, তত্ত্বের খোঁজ করেছেন, সংগ্রহ করেছেন, অধ্যয়ন করেছেন। এভাবে প্রশ্নের উত্তর সন্ধান, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ, ধর্মসহ অন্য সবকিছুর মতো অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিজ্ঞান তাঁকে এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে যুক্তিসঙ্গত একটি কাঠামো দান করেছিল যা দিয়ে তিনি বিজ্ঞানের ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন।[১৮] আরজ আলী মাতুব্বর জগতের স্বরূপ অনুসন্ধান এবং সবকিছুকেই যুক্তির নিরিখে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন– সমকালীন প্রেক্ষাপটে তা

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তিনি রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয় সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন, বিজ্ঞানীরাই চাঁদের রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁর মতে, "কোনো তত্ত্বমূলক বিষয়ে তো নয়ই, যুক্তিহীন (আন্দাজী) কথা বাজারেও চলে না।"[১৯] যা মানবতাবাদী দর্শনের লক্ষ্যে অপরিহার্য এবং দেখা যায় তিনি আইয়নীয় দার্শনিকবৃন্দের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাত তাঁর মনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার চিরায়ত উৎস থেকেই জন্ম নেয় দর্শনের। তিনি সবকিছুতেই যুক্তির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত জ্ঞানকে তত্ত্ব, সত্য ও সত্তার সামগ্রিকরূপ বিচার-বিশ্লেষণে সচেষ্ট হলেন। অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান মন্তব্য করেছেন :

> জীবনে কোনো জিজ্ঞাসা না থাকলে জীবন হয়ে পড়ে আদর্শহীন। জীবনের সমস্যার কোনো অন্ত নেই। সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষ চলছে প্রগতির সঙ্গে। এই জিজ্ঞাসাই দিয়েছে মানুষকে প্রকৃতির শক্তিকে করায়ত্ত করার সন্ধান। এহছকার জীবনের জিজ্ঞাসায় যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা পাঠকের মধ্যে চিন্তার খোরাক যোগাতে সক্ষম হবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।[২০]

আরজ আলী মাতুব্বরের অজানাকে জানার অদৃশ্য কৌতূহল, বাস্তবতার প্রতি আগ্রহ এবং ধর্মানুভূতির প্রধান্যের পরিবর্তে প্রজ্ঞা ও যুক্তির প্রতি আস্থা, সমাজ চিন্তার উন্মেষে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এভাবে দেখা যায় আরজ আলী মাতুব্বর বাস্তববাদী দার্শনিক। মূলত দর্শনের সমগ্র ইতিহাসে ভাববাদ ও বাস্তববাদদের যে মূল দুটি ধারা বিদ্যমান, তার সূত্রপাত ঘটেছিল প্রাচীন গ্রিক দর্শনে। মানব চেতনার বিকাশে এবং বিশ্ব-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আদিকাল থেকে ভাববাদ ও বাস্তববাদের দ্বন্দ্ব চলে আসছে। দর্শনের এই দুটি প্রধান ধারা পরস্পর বিপরীত। প্রাচীন আইয়নীয় দার্শনিকগণ যে মতবাদ প্রদান করেছেন তা আজকের দিনের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও দর্শনের গোড়াপত্তন ও দার্শনিক আলোচনার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম প্রভৃতি সব শাখাতেই মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার একমাত্র কারণ মানুষের মধ্যে আছে নীতিবোধ, আছে নান্দনিকতা; আছে যুক্তি-বুদ্ধি, আছে মুক্ত-চিন্তা – যে কারণে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা। মানুষ তার যুক্তি, বুদ্ধি এবং বিবেচনার মাধ্যমে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুন্দর-অসুন্দরের বিচার বিশ্লেষণ করে যা কিছু মানুষের জন্য কল্যাণকর তাই গ্রহণ করে এবং মানবিক মর্যাদা সমুন্নত করতে পারে, যার ফল্গুধারা আরজ আলীর জীবনকে আপ্লুত করেছে।

পিথাগোরাস (খ্রিস্টপূর্ব ৫৬২-৪৯৩)-এর দার্শনিক মতবাদ মরমী ঐতিহ্যের প্রধান প্রতিনিধিত্বকারী হওয়া সত্যেও যুক্তিবিদ্যা পিথাগোরীয়বাদের একটি শাখা হিসেবে অভিহিত। পিথাগোরীয়বাদ হল অরফিক[২১]

Dhaka University Institutional Repository

মতবাদের একটি সংস্কারধর্মী আন্দোলন। আর অরফিক মতবাদ ডাইওনিসাস পূজার একটি সংস্কারধর্মী আন্দোলন। এভাবে পিথাগোরাসের মতবাদে সমাজে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানবিক মানমর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ধর্মীয় ও নৈতিক শৃঙ্খলাবোধ মানুষের জীবনবোধকে আলোকিত করতে সক্ষম – এমনই ধ্যান-ধারণা পিথাগোরীয় সম্প্রদায়কে সারুপভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ধর্ম, দর্শন ও নীতিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য তিনি নারী-পুরুষকে নিয়ে ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘে স্ত্রী ও পুরুষকে সমদৃষ্টিতে দেখা হতো, সম্পদে ছিল সকলের সম-অধিকার এবং জীবনযাপন ছিল সকলের সমান।[২২] প্রকৃত অর্থে পিথাগোরীয় সম্প্রদায়কে দার্শনিকগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা না গেলেও এটি ছিল ধর্মীয় ও নৈতিক শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রতিষ্ঠান। এ সম্প্রদায় বিশেষ ধরনের নীতিকথা প্রচারের জন্য দর্শনের ইতিহাসে বেশ আলোচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। 'আগুনকে-ছুরি দিয়ে নাড়বে না'; 'ন্যায় ও সমতার ভারসাম্য অমান্য করা অনুচিত'– ইত্যাদিও রূপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন, যা নৈতিকতার বাহক হিসেবে গণ্য হয়ে মানুষের মর্যাদার বৃদ্ধির কথা বলে। এ সম্প্রদায় আত্মহত্যাকে জঘন্য ও গর্হিত কাজ বলে মনে করেছেন যা মহৎ ও মানবোচিত জীবনের জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য।[২৩] এভাবে আরজ আলী মাতুব্বরও মানুষের চেতনায় আঘাত করে মানবিক চেতনায় উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন আজীবন। কোনো রকম অন্ধ গোঁড়ামি তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তিনি মানবিক মূল্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার।

সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সাধক ছিলেন আরজ আলী মাতুব্বর এবং এগুলোর সাধনার মাধ্যমেই ধর্মীয় ও নৈতিক শৃঙ্খলাবোধের সৃষ্টি হয়। সত্য, সুন্দর ও শুভ হচ্ছে জীবনের উচ্চতর মূল্য আর এ জন্য প্রয়োজন সুসামঞ্জস্য যুক্তি। তিনি সংলাপের ভঙ্গিতে যুক্তি, যুক্তির খণ্ডন ও নতুন যুক্তি প্রয়োগ করে[২৪] মানুষের মধ্যে নৈতিকতার সদ্ব্যবহারের কথা বলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস নৈতিকতাকে কেন্দ্র করেই মানুষ জঘন্য ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকবে, যা মহৎ মানবোচিত জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজন। তাই ধর্মকে দেখতে চেয়েছিলেন এভাবে: "আমাদের অভিযান শুধু অসত্য বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। প্রত্যেকটি ধর্ম থাকিবে মিথ্যার আবর্জনাবর্জিত ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[২৫] এভাবে পিথাগোরাসের দর্শনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোনো পরিচয় না পাওয়া গেলেও তাঁদের দর্শনে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা হয়ত আরজ আলী মাতুব্বর প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

পিথাগোরাসের মতে অধিবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যা অনেক ভ্রান্তির সৃষ্টি করে আর গাণিতিক জ্ঞান নিশ্চিত, যথার্থ এবং বাস্তবজগতে প্রয়োগযোগ্য বলে বিবেচিত। কোনো কিছু আবিষ্কারের শুরুতে অধিকাংশ বিজ্ঞানই কোনো না কোনো প্রকারের কাল্পনিক বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত থাকে ; . মিথ্যা বিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

ঐসব বিজ্ঞানকে কাল্পনিক মূল্য প্রদান করে, যেমন সূচনালগ্নে জ্যোতির্বিদ্যা জ্যোতিষতত্ত্বের সাথে এবং রসায়নবিদ্যা অ্যালকিমির (মধ্যযুগীয় রসায়নশাস্ত্র) সাথে সম্পর্কিত ছিল। পিথাগোরাসের মতে গাণিতিক ভ্রান্তি ছিল অধিকতর সূক্ষ্ম এবং গাণিতিক জ্ঞান ছিল নিশ্চিত, যথার্থ এবং বাস্তবজগতে প্রয়োগের যোগ্য। যেহেতু গণিতে কোনো পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া শুধু চিন্তনের মাধ্যমেই প্রকৃত জ্ঞান পাওয়া যায়, যে কারণে গাণিতিক জ্ঞান একটি আদর্শ প্রদান করে এবং এ আদর্শ থেকে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক জ্ঞান সম্ভব। গণিতের উপর ভিত্তি করেই অনুমান করা হতো যে, ইন্দ্রিয়বোধের চেয়ে চিন্তন এবং পর্যবেক্ষণের চেয়ে স্বজ্ঞা শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়ের জগৎ গণিতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে তার প্রধান ত্রুটিটি হবে ইন্দ্রিয় জগতেরই। এভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় পিথাগোরাস বিভিন্নভাবে গাণিতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা।[২৬]

আরজ আলী মাতুব্বরের ভিতরেও পিথাগোরাসের আদর্শ প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। তিনি ধর্মীয় রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্পষ্ট সত্য আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। দু'জনেরই একমত– গাণিতিক সত্য কখনো ভ্রষ্ট হতে পারে না, বরং গাণিতিক জ্ঞান মানুষকে সৎপথে চালিত করতে পারে। তাঁর মতে গাণিতিক জ্ঞান সত্য অনুসন্ধানের পথ দৃঢ় করে। সত্য অনুসন্ধানের মাধ্যমেই তিনি হয়েছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী। তাঁর মতে সত্যকে জানতে পারলে আর কোনো প্রশ্ন থাকে না। তিনি গাণিতিক সত্যের উপর জোর দেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এভাবে:

> কোনো বিষয় বা কোনো ঘটনা একাধিকরূপে সত্য হইতে পারে না। একটি ঘটনা যখন দুই রকম বর্ণিত হয়, তখন হয়তো উহার কোন একটি সত্য; অপরটি মিথ্যা অথবা উভয়ই সমরূপ মিথ্যা; উভয়ই যুগপৎ সত্য হইতে পারে না– হয়তো সত্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়।[২৭]

এভাবে পিথাগোরাসের মতো আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে গাণিতিক সত্যতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাস্তব সত্য (দৃশ্যময় জগতের সত্য) ও ইন্দ্রিয়াতীত বুদ্ধিগ্রাহ্য সত্যকে প্রমাণের জন্য গণিতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কারণ গণিতের সাথে যুক্তি জড়িত এবং যুক্তির সাথে সত্য জড়িত, অসত্যের ক্ষেত্রে কোনো যুক্তিই কার্যকরী হতে পারে না। পরিদৃশ্যমান জগতের সত্যতা কিংবা বুদ্ধিময় জগতের সত্যতা প্রমাণ করতে উচ্চতর চিন্তন অবশ্যই প্রয়োজন। যেমন গাণিতিক বস্তুর সংখ্যা যদি সত্য হয়–তবে তা হবে শাশ্বত সত্য। এভাবে শাশ্বত বস্তুকে ঈশ্বরের চিন্তন হিসেবে কল্পনা করা যায়। পিথাগোরাসই দর্শনে সর্বপ্রথম গণিত এবং গাণিতিক পদ্ধতির মাধ্যমে ধর্মের রহস্য উদ্ঘাটনের সূচনা

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে। গণিত ও ধর্মের এ সমন্বয় গ্রিস, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগে কান্ট[২৮] এবং সমকালীন প্রেক্ষাপটে আরজ আলী মাতুব্বর বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে ধর্মের রহস্য উদ্ঘাটনের সূচনা করেন। তিনি এর সপক্ষে যুক্তি দেন এভাবে: "বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাই কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আমাদের সন্দেহ নাই।"[২৯] গণিত ও ধর্মের এ সমন্বয় গ্রিস, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগে কান্ট এবং সমকালীন প্রেক্ষাপটে আরজ আলী মাতুব্বর পর্যন্ত ধর্মীয় দর্শনকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। ইন্দ্রিয়বোধের সঙ্গে বুদ্ধির মাধ্যমে উদ্ঘাটিত একটি শাশ্বত জগতের পূর্ণধারণা আরজ আলীর দর্শনে পাওয়া যায়। কারণ তিনি ধর্ম ও যুক্তির এবং নৈতিক আকাঙ্ক্ষার সাথে যৌক্তিক শ্রদ্ধার প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল ছিলেন।

সোফিস্ট নামে দার্শনিক গোষ্ঠী (আনু. খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০-৪০০) দর্শনে প্রকৃতিকেন্দ্রীয় প্রধান্যের স্থলে মানবিক ও নৈতিক সমস্যাবলির সরাসরি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রোটাগোরাসের মতে ব্যক্তিমানুষ নিজেই সত্যের পরিমাপক, নির্ধারক ও বিচারক। অর্থাৎ ব্যক্তিমাত্রই সদসৎ ও সত্যমিথ্যার মানদণ্ড। ফলে ব্যক্তি হবে সত্য-মিথ্যা, শুভ-অশুভের নির্ধারক ও বিচারক। জেলারের মতে: "সোফিস্ট দর্শনের বিষয়বস্তু হলো মানুষ, যে হলো ব্যক্তি এবং এক সামাজিক সত্তা।"[৩০] জ্ঞান, সত্য, নীতি ইত্যাদি প্রতিটির ক্ষেত্রেই সোফিস্টরা ব্যক্তিসত্তার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রতীচ্য দর্শনে সোফিস্টরাই প্রথম মানুষের স্বাধীন মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে পাশ্চাত্য দর্শনে সোফিস্টরাই প্রথমবারের মতো প্রশ্ন তুলেছেন, এ বিশ্বে মানুষের স্থান কী?[৩১] প্রচীত্য দর্শনে সোফিস্টরাই প্রথম মানুষের স্বাধীন মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করেন। আরজ আলীর দর্শনেও জ্ঞান, সত্য ও নীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তি সত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক। তাই আরজ আলী মাতুব্বরের ভাষায়: "অজানাকে জানার স্পৃহা মানুষের চিরন্তন, ... এই রকম 'কি' ও 'কেন'র অনুসন্ধান করিতেই মানুষ আজ গড়িয়া তুলিয়াছে-বিজ্ঞানের অটল সৌধ।"[৩২] এভাবে আরজ আলী মাতুব্বর প্রোটাগারোসের মতো বিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেন মানবিক মর্যাদার সৃষ্টির লক্ষ্যে। সোফিস্ট পূর্বযুগের দর্শন ছিল প্রকৃতিকেন্দ্রিক। কিন্তু সোফিস্ট যুগের দর্শন হয়ে দাঁড়াল মানবকেন্দ্রিক। পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতো তাঁরা কিন্তু প্রকৃতির মধ্য দিয়ে মানুষকে জানার চেষ্টা না করে সরাসরি মানুষকে জানার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সকল মনোযোগ মানুষের নিজের প্রতি নিবদ্ধ হলো। বুদ্ধির গুরুত্ব হ্রাস করে, প্রকৃতি ও জাগতিক সত্তার গুরুত্ব হ্রাস করে কেবলমাত্র মানুষকেই আলোচনার বিষয়বস্তু করে নেয়। মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আবেগ, অনুভূতি, মানব জ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সোফিস্টরা গুরুত্ব দেয়। এ কারণে তাঁদেরকে মানবতাবাদী দার্শনিক বলা হয়। তাঁরা বর্তমান নিয়ে ভাবে, পূর্ব নির্ধারিত কোনো কর্তৃত্বকে স্বীকার করে না। 'মানুষই তার আপন আদালতের চূড়ান্ত বিচারক'- এ

Dhaka University Institutional Repository

মানব ভাবনার ভিত্তিতে তাঁরা সত্য মিথ্যা নির্ধারণের কথা বলেন, তাঁরা মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা স্বীকার করেন এবং ভালমন্দ নির্ধারণকারী হিসাবে মানুষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবক্তা। প্রোটাগোরাস সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তিনি পুরাতনের মধ্যের জড়তা ও অন্ধত্বকে বাদ দিয়ে সব কিছুর মধ্যে একটা নতুন আলোর সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে যে মানবকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা-ই আধুনিক মানবতাবাদী দর্শনের মূল কথা। আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই মতবাদের প্রয়োগকে প্রয়োগবাদ বলা হয়। এই মানবতাবাদী প্রয়োগবাদের মূল প্রবক্তা হলেন F.C.S. Schiller (১৮৬৪ খ্রি. -১৯৩৭খ্রি.)। তাঁর মতে সমস্ত কাজ ও চিন্তন ব্যক্তিমানুষের সৃষ্টি যা তার নিজের প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্যে করা হয়। সমকালীন যুগে প্রয়োগবাদ বলতে যে দার্শনিক আন্দোলন ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে সোফিস্টদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রাথমিক উৎস বলা চলে। শিলার নিজেকে প্রোটাগোরাসের শিষ্য বলে মনে করতেন। সোফিস্ট অর্থ জ্ঞানী এবং তাঁরা নিজেদেরকে জ্ঞানী বলে মনে করেন। এ ছাড়া তাঁরা ঘোষণা দেন যে, তাঁদের নিকট কেউ শিক্ষার্থী হিসেবে আসলে তাদেরকে তর্কের নিয়মকানুন, বাগ্মিতা, শৈল্পিক উপস্থাপন, লোকপ্রিয় তত্ত্ব ইত্যাদি শেখানোর মাধ্যমে অন্য রকম মানুষকে পরিণত করতে পারেন।[৩৩]

এভাবে সোফিস্টরা মানুষের মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কথা বলেন। অপর দিকে আরজ আলী মাতুব্বর জগতের স্বরূপ অনুসন্ধান এবং সব কিছুকে যুক্তির নিরিখে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন যা মানবিক মর্যাদার বৃদ্ধিকল্পে সহায়ক ভূমিকা রাখেন। কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনায় আঘাত করে মুক্তচিত্তার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টাই ছিল তাঁর সংকল্প। সমাজের অচলায়তনে তাঁর রচনার এক একটি বাক্য হয়েছে এক একটি আঘাত। তাই সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব অস্বীকার করার অপেক্ষা রাখে না। মানবপ্রীতি ছিল তাঁর মধ্যে অপরিসীম। তাঁর চিন্তা চেতনায় সর্বদা বিরাজ করত মানবকল্যাণের লক্ষ্যে। স্বশিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক, আপোসহীন ও প্রতিবাদী দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর সারাজীবন লড়াই করে গেছেন মানবকল্যাণার্থে। আরজ আলী মাতুব্বর জ্ঞান অর্জনের কথা বলেন নিজের অজ্ঞতা দূর করার লক্ষ্যে। অজ্ঞতা দূরীকরণের লক্ষ্যেই শিক্ষার যত আয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজের অজ্ঞতা, অন্ধতা দূর করে– নিজেকে আরো উন্নত করার চেষ্টায় রত থাকা মানবতাবাদী দর্শনের মূল লক্ষ্য। তাই আরজ আলী মাতুব্বরের ভাষায় বলতে হয়:

> অজানাকে জানার স্পৃহা মানুষের চিরন্তন। বাক্যস্ফূরণ আরম্ভ হইলেই শিশু প্রশ্ন করিতে থাকে, এটা কি? ওটা কি? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে, কলেজে ও কাজে-কর্মে অনুরূপ প্রশ্ন চলিতে থাকে, এটা

Dhaka University Institutional Repository

> কি, ওটা কি, এরূপ কেন হইল, ওরূপ কেন হইল না ইত্যাদি। এই রকম 'কি' ও 'কেন'র অনুসন্ধান করিতেই মানুষ আজ গড়িয়া তুলিয়াছে বিজ্ঞানের অটল সৌধ।[৩৪]

আরজ আলী মাতুব্বর প্রশ্নের মাধ্যমে তৈরি করতে চেয়েছেন নিজ ব্যক্তিসত্তা; চিনেছেন নিজেকে, তিনি তাঁর মুক্তবুদ্ধির আলোকে নিজেকে চিনেছেন বলেই প্রশ্ন করেছেন সত্য সম্পর্কে, তাঁর ভাষায়:

> সত্যকে জানিতে পারিলে তাহার আর কোনো প্রশ্নই থাকে না। কিন্তু কোন সময় কোন কারণে কোন বিষয়ের সত্যতায় সন্দেহ জাগিলে উহা সম্পর্কে পুণরায় প্রশ্ন উঠিতে থাকে।[৩৫]

এভাবে আরজ আলী মাতুব্বর যা বলেছেন সহজ সরলভাবে বলেছেন, যা বুঝেছেন তা পরিষ্কার বুঝেছেন এবং যা তাঁর বিশ্বাসে ছিল তাই তিনি উচ্চারণ করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই: মানবতাবোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, যা মানবকল্যাণে অপরিহার্য। তাই দেখা যায়, সোফিস্টদের মতো আরজ আলী মাতুব্বরও মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। দার্শনিক চিন্তাধারাকে বাস্তবমুখী ও কার্যকর করে তোলার ক্ষেত্রে সোফিস্টরা যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁদের মানবতাবাদী চিন্তার মাধ্যমে পরবর্তীকালে মানুষের জন্য তাঁরা এ শিক্ষা রেখে যান যে, প্রকৃতি নয় বরং মানুষ নিজেই তাঁর চিন্তার প্রথম ও প্রধান সমস্যা। আর এই মানবতাবাদী দর্শন প্রচারের মাধ্যমে তাঁরা দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে এক নতুন প্রাণ ও প্রেরণার সঞ্চার করেন।[৩৬] আরজ আলী মাতুব্বরও তাঁর দর্শনে সোফিস্টদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি সমাজে অন্যায়কে অন্যায় বলে ভাবতে শিখিয়ে মানুষকে মানবিক মর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন: উদ্বুদ্ধ করেছেন যুক্তিবোধে।

গ্রিক দার্শনিক সোফিস্টদের মানবকেন্দ্রিক চিন্তাধারায় পরিপূর্ণতা লাভ করে সক্রেটিস (খ্রিস্টপূব ৪৬৯-৩৯৯) এর চিন্তায়। প্রাচীনযুগে সক্রেটিস বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে প্রমাণ করেছেন যে, একজন দার্শনিকের কাছে জ্ঞান, সত্য ও সুনীতির চেয়ে আর কিছু প্রিয় এ পৃথিবীতে নেই। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব মতামত থাকে, থাকে নিজস্ব সিদ্ধান্ত। যুক্তিবিদ্যার যুক্তিমালার গতি যেমন সিদ্ধান্তর দিকে; দার্শনিক চিন্তা, চেতনার গতিও তেমনি ধাবিত হয় নৈতিক ও পারমার্থিক জ্ঞানের দিকে এবং সর্বোপরি রূপ নেয় ব্যাপকভাবে মানবকল্যাণের মহান লক্ষ্যে। সক্রেটিস এমন এক দার্শনিক গোষ্ঠীর জনক যাঁদের নৈতিক আদর্শ ও মতবাদ পাশ্চাত্য সভ্যতায় তথা মানবকল্যাণে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে; যদিও দর্শন প্রচারের জন্য সক্রেটিসের কোনো নির্দিষ্ট স্কুল বা একাডেমি ছিল না। তিনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সাথে রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার যে কোনো স্থানে দর্শন আলোচনা করতেন।[৩৭] এই মহৎ সাধনা থেকে তিনি বিরত থাকতে পারেননি। তাই তৎকালীন গ্রিসের রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিহিংসাবশত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেও, তিনি মোটেও বিচলিত হননি। তিনি বলেছেন, কোনো ব্যক্তির নিকট সাধনা করবার মতো মহৎ যদি কিছু থেকে থাকে তবে তার নিকট প্রশ্ন, জীবন কিংবা মৃত্যুর নয়, বরং আপন কার্য সিদ্ধিতে সে কোনো অন্যায় ও অবিচারের আশ্রয় নিল কিনা তাই ভেবে দেখার বিষয়। এই মহান শিক্ষাগুরুকে বিষ পান করিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে তিনি একবারের জন্যও প্রাণ ভিক্ষা বা ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। বিষের পেয়ালা হাতে তাঁর শেষ উক্তি ছিল:

> বিদায় মুহূর্ত সমাগত! আসুন আমরা আপন আপন পথে অগ্রসর হই। আমি অগ্রসর হই মৃত্যুর পথে। আপনারা অগ্রসর হোন জীবনের পথে। কোন পথ মহত্তর? জীবনের কিংবা মৃত্যুর? বিশ্বনিয়ন্ত্রাই তার জবাব দেবেন।[৩৮]

অন্যায়ভাবে কিংবা অনুকম্পা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ন্যায় ও আদর্শের পথে থেকে নির্দ্বিধায় মৃত্যুকে বরণ করে তিনি ব্যক্তিসত্তার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করে গেছেন। এভাবেই তিনি তাঁর জীবনের সর্বত্র মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আরজ আলী মাতুব্বরও ধর্ম, বিশ্ব, জীবন, আত্মা সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলে গেছেন তা অসাধারণ। কোনো কিছু একাডেমিক শিক্ষা থেকে নয়; একেবারে নিজের মন থেকে, সক্রেটিসের মতো তিনিও প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে অতি অল্প শিক্ষিত, প্রায় অশিক্ষিত, কৃষক হয়েও তাঁর মধ্যে ছিল অদম্য জ্ঞানস্পৃহা ও জীবন জিজ্ঞাসা। সক্রেটিস যেমন মনে করতেন, এথেন্সসহ সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে ন্যায় ও সুনীতির বাণী প্রচার করা তাঁর পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আরজ আলীর তেমনটি মনে করতেন। তাই আরজ আলী মাতুব্বরও প্রচলিত বিশ্বাস মূল্যবোধকে আক্রমণ করেছেন প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। তিনি সকল মানব জাতিকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে মানুষকে বোধবিবেচনায় গড়ে তোলার মনোনিবেশ করেছেন। সক্রেটিসের মতো তিনিও সত্য, ন্যায় ও সুনীতির উদ্ঘাটনের জন্যই অজস্র প্রশ্ন মেলে ধরেছিলেন। আমাদের এই অচলায়তন সমাজে অত্যন্ত জরুরী ছিল সে প্রশ্নগুলি। যেমন তিনি মুরব্বিদের কাছ থেকে শোনা দিনরাতের কারণকে (কল্পকাহিনী) মোটেই মেনে নিতে পারেননি। জাগতিক বাস্তবভিত্তিক খুঁটিনাটি জানার আগ্রহের মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক আরজ আলী ঠিক মেনে নিলেন এ তথ্যটি, – আরজ আলী পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলেন যে, পৃথিবী ভাসছে শূন্যের উপর। এর কোন অবলম্বন নেই একমাত্র সূর্যের আকর্ষণ ছাড়া। পৃথিবী সূর্যের আকর্ষণে বাধা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে প্রায় গোলাকার কক্ষপথে ৩৬৫ $\frac{১}{৪}$ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে এবং নিজে ২৪ ঘন্টায় একবার ঘুরপাক খাচ্ছে। পৃথিবীর স্বীয় আবর্তনে দিন রাত হয় এবং কক্ষাবর্তনের ফলে বছর হয়। এভাবে অল্পশিক্ষিত আরজ আলী ভূমিকম্প, বজ্রপাত, শীত-গ্রীষ্ম

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদিরও সঠিক কারণটি বের করে তবেই সন্তুষ্টি পেতেন।[৩৯] কারণ তিনি অযৌক্তিক কথায় বিশ্বাস না করে যুক্তির আলোকে সব কিছু দেখতে চেয়েছেন।

সক্রেটিসের মতে, স্বাধীনতাই মানুষের স্বরূপ। এ কথা প্রমাণের জন্য তিনি চিন্তাশক্তির স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, একজন মানুষ প্রকৃত স্বাধীন হতে পারে কামনা-বাসনাকে জয় করে প্রজ্ঞা ও বোধি চালিত অনুশাসনের মাধ্যমে; আর তা হলো সততা। এভাবে তিনি প্রজ্ঞা ও সততাকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করেন। সততার অধিকারী হওয়া আর সৎকর্ম সম্পাদন করার অনিবার্য পর্যাপ্ত শর্তই হলো সততার জ্ঞান। এভাবে সততার জ্ঞান অর্থাৎ 'Knowledge is Virtue' অর্জনের মাধ্যমেই মানবিক কল্যাণ সম্ভব। তাঁর মতে, জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষ আত্মবিচারী হতে পারে যা তাকে নিয়মানুগ, সংযমী ও সুশৃঙ্খল জীবনাভ্যাস রপ্ত করতে সাহায্য করে। জ্ঞানের অনুশীলন মানুষকে সংযমী, রুচিশীল ও পরিণতিতে অধিক মননশীল করে তুলতে পারে। স্থবিরতা থেকে মুক্ত হওয়া, নিজেকে সুশৃঙ্খল করা, আত্মবিচারী হওয়া – এগুলো জ্ঞান থেকে ঘটে। "জ্ঞানই সদগুণ" বলতে সক্রেটিস এ বিষয়কে বুঝাতে চেয়েছেন। আত্ম-জ্ঞান সম্বন্ধে সক্রেটিস বলেন:

> এটি কি প্রমাণ হয় না যে, মানুষ নিজেকে জানে বলেই পরিণতিতে তারা স্বর্গসুখী হয় এবং [জানে না বলে] নিজেকে প্রতারিত করে মানুষ স্বীয় স্কন্ধে অনেক মন্দের ভাগ তুলে নেয়? কারণ যারা নিজেকে জানে তারা জানে তাদের জন্যে কী উপযুক্ত, এবং তারা কী করতে পারবে ও পারবে না এর মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে তারা সক্ষম...। নিজেদের সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান আছে বলেই তারা অন্যদের সম্বন্ধেও অভিমত গঠন করতে পারে, এবং, বাকি সমগ্র মানব জাতি সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা নিজেদের জন্যে যা কিছু ভাল তা অর্জন করতে পারে এবং যা কিছু মন্দ তা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।[৪০]

দেখা যাচ্ছে যে, আত্মজ্ঞানকে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান মনে করতেন। কারণ আত্মজ্ঞান থেকেই আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায়। আত্মজ্ঞান থেকে মানুষ কেবল নিজের জন্য নয় অপরের কল্যাণার্থেও কাজ করা সম্ভব। এভাবে আত্মজ্ঞান থেকে একটি জাতি এবং একটি রাষ্ট্র সে সার্থকতা লাভ করতে পারে তিনি তা দাবি করেন। মানবতাবাদী আরজ আলী মাতুব্বর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন মানুষ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠলেই সে অনুধাবন করতে পারে যে, পরম স্রষ্টার সৃষ্টিতে সে তুচ্ছ নয়, হেয় নয় বরং শ্রদ্ধেয় মহান। তাঁর আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান 'রবিনসন ক্রুশো'র জীবনী পরে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ এ উক্তি থেকে:

Dhaka University Institutional Repository

> মানুষের অসাধ্য কাজ নাই, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, সাহসে শক্তি যোগায় ইত্যাদি বহু প্রবাদ বচনের প্রত্যক্ষ উদাহরণ 'রবিন্‌সন'। আমার কর্মজীবনকে একান্তই প্রভাবিত করেছে 'রবিন্‌সন ক্রুশো,' দিয়েছে আমাকে স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা।[৪১]

আরজ আলী মাতুব্বরের মানবতাবাদ কোনো অন্ধবিশ্বাস বা গোঁড়ামির ওপর ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যুক্তি ও নীতির ওপর ভর করে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর উক্তিতে:

> মাস্টার এমদাদ আলী সা'ব ... আমার 'ধর্মীয় শিক্ষার সংকল্পে বাধাদান' করে আমার জীবনপ্রবাহকে বিপরীতমুখী করেছেন, বের করে দিয়েছেন আমাকে আলেম সমাজ হ'তে। আমাকে আধুনিক শিক্ষার পথ প্রদর্শন ও শিক্ষা লোভী করেছেন মোল্লা সা'বের 'বইএর বস্তাটি'। ওটা না পেলে আমি জ্ঞানরাজ্যের পথের সন্ধান পেতাম না, হয়ত চলে যেতাম অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের রাজ্যে, হয়ে পড়তাম কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ।[৪২]

আরজ আলী মাতুব্বরের দৃষ্টিতে মানুষের অবস্থান সবার উপরে; ধর্মশাস্ত্র, মসজিদ, মন্দিরের চেয়ে পবিত্র মানুষ। তাঁর মানবধর্ম ছিল মানুষকে কেন্দ্র করে মানুষকে বড় করে এবং অন্যসব মানুষের সঙ্গে সমান করে যে জীবননীতি তাকে বড় করে দেখা। সামাজিক অত্যাচার শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্তি, ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মতো বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিসহ সত্যিকারের ব্যক্তিস্বাধীনতা যে মতবাদের প্রাণস্বরূপ– সে মতবাদই ছিল আরজ আলী মাতুব্বরের ধর্ম। তিনি জগৎ ব্যাখ্যার মধ্যে জগতের মানবীয় পরিবর্তনে উৎসাহী ছিলেন। তাই তো তিনি বলেছিলেন:

> 'রবিনসন ক্রুশো'র বই ব্যাখ্যা দিয়েছে আমাকে স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা, অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে, উঁচু-নিচু সর্বস্তরের সকল কাজ স্বহস্তে করার উদ্দীপনা। ও বইটাই আমার যাবতীয় 'চেষ্টা' ও সাহস এর উৎস ওটা না পেলে হয়ত আমি হয়ে যেতাম অলস, অক্ষম ও পরাধীন অর্থাৎ অন্যের হাতের ক্রীড়া-পুত্তলী।[৪৩]

মানবতাবাদের চিন্তা ও কাজ সর্বদা মানব ও তার পরিবেশের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে। সমাজের অবহেলিত মানবাত্মার মুক্তির লক্ষ্যে আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে মানবতার জয়গান গেয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন মানবতার সপক্ষে একজন উঁচু মানের দার্শনিক হিসেবে।

গ্রিসের মহাদার্শনিক সক্রেটিস এথেন্সবাসীকে প্রশ্নের মাধ্যমে নীতি ও দর্শন শিক্ষা দিতেন। সক্রেটিসের দার্শনিক চিন্তার মূল প্রশ্ন–"আমি কে?" তিনি ছিলেন আত্মবিশ্লেষণী, বিচারবাদী, ন্যায়-

Dhaka University Institutional Repository

পরায়ণবাদ, নিয়মতান্ত্রিক, সংযমী ইত্যাদি গুণের অধিকারী। যার বলে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পেরেছিলেন। যে কারণে তাঁর প্রতিটি আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল নীতিসম্বন্ধীয়–অর্থাৎ তিনি সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। দীর্ঘদিনের পেলোপোনেসীয় যুদ্ধে এথেন্সবাসীরা পরাস্ত হতে থাকলে সক্রেটিস এ পরাজয়ের মূল কারণ হিসেবে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও অদূরদর্শিতাকে দায়ী করেন। ফলে সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং সমাজের কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি আপোসহীন নৈতিক সংগ্রাম ঘোষণা করেন।[৪৪] সক্রেটিস ছিলেন মানবতাবাদী দার্শনিক। তিনি নিজে অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু ছিলেন এবং মানুষও জ্ঞান অর্জন করুক এটা তিনি চাইতেন। কারণ তিনি জানতেন যথার্থ জ্ঞান মানুষকে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে, তাঁরা বিভ্রান্ত হবে না; জ্ঞানই মানুষকে বিভ্রান্ত থেকে মুক্ত করতে পারে। এ ব্যাপারে *মেমোরবিলিয়া* গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সত্য, সুন্দর, শুভময় জীবন তিনি প্রতিটি মানুষের জন্য কামনা করেছেন। এমন জীবন মানুষকে জ্ঞানই দিতে পারে; অজ্ঞানতা দিতে পারে না।[৪৫] আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন চরম মানবতাবাদী। তিনি অতিপ্রাকৃত উপায়ে কোনো প্রাকৃতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে অপারগ ছিলেন। তাঁর মতে, জ্ঞানই পারে অমানুষকে মানুষ বানাতে। তাই সাধারণ মানুষের নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে তিনি নিজ গ্রামাঞ্চলে লাইব্রেরি স্থাপন করেছিলেন।[৪৬] সক্রেটিসের মতো তিনিও অনুধাবন করেছিলেন সত্যিকার জ্ঞানের মধ্যেই অর্জন করা যায় সত্য, সুন্দর ও শুভময় জীবন।

সক্রেটিসের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে আলোকিত মানুষে পরিণত করা, নৈতিকতার প্রতি সংবেদনশীল হতে সহায়তা প্রদান করা। কারণ তৎকালীন দ্বন্দ্বমুখর রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় জনজীবনের কলহ, হানাহানি তাঁকে বিষোদগার করে তুলেছিল। তখনকার পারিপার্শ্বিক অসৎ, অন্যায় ও অসামাজিক সমাজব্যবস্থায়, যেখানে নৈতিকতার অবকাশ ছিল না – সক্রেটিসকে ভীষণভাবে পীড়া দিচ্ছিল। সক্রেটিস প্রকৃত জ্ঞান বলতে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল ইত্যাদিও সদগুণ বিষয়ক জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন; যা পূর্ণ নৈতিকতা লাভে অত্যন্ত সহায়ক। কাউকে আদেশের মাধ্যমে নৈতিকতার নাগপাশে আবদ্ধ করা যায় না। সক্রেটিসের জীবনকেন্দ্রিক প্রায়োগিক জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল; যে আলোচনায় মঙ্গল-অমঙ্গল, ন্যায়-অন্যায়, মিথ্যাচার, সাহস ইত্যাদি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণের স্থান পেয়েছিল অত্যন্ত বেশি। সক্রেটিসের দর্শনের মূলকথা হলো জ্ঞানই সদগুণ, যার প্রয়োগে আর্থ-সামাজিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করা যায়। এভাবে সক্রেটিস জ্ঞানানুশীলনকে নৈতিকতার মূলমন্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করে ঐকমত্য স্থাপন করেছিলেন; বর্তমান সমাজে যার প্রায়োগিক উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

সক্রেটিসের পন্থা ছিল প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে, কোনো বিষয়ের জ্ঞান ও সে বিষয়কে সঠিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। যদিও এরূপ অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নাবলি 'সবজান্তা' এবং প্রচলিত নিয়ম-নীতিতে বিশ্বাসী এথেন্সবাসীদের চঞ্চল করে তুলেছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে 'সবজান্তা' অভিজাতেরা আভিজাত্য ও পুরাতন সঙ্কীর্ণ জ্ঞান নিয়ে নির্বিঘ্নে থাকার জন্য পাঁচ শতাধিক বিচারক সক্রেটিসের বিচারের প্রহসন করেন। কিন্তু সক্রেটিসের সে শিক্ষা পদ্ধতি আজও দুনিয়ার মানুষকে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করে। বাংলাদেশের বরিশালের লামচরি পাড়াগাঁয়ের আরজ আলী মাতুব্বরও সক্রেটিসের পদ্ধতিতে মানুষের নীতি, বিশ্বাস ও প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসকে ঝড়ের বেগে নাড়া দিয়েছেন। ধর্ম বিশ্বাসকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি অসংখ্য প্রশ্ন করেছেন। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে 'সত্যের সন্ধান'।[৪৭] সক্রেটিসের মতো আরজ আলী মাতুব্বরের মনেও ছিল নানা রকম জিজ্ঞাসা। নানারকম প্রশ্নবাণে কোনো বিষয়ের জ্ঞান এবং সে বিষয়ে সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই ছিল তাঁর দৃঢ়প্রত্যয়। সক্রেটিসের মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁরও ভাগ্যে জোটেনি; প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের পরোয়াও করেননি তিনি। তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল মূলত ধর্মীয় জগতের বিধিনিষেধের উপর আচার অনুষ্ঠান ও ঘটনাবলির উপর। তাঁর জিজ্ঞাসার জবাবের জন্যই মূলত আরজ আলী মাতুব্বর প্রথাগত জ্ঞানার্জন শুরু করেন এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই তিনি এ সত্যটি মরমে উপলব্ধি করেন যে, বিজ্ঞান চর্চার বিকাশের সঙ্গে পরিচিত হলেই তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে। সক্রেটিসের মতো তিনিও শিক্ষক-ক্লাসরুম ছাড়া বিজ্ঞানের নানা শাখা রপ্ত করতে চেষ্টা করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে।

সক্রেটিস এথেন্সবাসীকে নানারকম প্রশ্ন করে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতেন। আর আরজ আলী মাতুব্বর সুদীর্ঘকালের লালিত বিশ্বাস, প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের মূলে আঘাত হেনে প্রশ্ন রেখেছিলেন সৃজনশীল তৎপরতার এবং কেবলমাত্র সৃজনশীল মানুষের ক্ষেত্রেই তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তেজনা ও উদ্বেগ অনুভব করার ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। ধর্মকে ঘিরে সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসের উপর তাঁর প্রশ্নগুলি তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণ হয়ে গভীরভাবে বিধতে থাকে তাঁকে। প্রশ্নের উত্তর না পেলে তিনি দমে থাকেননি কখনো বরং আরো তীব্রভাবে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করার প্রেরণা তিনি অনুধাবন করেছেন। আর এ প্রশ্নগুলি গড়ে উঠেছিল প্রচলিত পুরাণকে ঘিরে। যুগ যুগ থেকে পুরাণকে জড়ানো হয়েছে ধর্মের সঙ্গে। ধর্ম ও পুরাণ একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ধর্ম যুগে যুগে পুরাণকে হাত ধরে প্রাগ্রসরমান। ধর্মের রক্তমাংস হলো তার পুরাণ। ধর্ম লোপ পেলেও তার পুরাণগুলি টিকে থাকতে পারে সংস্কৃতির ভেতর, যা ব্যবহারের মাধ্যমে বড় বড় শিল্পকর্ম তৈরি হতে পারে। আবার ধর্ম থেকে পুরাণকে কেড়ে ফেলতে চাইলে তা পর্যবসিত হয়– বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায়, কারণ

Dhaka University Institutional Repository

পুরাণবিহীন ধর্মে 'ভক্তি' নামক কথা অর্থাৎ যা ধর্মের প্রাণ,তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরদিকে সংশয়কে ঝেড়েমুছে ফেলতে চাইলে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায় – ফলে জীবন যাপনকে মার্জিত করার নতুন নতুন প্রয়াসের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আরজ আলী মাতুব্বরের প্রশ্ন ছিল এসব পুরাণের অবাস্তবতাকে ঘিরে, অস্বাভাবিকতাকে ঘিরে যা প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতির ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দেয়, আঘাত করে মানুষের মূল ধর্ম বিশ্বাসে। তাই আইয়ুব হোসেন সত্য সন্ধানী আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে মন্তব্য করেন এভাবে:

> ... *অনুমান* তাঁর অপর একটি পুস্তকের নাম। ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যে অলীক কল্পকাহিনী বা কাল্পনিক চরিত্র যুক্ত হয়ে আছে–তার অসারত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন । কারণ রাবণ, ফেরাউন, শয়তান – এগুলো হিন্দু ও মুসলিম ধর্মে অতিশয় লিপ্সিত চরিত্র। রস, ক্রোধ বা বিভিন্ন উপাদেয় কাহিনীর মাধ্যমে এই চরিত্রগুলো সম্পর্কে বিরূপতা বা ঘৃণা বর্ষিত হয়ে এসেছে। লেখক সব কল্পকাহিনীর বিপরীতে যুক্তিবাদিতার কাহিনীর উদ্ভটত্ব প্রমাণ করেছেন অনুমান পুস্তকে।[৪৬]

আরজ আলী মাতুব্বরের মতে, বিজ্ঞানচর্চার মূলমন্ত্র হতে হবে সংশয়। এমনকি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ হতে হবে সংশয়পীড়িত চিত্ত। এ ধরনের সংশয়ের কারণেই তিনি বিজ্ঞান পাঠকে অপরিহার্য বলে মনে করেন এবং বিজ্ঞান পাঠের ফলে সংশয় আরো তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠলে আরজ আলী মাতুব্বর এই ধর্ম ভর্জরিত সমাজে হয়ে ওঠেন একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি। সক্রেটিসের মতো এই প্রশ্নগুলি গ্রামের আরো বিভিন্ন মানুষের সামনে তুলে ধরলে প্রতিষ্ঠিত হয়–একটি ভিন্ন জগৎ, যার ভিত্তি ছিল ধর্ম। তাই আরজ আলী মাতুব্বর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব না হয়েও অজপাড়াগাঁয়ে বাস করেও–রাষ্ট্রের বিরূপ দৃষ্টিতে পড়েন, দেশদ্রোহী বলে তাঁকে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়[৪৯] - ঠিক যেমনটি হয়েছিল সক্রেটিসের বেলায়।

সক্রেটিসের মতো রাষ্ট্রের বিরূপ ধারণা ছিল আরজ আলী মাতুব্বরের মুক্ত চিন্তাচর্চার ওপর: মুক্তবুদ্ধি ও চর্চার উপর প্রচলিত বিশ্বাসকে ক্ষণভঙ্গুর করার মতো চিন্তাভাবনা থেকে, প্রশ্ন করা থেকে তিনি বিরত থাকার মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে যদিও বেরিয়ে এসেছিলেন; তবুও শেষ পর্যন্ত তিনি মুচলেকা রক্ষা করেননি বরং তিনি নিয়োজিত হন আপন জিজ্ঞাসা ও সংশয়কে ঝেড়ে ফেলার কাজে। কারণ মুচলেকার মালিক যে রাষ্ট্র তার চেয়ে তিনি ছিলেন অনেক বড় মাপের শক্তি।[৫০] এখানে সক্রেটিসের সাথে তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের হুবহু মিল রয়েছে।

সক্রেটিস সমাজের কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম করেছিলেন। তৎকালীন সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। ফলে তিনি রক্ষণশীলদের বিরাগভাজন

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছিল অনেক ভিত্তিহীন অভিযোগ। যেমন যুবকদের দুর্নীতিপরায়ণ করা, জাতীয় দেবতাদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি করে নতুন দেবদেবীর পরিকল্পনা প্রভৃতি বেআইনী ও ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের দায়ে সক্রেটিসের বিচার হলো এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। তবে প্রচলিত রক্ষণশীল ধর্মমতের প্রতি সমর্থন ও প্রকাশ্যে দেবদেবীর যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শনের আশ্বাস দেয়া হলেও ন্যায় ও সুনীতি রক্ষার স্বার্থে তিনি মৃত্যুকেই বরণ করেছিলেন অবিচলিতভাবে। এভাবে যুক্তির উপর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ত্রিশ দিন কারাগারে অতিবাহিত করার পর– হেমলক লতার বিষপানে মৃত্যুবরণ করেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানগুরু। তিনি যদি কম অনাপোসকারী হতেন তাহলে এই মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতেন। কিন্তু এটি ছিল দর্শন ও দার্শনিকদের জন্য দেবত্বপ্রাপ্তি। তাই জেলার বলেন:

> The death of Socratic was the greatest triumph of his cause, the crowning success of his life, the apothesis of philosophy and the philosopher.[২১]

আরজ আলী মাতুব্বরকে যদিও প্রাণ দিতে হয়নি তবুও সব প্রতিষ্ঠান, সব আদর্শ ও প্রচলিত সব আচার ব্যবহার যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করতে গিয়ে কারাবরণ করতে হয়েছিল। পড়তে হয়েছিল তৎকালীন সরকারের রোষানলে। সক্রেটিসের মতো আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন রেনেসাঁসের মানুষ। রেনেসাঁ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ঘটায়, মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটায়। আরজ আলী মাতুব্বরের মনেও সংশয়, প্রশ্ন–ইত্যাদির মাধ্যমে তৈরি হলো যুক্তি। আবার সে যুক্তিকে তিনি গ্রহণ করলেন বিজ্ঞানের অনুমোদনের মাধ্যমে। প্রচলিত বিশ্বাসকে খণ্ডন করতে গিয়ে নিগৃহীত হন তিনি। তবুও নিজের চিন্তায় কাজ করে, আপোসবিহীন কাজ করে গেছেন। রেনেসাঁসের আর একটি বিশেষ উপার্জন হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা যার প্রভাব সক্রেটিসের মধ্যেও ছিল অত্যন্ত প্রকট। যুক্তিবাদী মানুষ যখন চারিদিকে অবিচার ও দুঃখের অন্তহীন দৃষ্টান্ত দেখতে পান, তখন তাঁরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন, স্বরাট হন নিজ চিন্তা চেতনায় – যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সক্রেটিস ও আরজ আলী মাতুব্বর।

সক্রেটিস ছিলেন সৃজনধর্মী ও মননশীল ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন সময়ে দেশে স্থায়ী ও অত্যাবশ্যক সংস্কার সাধনের জন্য সক্রেটিসের মতো মহাপুরুষের বড়ই প্রয়োজন ছিল। বিবেককে উচ্চাসন দেওয়া এবং সর্বজনীন অক্ষর সত্য আবিষ্কার করার জন্য তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়। যে সময় মানুষ সৎ গুণগুলোকে আপেক্ষিক গুণ হিসেবে অভিহিত করত এবং যখন মানুষ বিবেকবাণী অনুসরণ ও ভালো-মন্দের বিচার না করে অন্ধ অনুসরণের উপর বিশ্বাসী ছিল, ঠিক

Dhaka University Institutional Repository

সে সময়ই সক্রেটিস বিবেকের প্রভুত্ব ও ব্যক্তিগত খামখেয়ালির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সাহসী হয়েছিলেন; যা তৎকালীন যুগে মানবিক মর্যাদা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, যে বিষয়টি বর্তমান প্রেক্ষাপটেও মানব কল্যাণের জন্য অপরিহার্য।

ঠিক তেমনি বিংশ শতাব্দীকে আরজ আলী মাতুব্বরের মতো আর একজন সৈনিকের আবির্ভাব ঘটেছিল যিনি সাহসী চিত্তে যুক্তির নিরিখে ধর্মান্ধতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার চেষ্টায় রত ছিলেন। ধর্মান্ধতা পুনরুজ্জীবনের পাঁয়তারা, রাজনীতিতে অবাধগতিতে ধর্মের ব্যবহার, পুরাণের অস্বাভাবিকতা, ধর্মের বিধান ও ফতোয়া জারি যখন মানুষকে পঙ্গু করে ফেলতে চায়– তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে এ ধরনের স্বশিক্ষিত কিন্তু আত্মাসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের। কারণ সমাজে এক ধরনের আত্মমর্যাদাবোধ শূন্য উচ্চ শিক্ষিত গোষ্ঠী আছেন যাঁরা বিজ্ঞানবিমুখ ধর্মান্ধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকেন। বিজ্ঞান ও যুক্তিকে আড়ালে রেখে প্রযুক্তির ব্যবহার করতে গেলে সৃষ্টি হয় মারাত্মক সাংস্কৃতিক শূন্যতার ও শক্তির অপব্যবহার। কাজেই সমাজে এ ধরনের দুঃসময়ের জন্য বড়ই প্রয়োজন হয়ে পড়ে আরজ আলী মাতুব্বরের মতো এমন এক ব্যক্তিত্বের; যিনি অত্যন্ত সাহসী চিত্তে একদিকে প্রশ্ন করতে পারেন প্রচলিত বিশ্বাসকে, সন্দেহ করতে পারেন ধর্মের সাথে জড়িত পুরাণকে, অপরদিকে যিনি মুক্ত চিন্তাচর্চায় বিজ্ঞানের সাহায্যে শনাক্ত করতে পারেন মানুষের অসীম সম্ভাবনাকে। সক্রেটিসের মতো তিনি আমৃত্যু মুক্তচিন্তা করে গেছেন যুক্তিকে অবলম্বন করে। প্রয়োজন হয়ে পড়ে আরজ আলীর মতো মুক্তবুদ্ধি লোকের। কারণ আধুনিক জগতের মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞানদীপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে বাঙালি জাতি অনেক পিছিয়ে আছে। অন্যের হাবভাব আচার-ব্যবহার, গতিবিধি সমস্তই হুবহু অনুকরণ করার প্রবল ইচ্ছা আমাদের মধ্যে জাগ্রত আছে। কিন্তু কোনো কিছুই বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা না করে গ্রহণ করা উচিত নয়, আর তার জন্য প্রয়োজন মুক্তবুদ্ধির। মুক্তবুদ্ধির দ্বারা বিচার করে গূঢ় সত্য সম্পর্কে বিশেষরূপে নিঃসন্দিহান হয়ে তা গ্রহণ করলে আর ভাববিপর্যয় ঘটে না বরং উক্ত বিষয় জ্ঞান আরো প্রখর হয়। যুক্তি বিচার-বিশ্লেষণই হলো মৌলিক চিন্তার জনক ও পরিপোষক। তাই তো সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর "প্রাণের কথা" প্রবন্ধে বলেছেন:

> মানুষের রক্ষা করবার অর্থ হচ্ছে আমাদের দেহ ও মনের মুক্ততার রক্ষা, আমাদের সকল চিন্তা সকল সাধনার ঐ একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে জীবন যত মুক্ত, সে জীবন তত মূল্যবান। ... মানুষের পক্ষে জীবন রক্ষা করার অর্থ- জীবনের উন্নতি করা। মানুষের ভিতরে বাইরে যে গতিশক্তি আছে তা মানুষের মতির দ্বারা নিয়মিত ও চালিত। এই মতিগতির শুভ পরিণয়ের ফলে যা জন্মলাভ করে তারই নাম উন্নতি। আমাদের মনের অর্থাৎ বুদ্ধি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনেই আমরা মানবজীবনের

Dhaka University Institutional Repository

সার্থকতা লাভ করি। জীবনকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করে তোলা ছাড়া আয়ু বৃদ্ধির অপর কোনো অর্থ নেই।[৫২]

এভাবে আরজ আলী মাতুব্বর ও সক্রেটিস জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের পরিবর্তে বুদ্ধিকে প্রধান্য দেওয়ায় তাঁর চিন্তায়, জ্ঞান ব্যক্তিগত না হয়ে বস্তুগত সত্যে পরিণত হয়েছে।

সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪৭২-৩৪৭) মানব প্রকৃতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ মানুষ বী-শক্তিসম্পন্ন প্রাণী। আর মানব প্রকৃতির পরিপূর্ণ বিকাশকেই প্লেটো নৈতিক আদর্শরূপে চিহ্নিত করেছেন। সক্রেটিসের মতে যেহেতু মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব, সেহেতু তাকে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হবে নৈতিকতার আলোকে, আর এই নৈতিক আদর্শের সাথেই জড়িত আছে মানবকল্যাণ বা মঙ্গল। এ প্রসঙ্গে প্লেটো মানবিক মর্যাদা লাভের জন্য মানবাত্মার প্রধান চারটি গুণ যেমন- বিজ্ঞতা, সাহসিকতা, মিতাচার ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। দার্শনিকরা যেহেতু বেশি শিক্ষিত সেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনার ভার– অর্থাৎ রাষ্ট্রের ন্যায় অন্যায় বিচারের ক্ষমতা তাদের হাতে ন্যস্ত করার কথা বলেছেন। এভাবে প্লেটো তার ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের মর্যাদার স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। প্লেটোর জন্মের সময় তাঁর মাতৃভূমি এথেন্স ছিল জাতীয় সংকটের সম্মুখীন। দীর্ঘদিনের যুদ্ধের পর প্রতিবেশী স্পার্টার হাতে এথেন্স পরাস্ত হলে তেইশ বছরের যুবক প্লেটোর মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা–ই যুগিয়েছে তাঁর সামাজিক ও নৈতিক দর্শনের মূল প্রেরণায়। তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নৈতিক জ্ঞানের অভাবে এথেন্সবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা ও অধঃপতনের মূল কারণ। তাদের এই দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনবোধ করলেন যা মানুষকে সুবিচার বা ন্যায়পরতার ধারণার সাথে পরিচিত করে তুলবে। আর এই ন্যায়পরতাকে কিভাবে ব্যবহারিক জীবনে সুষ্ঠভাবে প্রয়োগ ও অনুশীলন করা যায় তা–ই ছিল প্লেটোর সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শনের প্রধান লক্ষ্য। তিনি ব্যক্তিমানুষের সীমিত গণ্ডিতে ন্যায়পরতার প্রতিফলন দুর্বোধ্য ও বিভ্রান্তিকর বলে মনে করেন। তাই তিনি সন্ধান করেছেন এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার, যেখানে থাকবে সুবিচার ও ন্যায়পরতার স্পষ্ট প্রতিফলন। তার মতে যথার্থ দার্শনিকের লক্ষ্যবস্তু হবে সত্যের প্রতি আকর্ষণ এবং মিথ্যার প্রতি অবজ্ঞা।[৫৩]

আরজ আলী মাতুব্বর প্লেটোর মতো ভাববাদী না হলেও নৈতিকতার আলোকে মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছেন। আর নৈতিকতা অবশ্যই বুদ্ধিনির্ভর এবং সঙ্গে সঙ্গে মুক্তবুদ্ধি নির্ভর হলেই সেখানে যুক্তির উপস্থিতি থাকবে। ফলে মানুষ লোভ-লালসা বর্জন করে স্বার্থের পরিবর্তে সার্বিক কল্যাণে মনোনিবেশের কথা বলেন। আরজ আলী মাতুব্বরের নৈতিকতার কথা বলতে গেলে

Dhaka University Institutional Repository

বলতে হয় তিনি ছিলেন সক্রেটিসের মতো আত্মবিশ্লেষণী বিচারবাদী, ন্যায়পরায়ণবাদী, নিয়মতান্ত্রিক, সংযমী ইত্যাদি গুণের অধিকারী। তাইতো প্রবন্ধকার আইয়ুব হোসেন বলেন:

> সৎ ও সহজ জীবণাচরণের অধিকারী আরজ আলী মাতুব্বর সাদামাটা আটপৌরে জীবনযাপন করতেন, জীবনের কোনো ক্ষেত্রে বাহুল্যতার কণামাত্র ছিল না। সততার ঘাটতি ছিল না একবিন্দু ও জীবনের কোনো পর্যায়ে। তার মতের সাথে দ্বিমত পোষণকারী ব্যক্তিও তাঁর সততায় মুগ্ধ হয়েছেন। তার সত্যবাদিতায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।[৫৪]

সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। মানুষ সব কিছু যুক্তির নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করলে একটি সমাজকে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আরজ আলী মাতুব্বরও তাঁর দর্শনে যুক্তির নিরিখে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আলোকে একটি সুখী সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, ঠিক যেমন প্লেটো যুক্তি ও নীতির উপর ভিত্তি করে দেখেছিলেন একটি আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন। তাঁর মতে যথার্থ দর্শনের লক্ষ্যবস্তু হবে সত্যের প্রতি আকর্ষণ। ন্যায় বা যুক্তির আলোকে মানবিক মর্যাদা অর্জন করতে পারলে মানুষ লোভ-লালসা বর্জন করে ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে সার্বিক কল্যাণে মনোনিবেশ করতে পারবে এটাই ছিল আরজ আলী মাতুব্বরের বিশ্বাস। এ হিসেবে তাঁকে পরার্থবাদমূলক নীতিবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। পরার্থবাদ নিজের স্বার্থ ব্যতীত অন্যান্য মানুষের স্বার্থোদ্ধারের কথা ভাবে। আরজ আলী মাতুব্বরের বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। "গ্রামের 'কৃষক' আরজ আলী মাতুব্বর জনকল্যাণে নিজের যাবতীয় সম্পত্তিকে তো বটেই। অধিকন্তু জীবন সায়াহ্নে নিজের চক্ষু দুইটি এবং মরদেহ দানের কথা ঘোষণা করিয়া এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন"।[৫৫]

প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নারী ও পুরুষদের সমান মর্যাদা দিয়েছেন। যে শিক্ষার কল্যাণে একজন পুরুষ যথার্থ অভিভাবক হতে পারেন, ঠিক একই শিক্ষার ফলে একজন মহিলাও একই রকম উপযুক্ত হতে পারেন। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে প্লেটো নারী-পুরুষের সমতার সুপারিশ করেন এবং উপযুক্ততা অনুসারে পুরুষের ন্যায় নারীদেরও দেশের যেকোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করার পরামর্শ দেন।[৫৬] প্লেটো এভাবে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেন। প্লেটোর মতো আরজ আলী মাতুব্বরও নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা চিন্তা করে তালাকের ঘটনার পর 'হিল্লা বিয়ে' প্রথাকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে এই বিয়ের প্রথা, অন্যান্য আরও অনেক আইনের মতো, অনেক নারীর জীবনকে বিষময় ও বিপর্যস্ত করেছে, অনেক নারীকে ভয়াবহ অপমানের মধ্যে ছুড়ে ফেলেছে – তার পরিসংখ্যান বের করা

Dhaka University Institutional Repository

অসম্ভব। আরজ আলী বলেন, পুনঃগ্রহণযোগ্য নির্দোষ স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে 'হিল্লা-প্রথার' নিয়মে স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত করতে হয় সেই নির্দোষ স্ত্রীকেই। একের পাপে অন্যকে প্রায়শ্চিত করতে হয়।[৫৭] তিনি এটা কখনো মেনে নিতে পারেন নি। লক্ষণীয় তিনি এখানে নারী-পুরুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন, অর্থাৎ নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন, এ কারণেই তিনি তালাক প্রথার কঠোর সমালোচনা করেছেন।

প্লেটোর চিন্তার প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী যে, আজ অবধি দার্শনিক চিন্তায় তাঁর আধিপত্য ঈর্ষান্বিত। এমনও বলা হয় : "সমগ্র ইউরোপীয় আধুনিক দর্শন প্লেটোর ফুটনোট মাত্র"।[৫৮] অপর দিকে আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তার গভীরতা দেখে এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে বরিশাল বি.এম. কলেজের দর্শনের অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদের বলতেন– 'স্বশিক্ষিত বিদ্যাসাগর'। অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের ভাষায় : 'বাংলাদেশের একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি', আর অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলামের ভাষায় : *Moving Encyclopedia'* বা 'চলমান জ্ঞানকোষ'।[৫৯] যুগ যুগের পার্থক্যে এ দুই দার্শনিকের চিন্তা চেতনা ও জ্ঞানের পরিধি কোনো যুগেই অম্লান হবে না।

প্লেটোর স্বনামধন্য শিষ্য এরিস্টটল (খ্রি. পূ. ৩৮৪-৩২২) তাঁর বিভিন্ন রচনায় মানবিক মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি রাজনীতি ও নৈতিকতা সম্পর্কীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে, মানুষ সামাজিকভাবে বেঁচে থাকার জন্যই প্রয়োজন সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি। রাষ্ট্রের লক্ষ্য সামাজিকভাবে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। আর তা হবে সার্বিক মানুষের নৈতিক ও প্রাজ্ঞিক জীবনে গঠন করা।

এরিস্টটল রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে মানুষের মর্যাদার গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তাঁর মতে রাষ্ট্র হলো আকার বা রূপ, আর মানুষ হলো রাষ্ট্রের অঙ্গ বা উপাদান। মানুষ রাজনীতি সচেতন বলে তাঁর জীবনের প্রয়োজনীয় কার্যকলাপের দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই। তাই মানুষবিহীন রাষ্ট্রের কল্পনা অর্থহীন। মানবিক মূল্যবোধ তাঁর কাছে এতই প্রবল ছিল যে তিনি দাসপ্রথার অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন যার ফলে ক্রীতদাসকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসেবে অবিহিত করেছেন।[৬০] এরিস্টটল তাঁর মানবকেন্দ্রিক আলোচনায় মানব পরমকল্যাণের উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। পরমকল্যাণ হলো কাজের লক্ষ্য যা ব্যক্তি তার নিজের জন্যই কামনা করে। এ পর্যায় তিনি নীতিশাস্ত্রীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যার ফলে মানুষের চারিত্রিক গুণাবলির উন্নতিসাধন হতে পারে। আরজ আলী মাতুব্বরও মানুষের চারিত্রিক গুণাবলির উন্নতি সাধনের কথা বলেছেন, মানবজাতির আচরণের সুনীতিমূলক চর্চার কথা বলেছেন। মানবতাবাদী দর্শন ও আচরণের চর্চার মাধ্যমেই সমাজকে বহুলাংশে প্রগতিপরায়ণ করা সম্ভব। আর আরজ আলী মাতুব্বর নিজেই এক্ষেত্রে পাথেয় ও অনুসরণীয়। উদাহরণ স্বরূপ, আমিন পেশায়

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োজিত থাকাকালে তার দর্শনের ঘোরতার বিরুদ্ধবাদী বরিশালের চরমোনাইয়ের পীরসাহেব নিজের জমি সূক্ষ্মভাবে মাপার জন্য সততার মাপকাঠিতে আরজ আলীকে উপযুক্ত লোক মনে করেছিলেন।[৬১] এরিস্টটল ছিলেন অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখাতে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। জার্মান দার্শনিক হেগেল ছাড়া প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক কালের কোনো দার্শনিকই জ্ঞানের এত বিপুল সমারোহ ঘটাতে পারেননি। যুক্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রায় সব বিজ্ঞানই এরিস্টটলের দার্শনিক চিন্তার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর যুগে সমাজে যত জ্ঞান-ভাণ্ডার জমা ছিল তা বোঝার জন্য এরিস্টটলের গ্রন্থাদি বিশ্বকোষের কাজ করত।[৬২] অপর দিকে 'উপবাস' আর 'ছিন্নবাস' দিয়ে যদিও আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন শুরু, তবুও তিনিও এরিস্টটলের মতো ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন অধ্যয়ন করেছেন, নিয়মিত কৃষিকাজে ব্যস্ত থেকেও রচনা করেছেন ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ।[৬৩]

দীর্ঘকালের ব্যবধান থেকেও জ্ঞান চর্চার প্রতি অদম্য আগ্রহের কারণে দু'জনেই জ্ঞানচর্চার জন্য প্রচুর বই[৬৪] সংগ্রহ করতেন এবং অর্থ ব্যয় করতেন। সে সময় তিনি ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন এবং তাঁর অনেক শিষ্য এই লাইব্রেরিতে অধ্যয়ন করতেন। এরিস্টটল পেশাদার শিক্ষকের মতোই শিক্ষা দিতেন বলে তাকে প্রথম শিক্ষক বলা হয়ে থাকে। রাসেল বলেন :

> Aristotle, as a philosopher, is in many ways very different from all his predecessors. He is the first to write like a professor: his treatises are systematic, his discussions are divided into heads, he is a professional teacher, not an inspired prophet.[৬৫]

অর্থাৎ এরিস্টটল তাঁর পূর্ববর্তীদের চেয়ে ভিন্নতর ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র প্রেরণা দিয়েই শেষ করতেন না। সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে রচনা করে তিনি যথার্থ অধ্যাপকের মতো কাজ করতেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান ছিল অপরিশোধ্য। আরজ আলী মাতুব্বরও শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে গড়েছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (১৯২৫)। নিজে দ্বিতীয় শ্রেণীর বেশি পড়ার সুযোগ না পেলেও, বিনা বেতনে ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। ১৯২৫ সালে লামচরি গ্রামে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। শেষ জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরি'। সারা জীবনের অর্জিত সম্পত্তির বেশির ভাগ দান করেছেন এই পাবলিক লাইব্রেরির জন্য।[৬৬] সাহিত্যিক বদরুদ্দীন উমরের ভাষায়:

Dhaka University Institutional Repository

> অধিমানসিক (intellectual) অনেক উঁচু স্তরে অবস্থান করেও তিনি নিজের জীবিকা হিসেবে কৃষি কাজই করতেন। শিক্ষিত হয়ে শারীরিক শ্রমবিমুখ 'ভদ্রলোক' সাজার চিন্তা তাঁর মনে কখনও ঠাঁই পায়নি। স্কুল কলেজের কোনো অনুষ্ঠানে শিক্ষার সুযোগ না পেলেও কৃষি কাজ করেই তিনি নিজেকে শিক্ষিত করেছিলেন। তাঁর উপার্জনের একটি বড় অংশ ব্যয় করেছিলেন বইপত্র কেনার জন্য।[৬৭]

এভাবে আরজ আলী মাতুব্বর ও এরিস্টটলকে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। এরিস্টটলপরবর্তী যুগ হল দর্শনের প্রাচীন যুগের শেষ পর্ব। এ যুগে মানবকেন্দ্রিক দর্শনের বিকাশে যার অবদান সর্বাধিক অগ্রগণ্য তিনি হলেন এপিকিউরীয় দর্শনের স্থপতি এপিকিউরাস (খ্রি. পূ. ৩৪২-২৭০)। তাঁর মতে, মানুষের প্রকৃতিই সমগ্র জীবনব্যাপী স্থায়ী ও অব্যাহত সুখ অন্বেষণে নিয়োজিত। তাঁর মতে অন্যায় থেকেই অশুভের সৃষ্টি হয়। আর মানুষ অন্যায় না করলে অশুভের সৃষ্টি হয় না। এভাবে এপিকিউরাস মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে কথা বলেছেন। শুভের মাধ্যমে সমগ্র বাঙালি তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণের কথা বলেছেন। এপিকিউরীয় দর্শনের মূল ভিত্তি ব্যক্তিবাদ। ব্যক্তিই এ দর্শনের কেন্দ্র বিন্দু। এ কারণেই তাঁর দর্শন ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করেছে। তাঁর দর্শনে বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আছে। প্রচলিত কুসংস্কার ও লালিত ভ্রান্ত ধারণাবলির চ্যালেঞ্জ হিসেবে এপিকিউরাস যে সুখবাদী মত প্রচার করেছিলেন– যা আজকের দিনের ভোগবাদী বৈজ্ঞানিক পরিবেশে এক ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করেছে। এপিকিউরীয় দর্শন কোনো বিশেষ ধর্ম বা জাতির গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। ফলে দেখা যায় গ্যাসেন্ডির মতো একজন ক্যাথলিক, হুইটম্যানের মতো একজন সর্বেশ্বরবাদী এবং বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো একজন উদারপন্থী দার্শনিক ও গণিতবিদের চিন্তায় এপিকিউরীয় মতের প্রভাব লক্ষ করা যায়।[৬৮]

আরজ আলী মাতুব্বরও ন্যায়, নীতি ও শুভের মাধ্যমে সমগ্র বাঙালির তথা সমগ্র বিশ্বব্যাপী কল্যাণের কথা বলেছেন। এপিকিউরীয় দর্শনের বাণী কোনো বিশেষ ধর্ম বা জাতির সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুত, কোনো কোনো দিক দিয়ে লিউক্রেটিয়াসের একটি প্রসিদ্ধ কবিতার মর্মবাণী রাসেলের *একজন স্বাধীন মানুষের উপাসনা* গ্রন্থের কথা মনে করিয়ে দেয়। এপিকিউরীয় দর্শনের মূল ভিত্তি হলো ব্যক্তিবাদ, ব্যক্তিই এ দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। এপিকিউরীয় দর্শনের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য থাকায় আধুনিক মানুষের কাছে এর অবদান বেশি। আধুনিক যুগের অধিকাংশ মানুষ বিজ্ঞানকে একটি কল্যাণকর বিষয় এবং স্বচ্ছন্দ জীবনের সর্বোত্তম উপায় বলে মনে করেন। প্রচলিত কুসংস্কার ও লালিত ভ্রান্ত ধারণাবলির চ্যালেঞ্জ হিসেবে এপিকিউরাস যে সুখবাদী মত প্রচার করেছিলেন আজকের দিনের ভোগবাদী বৈজ্ঞানিক পরিবেশে এর ব্যাপক আবেদন থাকাই স্বাভাবিক।[৬৯] আরজ আলী মাতুব্বরের মতে, যে দেশে যত বেশি বিজ্ঞান চর্চা হবে, সে দেশ থেকে তত বেশি কুসংস্কার দূর হবে। মানুষের একটি বড় ধর্ম হলো জ্ঞান চর্চা যার মধ্য দিয়ে সত্যকে অনুধাবন করা যায়। বিজ্ঞান চর্চা সত্যজ্ঞান লাভের একটি পদ্ধতিমাত্র। সেজন্য আরজ আলী মাতুব্বর বিজ্ঞানকে জ্ঞানচর্চার পথ

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এভাবে এপিকিউরীয় ও আরজ আলী মাতুব্বর তাঁদের সময়ের অবস্থানে থেকে, দেশকে কুসংস্কারমুক্ত করতে চেয়েছিলেন – যার জন্য তাঁরা বিজ্ঞানকেই একমাত্র পথ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কালের ব্যবধানে থেকেও এই দুই দার্শনিকের মধ্যে অভূতপূর্ব সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

এপিকিউরীয় দর্শনের সমসাময়িক দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্টোয়িক[১০] দর্শন অন্যতম। তবে স্টোয়িকদের মতে, মানবাদর্শ হলো-পুণ্য, আত্মশৃঙ্খলা ও কর্তব্যবোধপরায়ণ। আর সর্বোচ্চ কল্যাণ হলো পুণ্য ও সততা। মানবিক মর্যাদায় তিনি সকল মানুষের সমান অধিকার এবং জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ জ্ঞানার্জনই মানুষকে তার কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে। তাঁদের মতে, ধর্মবোধ হলো সম্পূর্ণভাবে নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সদিচ্ছা হলো ধর্মের মূল উপাদান। জ্ঞান, মিতাচার, সাহস ও ন্যায়পরতা –এই চারটি গুণকে স্টোয়িকরা ধর্মচর্চার অপরিহার্য ফল হিসেবে গণ্য করেছেন। এভাবে স্টোয়িকরা নীতিজিজ্ঞাসার মাধ্যমে মানবিক মর্যাদার কথা বলেছেন। স্টোয়িকদের মতে, মানুষ সংকীর্ণতা ও স্বদেশিকতার সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করে যতই আদর্শের দিকে এগিয়ে যাবে, ততই তার মঙ্গল সুনিশ্চিত হবে।[১১]

স্টোয়িকদের মতো আরজ আলীর দর্শনেও নীতি জিজ্ঞাসার মানবিক মর্যাদার রূপটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। স্টোয়িকদের মতো তাঁর দর্শনেও ধর্মচর্চার অপরিহার্য গুণ হিসেবে জ্ঞান, মিতাচার, সাহস ও ন্যায়পরতা স্থান করে নিয়েছে। কারণ আরজ আলী নিজেই ছিলেন একজন পুণ্যবান, আত্মশৃঙ্খলাপূর্ণ কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি যে কত নীতিবান ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রাত দুটোর সময় মাঝির বাড়িতে গিয়ে তার পাওনা পয়সা ফেরত দেওয়াকে কেন্দ্র করে।[১২] আদর্শ ও চিন্তার সাথে জীবনযাপনের এমন সম্মিলিত অনন্যসাধারণ গুণ, আরজ আলী মাতুব্বর অর্জন করেছিলেন।

স্টোয়িক পরবর্তী মানবকেন্দ্রিক দার্শনিক হলেন নব্য-পিথাগোরীয়বাদী প্লুটার্ক (আনু. ৪৮খ্রি. -১২০ খ্রি.)। তিনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যার ফলে তিনি মনে করতেন মানুষের দুঃখ কষ্টের জন্য সে নিজেই দায়ী। তিনি মানুষের মধ্যে উচ্চতর ও নিম্নতর প্রবৃত্তির উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন এবং মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে হলে উচ্চতম প্রবৃত্তির তথা প্রজ্ঞা দ্বারা নিম্নতম প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেন।[১৩] আরজ আলী মাতুব্বরও তাঁর দর্শনে প্রজ্ঞা, যুক্তির উপর ভিত্তি করেই মানবিক মানমর্যাদা অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রিক দর্শনের প্রাচীন যুগের সর্বশেষ দার্শনিক হলেন নব্য-প্লেটোবাদী প্লটিনাস (২০৪ খ্রি.-২৭০ খ্রি.)। তিনি মানবিক মর্যাদার লক্ষ্যে আত্মার পরিশোধনের কথা বলেছেন এবং এজন্য প্রয়োজন বলার পথ অর্থাৎ সুন্দর বস্তুর চিন্তা,

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমের পথ অর্থাৎ সুন্দর আত্মার সংস্পর্শ,এক জ্ঞানের পথ অর্থাৎ সুন্দর ও পবিত্র চিন্তার অনুধ্যান যার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছাতে পারে। তাঁর ঈশ্বর ভক্তি ছিল খুবই সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত। এতে ধর্মীয় বা দার্শনিক কুসংস্কার বা খেয়ালখুশির কোনো স্থান ছিল না।[৭৪] প্লটিনাস এভাবে সুন্দর জীবন যাপনের মাধ্যমে মানুষের জীবনে স্বাধীনতার মর্যাদার গুরুত্ব দিয়েছেন। আরজ আলী মাতুব্বরও স্বনিয়ন্ত্রণবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে, মানুষ তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেক অনুসারে নিজের কর্মপন্থা নির্ধারণে সক্ষম। কারণ মানুষের মধ্যে আছে যুক্তি এবং সত্য অনুসন্ধানের ইচ্ছা, তাই মানুষ নিজেই নিজের কর্মপন্থার নিয়ন্ত্রক। তাই তো তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন:

> স্বভাবত মানুষ সত্যকেই কামনা করে, মিথ্যাকে নয়। তাই আবহমানকাল হইতেই মানুষ- 'সত্যের সন্ধান' করিয়া আসিতেছে।[৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

১.২ আরজ আলী মাতুব্বর ও আধুনিক যুগের মানবতাবাদ

রেনেসাঁর প্রভাবে মধ্যযুগের নির্বিচার বিশ্বাসের স্থলে স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে যেসব সংস্কারধর্মী ও বাস্তববাদী মতের প্রচার ঘটে বৃটিশ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১ খ্রি. - ১৬২৬ খ্রি.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে তিনি একজন উল্লেখযোগ্য দার্শনিক। তাঁর মতে, মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জ্ঞানচর্চা প্রয়োজন এবং ব্যবহারিক জীবনের অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান মূল্যহীন। প্রকৃতির উপর মানুষের ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই জ্ঞানানুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে হলে মানব মনের সবরকম ভ্রান্ত ধারণা, বিশ্বাস ও পূর্বসংস্কার বর্জনের কথা বলেছেন।[৭৬] তাঁর মতে, ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই বলে তিনি ধর্মের সমস্যা কৌশলে এড়িয়ে যান।

আরজ আলী মাতুব্বর অবশ্য ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কহীন বলে ধর্মের সমস্যাকে এড়িয়ে যাননি। বরং তিনি অগাস্ট কোঁতে (১৭৯৮ খ্রি.-১৮৫৭ খ্রি.) এর মতো ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মের ঈশ্বর ও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে অস্বীকার করেছেন। তিনি চেয়েছেন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে। জড়বাদী হয়েও বেকন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রাকৃতিক ধর্মে আস্থাশীল ছিলেন। খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কিছু বলেননি। তবে গোঁড়ামি ও নির্যাতন দ্বারা অতীতের ইতিহাস কলংকিত হলে তিনি দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরের সাথে বেকনের নীতিগত পার্থক্য ছিল। উদাহরণ হিসেবে বেকনকে কারাবরণ করতে হয়েছিল উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে,[৭৭] আরজ আলী মাতুব্বরকে কারাবরণ করতে হয়েছিল সত্যকে আবিষ্কারের চেষ্টার জন্য। উদাহরণ হিসেবে মাতুব্বর সাহেব যুক্তিবাদী কথার বিপরীতে উপহার পেয়েছিলেন হাজত বাস।[৭৮]

দার্শনিক আলোচনায় বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রবর্তন বেকনের এক মস্ত বড় অবদান। তাঁকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অধিকর্তা বলা যায় কি- না এই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তবে তিনি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগকর্তা। তাঁর মতে, "যে দর্শন একতরফাভাবে অনুধ্যানিক, যাতে প্রায়োগিক তথ্য ও ঘটনার কোনো স্থান নেই, তা দর্শন পদবাচ্য নয়। এতে একদিকে যেমন তাঁর প্রায়োগিক দার্শনিক মনোভাবের, অন্যদিকে তেমনি বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।"[৭৯] বস্তুত বেকনই প্রথম পূর্বসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞান ও দর্শনের সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন। জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনের জন্যই তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শক ও প্রতিনিধি হিসেবে অবিহিত হন। আরজ আলী মাতুব্বরও সমাজে প্রচলিত সব ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে দূর করে এক সুশীল সমাজ গড়তে

Dhaka University Institutional Repository

চেয়েছিলেন। বিদ্বৎসমাজে যুক্তিবাদিতার ও সত্যানুসন্ধানের প্রতি আজও যে আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়, যুগ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বেকন ও আরজ আলী মাতুব্বর দর্শনে তার অবদান লক্ষনীয়।

বেকন পরবর্তী দার্শনিক টমাস হব্‌স (১৫৮৮ খ্রি.-১৬৭৯ খ্রি.) মানব প্রকৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যার লক্ষ্যে মানবজাতিকে আত্মরক্ষা এবং আত্মবিস্তারের প্রেরণা ও প্রবণতাসম্পন্ন জীব হিসেবে গণ্য করেছেন। যে কারণে মানুষ হয়ে যায় স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর; ফলে সমাজে দেখা দেয়-অসামাজিকতা ও বিশৃঙ্খলা। মানুষ এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ব্যক্তিগত প্রভুত্ব বিসর্জন দেয় এবং সর্বজনগ্রাহ্য একজন ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করে এর সমাধানের পথ বের করে। হব্‌সের এই আপোসনীতি সামাজিকচুক্তি[৮০] হিসেবে পরিচিত।[৮১] হব্‌সের মতে, এ চুক্তির কারণেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে- এবং মানুষ জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচালনা করতে শিখেছে।

আরজ আলী মাতুব্বরও সামাজিক জীব হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে গৌরববোধ করেন এবং সমাজ বিশৃঙ্খলা ও অসামাজিকতার জন্য মানুষকেই দায়ী করেন। তিনি যুক্তির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনার করুণ চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরে, তা থেকে অবসানের পথ নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'সমাজতন্ত্র' তথা 'সাম্যবাদ' হচ্ছে বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানের একমাত্র মাধ্যম।[৮২]

আধুনিক প্রতীচ্য দর্শনের জনক রেনে ডেকার্ট (১৫৯৬ খ্রি.-১৬৬০ খ্রি.) ব্যক্তিসত্ত্বার মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করার লক্ষ্যে মানবাত্মার স্বরূপ ও অস্তিত্ব প্রমাণ করাই ছিল তাঁর দার্শনিক আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়, আর এ লক্ষ্যে তিনি তাঁর বিখ্যাত সংশয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তাঁর মতে, জগতের সবকিছু সন্দেহ করা গেলেও সন্দেহকর্তা অর্থাৎ চিন্তনকর্তাকে সন্দেহ করা যায় না। এভাবে ডেকার্ট তাঁর দর্শনের প্রথম নিঃসন্দিগ্ধ ও সুনিশ্চিত সত্যে উপনীত হলেন এভাবে: 'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি'। এ ভাবনাকে স্বীকার করা প্রয়োজন কেননা তা স্পষ্ট এবং সন্দেহের উর্ধ্বে। এভাবে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, যাকে আমরা স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত দেখি তা-ই সত্য।[৮৩]

ডেকার্ট যেমন সব কিছুকে সন্দেহ করে সন্দেহকর্তা হিসেবে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ করেছেন, আরজ আলী মাতুব্বরও তেমনি প্রশ্ন দ্বারা 'আমি' বা 'আত্মসত্তার' অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। যুক্তির আলোকে সব কিছু সন্দেহ করা গেলেও সন্দেহকর্তা অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সংশয় পদ্ধতি প্রয়োগের সুপারিশ করা সত্ত্বেও তিনি চূড়ান্ত বিচারে সংশয়বাদী নন। মানব জ্ঞানের অগ্রযাত্রায় ডেকার্টের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কেবল অন্ধ বিশ্বাসের জায়গাগুলোতেই ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যখন সন্দেহের সীমানা পেরিয়ে বিজয়ীর বেশে কোনো বিশ্বাস শির উঁচু করে সামনে এসে দাঁড়াবে তখন সে বিশ্বাসকেও সাদরে সম্ভাষণ জানাতে হবে– এটাই ডেকার্টের শিক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

ডেকার্ট-এর সমসাময়িক এবং পরবর্তী দর্শন চর্চায় কার্তেজীয় সংশয়ের প্রভাব দেখা যায়। বর্ট্রান্ড রাসেল ডেকার্টের পক্ষ অবলম্বন করে বলেন :

> I think on the whole that the sort of method adopted by Descartes is right: that you should set to work to doubt things and retain only what you can not doubt because of its clearness and distinctness.[৮৪]

অর্থাৎ আমার মনে হয় ডেকার্টের পদ্ধতি মোটের উপর সঠিক। কোনো কাজ সন্দেহের মাধ্যমে সূচনা করা দরকার এবং কোনো কিছু সুস্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল হলেই তা সন্দেহমুক্ত হবে। তিনি আরও বলেন, ডেকার্টকে আধুনিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি জ্ঞানলাভের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন তার এখনও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সত্য বলে মনে না হলে কোনো জ্ঞানকে তিনি বিশ্বাস করবেননা বলে স্থির করেছিলেন। এই সংশয় পদ্ধতি আবিষ্কার করে ডেকার্ট দর্শনের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। দর্শনের ছাত্রদের কাছে ডেকার্টের এই আবিষ্কারের গুরুত্ব এখনও অপরিসীম।[৮৫]

বস্তুত ডেকার্ট সংশয় পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রথম সুনিশ্চিত সত্য আবিষ্কার করেন। এ প্রসঙ্গে বর্ট্রান্ড রাসেল বলেন, সন্দেহ ছাড়া কোনো বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারে না। মানব মন সব সময়ই কৌতূহলী। কৌতূহল থেকে জন্ম নেয় সন্দেহ, সংশয়, মানুষ সব সময়ই সন্দেহমুক্ত সুনিশ্চিত সত্য পেতে চায়। ডেকার্টের আত্মসত্ত্বা বিষয়ক প্রমাণ বোধকরি আরজ আলী মাতুব্বরও উপলব্ধি করেছিলেন: মানুষ্যদেহধারী মন বা প্রাণবিশিষ্ট একটি সত্তা হল 'আমি'। এ হিসেবে দেহ থেকে প্রাণকে আলাদা করা যায় না। তিনি প্রাণ ও মনের অস্তিত্ব যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেন। মানুষের দেহে আছে প্রাণচাঞ্চল্য – যাকে তিনি প্রাণ ও মন হিসেবে প্রমাণ করেন। তাঁর মতে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, লৌহ, ফসফরাস ইত্যাদি মৌলিক নিষ্প্রাণ পদার্থসমূহের যথানুপাত সংমিশ্রণে জড়দেহ গঠিত। কিন্তু যেহেতু দেহে প্রাণচাঞ্চল্য আছে; সেহেতু প্রাণ ও মন অতীন্দ্রিয় হলেও তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। যদিও তিনি চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমেই সত্যকে পাওয়ার কথা বলেছেন; কারণ যা প্রত্যক্ষ করা হয় তাই বিশ্বাস্য এবং যা বিশ্বাস্য তাই সত্য।[৮৬] তদুপরি তিনি প্রাণশক্তি নামক অপ্রত্যক্ষিত জিনিসকে অনুমানের মাধ্যমে বিশ্বাস করার যুক্তি প্রয়োগ করেন। প্রাণশক্তির বলেই মানুষের কার্যকলাপ, যেমন চলাফেলা ওঠা-বসা ইত্যাদি কার্যক্রমকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তাই আরজ আলীর মতে,

Dhaka University Institutional Repository

> প্রাণ যদিও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে, তবুও ইহার কার্যকলাপ দৈহিক ঘটনারূপে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। "কার্য থাকিলে তার কারণ থাকিতে বাধ্য"– এই স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির বলে আমরা দৈহিক ঘটনাবলির কারণরূপে প্রাণের অস্তিত্বকে অনুমান করিতেছি এবং বিশ্বাস করিতেছি যে, প্রাণ আছে।[৮৭]

এখানে আরজ আলী যুক্তির মাধ্যমে প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হলে অবশ্যই তাঁর ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ থাকতে হবে। যার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ নেই তার অস্তিত্ব স্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই। ডেকার্ট সংশয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেও জ্ঞানের অগ্রযাত্রায় কখনো সংশয়বাদী ছিলেন না। তাঁর সংশয় ছিল কেবল অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। আরজ আলী মাতুব্বরও ডেকার্টের সাথে একমত হয়ে প্রমাণ করেন এভাবে:

> ... প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটির উপর খাঁটি বিশ্বাস বা জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। যে বিশ্বাসের মূলে প্রত্যক্ষ বা অনুমান নাই, অর্থাৎ যে বিশ্বাসের মূলে জ্ঞানের অভাব, তাহা খাঁটি বিশ্বাস নহে, অন্ধ বিশ্বাস। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আমাদের সন্দেহ নাই।[৮৮]

এভাবে তার দর্শনে ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি পেল। ডেকার্টের পর আধুনিক প্রতীচ্য দর্শনে মানবকেন্দ্রিক সমস্যায় মানবমর্যাদা আলোচনা করেন বেনেডিক্ট স্পিনোজা (১৬৩২ খ্রি.-১৬৭৭ খ্রি.)। তাঁর লেখা ছিল একেবারে গণিতের হুবহু জ্যামিতিক প্রমাণের মতো, তাতে এক যুক্তি থেকে অন্য যুক্তি উৎসারিত হয়।[৮৯] তিনি মানুষের চিন্তা ও আত্মচেতনার অবস্থিতির কথা বলেছেন। তাঁর জীবনদর্শন ব্যাখ্যায় ঈশ্বর ও আত্মার অমরত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বর বলতে তিনি সমগ্র প্রকৃতিকে বুঝিয়েছেন আর আত্মার অমরত্ব বলতে বুঝিয়েছেন, আত্মা এই জন্মেই চিন্তা ও কাজের উৎকর্ষ দ্বারা বিশেষ একটা স্তরে উপনীত হয় এবং মৃত্যুর পর মানুষের জীবন অনাদি অতীতের অংশরূপে অস্তিত্ব রক্ষা করবে। স্পিনোজার প্রকৃতিভিত্তিক জীবনদর্শনে দেখা যায় যে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁধা। অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব নেই। স্পিনোজা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। যান্ত্রিকতাবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন তিনি, যেহেতু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী নয়–সেহেতু তার কৃতকার্যের জন্যও সে দায়বদ্ধ নয়। মানুষ কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলে তাঁর কৃতকর্মে ভালো-মন্দ এবং উচিত অনুচিতও আরোপযোগ্য নয়। যা কিছু আছে, যা কিছু ঘটে সবই স্বাভাবিক এবং ভালো। স্পিনোজা স্বাধীন ইচ্ছার কোনো গুরুত্ব দেননি। মানব মন কোনো না কোনো বিশেষ কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই ইচ্ছা করে যাচ্ছে। সেই কারণ আবার কারণান্ত দ্বারা পরিচালিত।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই তিনি মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে তার বুদ্ধির সঙ্গে ও অভিন্ন বলে ঘোষণা করেছেন। মানুষের সর্বকাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে আনন্দকে স্থান দিয়েছেন অনেক উর্ধ্বে।[৯০]

সমকালীন, প্রায়োগিক ও পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গেও স্পিনোজার যোগাযোগ ছিল। অবশ্য বিজ্ঞানের পরমসত্তা বিষয়ক প্রশ্নাবলির সদুত্তর আবিষ্কারের ক্ষমতাকে তিনি গাণিতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রজ্ঞার এক অপূর্ণ প্রতিকল্প বলে মনে করতেন। এখানে অবশ্য বলে রাখা দরকার যে, অপরের দ্বারা প্রভাবিত হলেও স্পিনোজার একটি নিজস্ব মৌলিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, দার্শনিক দক্ষতার দিক থেকে কেউ কেউ হয়তো স্পিনোজাকে অতিক্রম করে থাকতে পারেন, কিন্তু নীতিনিষ্ঠার দিক থেকে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।[৯১] এ ক্ষেত্রে সমগ্র মানব সভ্যতা সম্পর্কে বা অধিকতর বৃহত্তর বিষয় সম্পর্কে স্পিনোজার চিন্তনের নীতিটি একটি প্রয়োজনীয় মানদণ্ড।

আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তায়ও আত্মচেতনার উপস্থিতি ছিল প্রবলভাবে, যে পরিপ্রেক্ষিতে নিজের চেষ্টায় স্থাপন করেছেন যুক্তিবাদী জীবনদর্শন। আত্মসচেতনতার কারণেই নিজের জীবনের ঝুঁকি সয়ে লড়াই করেছেন ধর্মিয় গোঁড়ামি ও অন্ধকুসংস্কারের বিরুদ্ধে। স্পিনোজার মতো আরজ আলী মাতুব্বরও কার্যকারণ সম্পর্ক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ এবং যুক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, যেসব ঘটনার "প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রমাণ নাই অথবা কার্যকারণ সমৃদ্ধ ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়াস নাই, এক কথায় যুক্তি যেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, এইরূপ কাহিনীতে বিশ্বাস রাখার নামই অন্ধ বিশ্বাস। ...উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অন্ধ বিশ্বাসকে বলা হয় কুসংস্কার।"[৯২] এক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতিকে আরজ আলী মাতুব্বরের যৌক্তিক চিন্তন শক্তহাতে নাড়া দিয়েছে। মানবজাতি প্রতিটি মূল্যবোধকে অন্তত যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করে গ্রহণ কিংবা বর্জন করতে শিখবে, এই সংঘাতময় পৃথিবীতে মানসিক সুস্থতায় উপকারি এবং সর্বোপরি মানবজাতির হতাশার প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে।

বুদ্ধিবাদী দার্শনিক গটফ্রিড উইলহেলম লাইবনিজ (১৬৪৬ খ্রি.-১৭১৬ খ্রি.) এর দর্শনে মানুষের স্বরূপ সম্পর্কীয় আলোচনা গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করেছে। তিনি মানবজাতির মর্যাদা ও কল্যাণের উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে কারণে পদার্থিক জগতের সকল বস্তুকেই সুখের সহায়ক হিসেবে অভিমত প্রকাশ করেছেন। লাইবনিজের এসব নতুন ধ্যান-ধারণা তাঁর সমসাময়িকদের যতটুকু অনুপ্রাণিত করেছিল, তার চেয়ে বেশি করেছে বিশ শতকের মানুষকে।[৯৩]

লাইবনিজের মতো আরজ আলী মাতুব্বরের ধ্যানধারণাও ছিল সম্পূর্ণ যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক। আরজ আলী মাতুব্বরও অনুভব করেছিলেন মানবকল্যাণের জন্য দরকার এমন একটি বৈজ্ঞানিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যা মানবজাতিকে নৈতিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে এবং সঠিক মানবকল্যাণের দিক

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশনা দেবে। লাইবনিজ যেমন জ্ঞানের হাতিয়ার হিসেবে একটি নৈয়ায়িক ভাষার পরিকল্পনা করেছিলেন, আরজ আলী মাতুব্বরও তেমনি সত্যকে চিরন্তন সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সত্যকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যেমন H_2O-পানি, এভাবে বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। লাইবনিজের মতো আরজ আলী মাতুব্বরেরও এ পরিকল্পনার পিছনে একটি কারণ ছিল, তা হলো যদি কোনোভাবে কোনো এক বিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণে মতানৈক্য দেখা দেয়; তাহলে ঐ বিষয় নিয়ে নানা ঝগড়া-বিবাদ, কলহ, এমনকি দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হতে পারে।[১৪] তখন তা আর সত্য থাকে না। এভাবে বিষয় বিশেষে ব্যক্তিগত মতানৈক্যের কারণে সমাজে ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা দৃঢ় করার লক্ষ্যে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যা হবে সর্বকালের, সর্বযুগের মানুষের জন্য মঙ্গলময়।

যুক্তিবাদী দার্শনিকদের মতো অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকরাও মানব পরিস্থিতির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক (১৬৩২ খ্রি.-১৭০৪ খ্রি:) ছিলেন ১৬৮৮ সালের[১৫] বিপ্লবের নেতা। লক স্কলাস্টিকবাদ এবং স্বাধীনতার গোঁড়া ও যুক্তিহীন উৎসাহের বিপক্ষে ছিলেন। ফলে তাকে উদারনৈতিক মতবাদ ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। লক নির্বিচারবাদী ধারণা পোষণ করেননি। লকের দর্শন থেকেই নির্বিচারবাদী ধারণা প্রত্যাখ্যান শুরু হয় এবং সমগ্র উদারনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব বিস্তার করে। তিনি অবশ্য নিজের অস্তিত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, গণিতের সত্যতা – ইত্যাদির ধারণা পূর্বসূরিদের কাছ থেকে গ্রহণ করলেও যেসব ধারণার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব মতবাদের পার্থক্য দেখা দিয়েছে,সেখানেই তিনি বলেছেন সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করা কঠিন এবং একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উচিত সংশয়মূলক মনোভাবের মাধ্যমে নিজ মতবাদ পোষণ করা। এরূপ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় সহনশীলতা, সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য, অবাধ নীতি এবং সমগ্র উদারনৈতিক নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। লকের মতে, প্রত্যাদেশের প্রামাণিক সাক্ষ্যই সর্বোচ্চ নিশ্চয়তামূলক জ্ঞান, তবে প্রত্যাদেশকে অবশ্যই যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা বিচার করতে হবে। এভাবে পরিণামে তাঁর দর্শনে যুক্তিবুদ্ধির ভূমিকাই সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে। লকের মতো আরজ আলী মাতুব্বরও সম্পূর্ণ বিচারবাদী দার্শনিক ছিলেন। প্রকৃত মুক্তবুদ্ধির মানুষ স্বশিক্ষিত, আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করেন। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান যুক্তির বাইরে নয়, ফলে বর্তমান যুগ যুক্তিবাদেরও যুগ। ন্যায় বা যুক্তির নিরিখে প্রথম কথোপকথন শুরু হয় মূলত অ্যারিস্টটলের সময়কাল থেকে।

যুগে যুগে মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে যুক্তির স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্যগত কিছু পরিবর্তন সাধিত হলেও তার গুরুত্বের কোনো অবমাননা হয়নি। বরং দিনে দিনে জ্ঞানপিপাসু মানুষ ন্যায় বা যুক্তির শাশ্বত ঐতিহ্য ও প্রয়োজনীয়তা বজায় রেখে সত্যকে উদ্ঘাটন করেছেন অতি দক্ষতার সাথে। পৃথিবীর কোনো মানুষই প্রতিবাদী বা যুক্তিবাদী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সামাজিক পরিবেশের প্রভাবই তাকে জীবনমুখী করতে সহায়তা করে যৌক্তিক চিন্তনের মাধ্যমে। তেমনি সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

অসম্পূর্ণতা ও স্ববিরোধিতাই বাধ্য করেছিল প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসকে যৌক্তিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যতিরেকে সক্রেটিস ছিলেন তীক্ষ্ণ ন্যায়বোধের অধিকারী। একইভাবে আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সংস্কারক ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১ খ্রি.-১৬২৬ খ্রি.) প্রাচীন মতবাদের বিকৃত ধারণার বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তার যৌক্তিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, ঠিক তেমনি বর্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২ খ্রি.-১৯৭০ খ্রি.) বিশ্বমানবতার শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনেই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। সক্রেটিস, বেকন, রাসেল এবং আরজ আলী মাতুব্বর প্রমুখ দার্শনিক তাঁদের দর্শনের তত্ত্বকে সমাজ ও জীবনে প্রয়োগ করে মানুষকে দিতে চেয়েছিলেন যৌক্তিক এবং মানবোচিত জীবনের সম্মান। মানুষের মধ্যে সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের আদর্শসহ যুক্তির নিরিখে চিন্তার ফলই হলো বর্তমান সভ্যতা। বিংশ শতাব্দীতে আরজ আলীর চিন্তাধারার প্রতিটি স্তরে রয়েছে যৌক্তিকতার পরশ।

দার্শনিক লক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবক্তা। লকের মতে, "আমরা আমাদের নিজ অস্তিত্বকে এত সরল ও সুনিশ্চিতভাবে প্রত্যক্ষ করি যে, একে প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রমাণ করা সম্ভবও নয়।"[১৬] আরজ আলী মাতুব্বরও ব্যক্তিসত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। লকের মতে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের জ্ঞানও হলো প্রমাণমূলক জ্ঞান। তিনি ব্যক্তির অস্তিত্বশীলতার কারণ হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ করেন। দেখা যায় দার্শনিক মাত্রেই কোনো কিছুকে প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। তেমনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আরজ আলী মাতুব্বরও সব কিছুকে বিশেষ করে ঈশ্বরের অস্তিত্বেরও প্রমাণ করতে চেয়েছেন– যার জন্য তাঁর ছিল প্রশ্নের পর প্রশ্ন। জন লক যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে ব্যক্তির মর্যাদা ইচ্ছা ও কর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আরজ আলী মাতুব্বর ব্যক্তি মর্যাদায় গুরুত্ব দিয়েছেন।

স্কটল্যান্ডের সুবিখ্যাত দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১খ্রি.-১৭৭৬খ্রি.) একজন পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী ও সংশয়বাদী হিসেবে পরিচিত। দর্শন, বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে মানুষের মন ও প্রকৃতির উপর হিউম ব্যাপক পড়াশোনা করেন এবং এসব ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসাধারণ। তৎকালীন সমাজে বিজ্ঞান ও দর্শনের নামে যে অসার ধ্যান-ধারণা প্রচলিত ছিল, তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি এমন তত্ত্বানুসন্ধানের পক্ষপাতিত্ব করতেন যা মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এবং সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে অর্থাৎ তিনি বিমূর্ত কোনো কিছুকে গ্রহণ করেননি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস সুরক্ষা করতে না পেরেই মানুষ এমন অসার চিন্তার আশ্রয় নেয়। তিনি মানুষের যথার্থ জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধানকে অবশ্যই এ জাতীয় নিরর্থক ও দুর্বোধ্য তত্ত্ব থেকে মুক্ত রাখার কথা বলেন। তাঁর মতে দুর্বোধ্য তত্ত্বীয় ভাষা যদি বিজ্ঞান ও দর্শনের ছদ্মবেশে সহজবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বিশ্বাসে প্রবেশ করে, তা হলে বিচারশীল মনোবৃত্তির মাধ্যমেই কেবল তাঁদের শনাক্ত ও নির্মূল করা সম্ভব। মানব মনের কার্যাবলি সমন্ধে সঠিক ধারণা রাখা, তাঁদের পরস্পরকে পৃথক করা, তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে যে অসংবদ্ধতা ও বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান, তা দূর করা বিজ্ঞানী ও দার্শনিক উভয়েরই দায়িত্ব। হিউমের মতে, মানব প্রকৃতি সমন্ধে সঠিক ধারণা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, অজ্ঞানতা দূরীকরণে এবং জ্ঞান ও সত্যের দার্শনিক লক্ষ্য অর্জনে এর অন্য কোনো বিকল্প নেই।[১৭] হিউম আরো বলেন, "একটি অলৌকিক ঘটনাকে fact বা বাস্তবব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে না, আর তাই অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস একেবারেই অযৌক্তিক।[১৮]

আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর মৃত মায়ের ছবি তোলাকে কেন্দ্র করে তাঁর চিন্তাজগতে ব্যাপক পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তিনি সত্যকে জানার লক্ষ্যে তখন থেকেই তিনি ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন ইতিহাসকে তীব্র কৌতূহল নিয়ে জানার গভীর মনোনিবেশ করেন। আর এখানেই ঘটে হিউমের দর্শনের সাথে তাঁর সাযুজ্য। হিউমের মতো তিনি সংশয়বাদী হয়ে যান এবং দ্রুত মুক্তচিন্তা জগতে প্রবেশ করেন। কোনো সংস্কার তাঁকে পেছনে টানতে পারেনি। হিউমের মতো তিনি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে বিদীর্ণ করে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রভা ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজেই কুসংস্কার সম্পর্কে বলেছেন:

> যুক্তিহীন বিশ্বাস বা অসার যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদে বিশ্বাসও এক কথায় 'অন্ধ বিশ্বাস'। যেখানে কোনো বিষয় বা ঘটনা সত্য কি মিথ্যা, তাহা যাচাই করিবার মতো জ্ঞানের অভাব, সেখানেই কুসংস্কারের সূত্রপাত। অসভ্য, অর্ধসভ্য, অশিক্ষিত ও শিশু মনেই কুসংস্কারের প্রভাব বেশি। কিন্তু কুসংস্কার এত ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া আছে যে, সম্পূর্ণ কুসংস্কারমুক্ত মানুষ অল্পই পাওয়া যায়। কিন্তু যাহারা নিজেদের 'কুসংস্কারমুক্ত' বলিয়া গর্ববোধ করেন, হয়ত কোনো না কোনোরূপে তাহাদের ভিতরেও কিছু না কিছু কুসংস্কার লুকাইয়া থাকিতে পারে বা আছে।[১৯]

দেখা যায় আরজ আলী মাতুব্বরও হিউমের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপক্ষে ছিলেন সোচ্চার। তিনি ধর্মকে কখনো বিশ্বাসের রূপক হিসেবে দেখেননি। তিনি যুক্তি-তর্কের সাথে ধর্মকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি হিউমের মতো সাধারণ মানুষের লালনকৃত উত্তরাধিকার সূত্রের জ্ঞানবিজ্ঞানকে যুক্তিসঙ্গতভাবে তুলে ধরেছেন। হিউমের মতো তিনি মানব প্রকৃতির সঠিক ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তা সম্ভব হবে মানুষের অজ্ঞানতা দূর করে জ্ঞান ও সত্যের দার্শনিক লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে। আরজ আলী মাতুব্বরও হিউমের মতো প্রচ্ছন্ন জ্ঞানের অনুসন্ধানী ছিলেন। বদরুদ্দীন উমর আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে উক্তি করেন এভাবে:

Dhaka University Institutional Repository

> তিনি এমন একজন দার্শনিক যিনি নিজের স্বকীয় প্রতিভা বলে নিজের চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন করতে তো সক্ষম হয়েছিলেনই, সেই সঙ্গে তিনি খুব সহজ ও বৈজ্ঞানিকভাবে নিজের চিন্তাধারাকে নিজের রচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করে অন্যদেরকে কুসংস্কারমুক্ত হতে সাহায্য করতেন।[১০০]

এভাবে দেখা যায় পরিচ্ছন্ন জ্ঞান লাভের জন্য সংশয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতার খুবই প্রয়োজন। কারণ সংশয়বিহীন সঠিক প্রশ্ন উত্থাপন সম্ভব নয়। আবার সঠিক প্রশ্ন ছাড়া সঠিক উত্তরও অসম্ভব। কারণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া থেকেই বেরিয়ে আসে সঠিক তথ্য। এই দার্শনিকদ্বয় তুলে ধরেছেন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক অসংখ্য প্রশ্ন। এ হিসেবে হিউম যেমন জড়, ঈশ্বর, মন কোনো কিছুর অস্তিত্বই স্বীকার করেননি। হিউম তাঁর *Dialogue Concerning Natural Religion* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বিপদ ও অমঙ্গলয় ভীতি থেকে মুক্তিলাভের জন্য এক অদৃশ্য শক্তির সাহায্য কামনা হচ্ছে ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তি। তা ছাড়া তিনি *Treatise* এবং *Enquiry* গ্রন্থে দেখান যে, এ সম্পর্কে কোনো ইন্দ্রিয়ছাপ আমাদের মধ্যে নেই। তাই ঈশ্বরের অস্তিত্বও নেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা[১০১] তত্ত্বই ছিল তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের মূল ভিত্তি। তাঁর ভাষায়: "All the perceptions of the human mind resolve themselves into two distinct kinds, which I shall call Impressions and Ideas".[১০২]

হিউমের মতে, ইন্দ্রিয়ছাপ হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রাথমিক সরল অনুভূতি। আরজ আলী মাতুব্বরও অতিপ্রাকৃত উপায়ে কোনো প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিতে অপরাগ ছিলেন। তিনি এতই বাস্তববাদী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন যে, বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে ভাববাদ ও রহস্যবাদের প্রতি তিনি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এর এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এহেন উক্তিতে:

> দেবতারা ছিলেন সর্ববিদ্যাবিশারদ, সর্বগুণে গুণী, জ্ঞানবিজ্ঞানে অতি উন্নত, ভক্তগণ তাদের অনুরক্ত হয়েছেন, ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে অর্চনা আরাধনা করেছেন, তাদের উদ্দেশে অসংখ্য পশু বলি করেছেন (কেউ কেউ এখনো করে থাকেন) এবং নরবলিও দেওয়া হয়েছে কোনো কোনো দেশে। কিন্তু দেবগণের কোনো জ্ঞানগুণের অনুশীলন করেননি কোনো ভক্তই তা বলা চলে। দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে তাঁর ভক্তগণ প্রার্থনা জানাচ্ছেন হাজারো রকম, স্তুতিবাক্য রচনা করেছেন অজস্র (ঋগ্বেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি নাকি ছিলেন বজ্রবিদ্যুৎ সৃষ্টির অধিকর্তা। কিন্তু কোনো ঋষিই তাঁর কাছে উক্ত বিদ্যুৎ সৃষ্টির প্রণালিটা শিক্ষা করেননি বা করতে পারেননি। বিদ্যুৎ সৃষ্টি প্রণালি আবিষ্কার করেছেন ইটালীয় বিজ্ঞানী ল্যালভনি ও ভল্টা (১৭৬১)। দেবতারা বিমানবিদ্যায়ও ছিলেন সুনিপুণ। তাঁরা বিমানে (রথে) চড়ে আসতেন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে (পৃথিবীতে) ভ্রমন করতেন যত্রতত্র। হাঁ-করে দেখতেন মুনি-ঋষিগণ, আর দান করতেন শ্রদ্ধাঞ্জলি। কিন্তু দেবতাদের কাছ থেকে বিমান তৈরির

Dhaka University Institutional Repository

> কলা-কৌশল আয়ত্ত করেননি কোনো মুনিঋষিই, তা আবিষ্কার করেছেন আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ১৯০৩ সালে।[১০৩]

যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে আরজ আলী মাতুব্বরকে দেখা যায় পরিচ্ছন্ন জ্ঞান লাভের লক্ষ্যে একজন শেকড় সন্ধানী মানুষ হিসেবে। তিনি প্রশ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে গিয়ে প্রথাগত সমাজের বিরুদ্ধে ধর্মীয় সামাজিক আঘাত হেনেছেন। সমাজের শত্রুরূপে পরিগণিত হয়েছেন, শিশুদের মতো সহজ সরলভাবে তিনি অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন তুলে ধরেছেন সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের প্রতি। হিউমের মতো আরজ আলী মাতুব্বরও প্রশ্নের মাধ্যমে তীব্র ও প্রচণ্ড প্রত্যক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়ার লক্ষ্যেই কখনো সরাসরি বা কখনো প্রতীকের মাধ্যমে প্রশ্নবাণ ছুড়ে দিয়েছেন। তিনি একজন কৃষক হয়েও সমাজ ও মানুষকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। আর তাঁর মৌলিকতা এখানেই। তিনি কাউকে অনুকরণ বা অনুসরণ না করেই সব কিছু নিষ্ঠার সাথে জানা ও বোঝার চেষ্টা করেছেন। এভাবে দেখা যায় তিনি অশিক্ষিত হয়েও হিউমের মতো সবকিছুকে বাস্তবভিত্তিক উপায়ে দেখার ও জানার চেষ্টা করেছেন।

হিউমের চরম অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের মূল ভিত্তি হলো ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার আলোচনা; যার প্রয়োগ হিউমকে শেষ পর্যন্ত করেছিল সংশয়বাদী। দার্শনিক অথবা সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের যে কোনো বিষয়ের অস্তিত্বের ব্যাপারে তিনি উক্ত সূত্রের মাধ্যমে তা যাচাই করে দেখতেন। ঈশ্বর, আত্মা, দ্রব্য, কার্যকারণ ধারণা প্রসঙ্গে হিউম ইন্দ্রিয়ছাপের প্রকারভেদ সম্পর্কে সঠিক উত্তর না পাওয়ার কারণে তাঁকে অর্থহীন বলে অভিহিত করেন। এ ভাবে হিউমের কাছে ঈশ্বর, আত্মা, দ্রব্য ইত্যাদির কোনোটিরই অস্তিত্ব নেই।

হিউমের মতো আরজ আলী মাতুব্বরও ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী, যুক্তিবাদী হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য। অভিজ্ঞতাবাদী হিউম স্থায়ী আত্মসত্তার ধারণাকে কোনো মতেই গ্রহণ করেনি। তাই তিনি যুক্তি দেখান যে, প্রত্যেক ধারণা যেহেতু ইন্দ্রিয়ছাপ হতে উৎপন্ন হয়; তাই কোনো স্থায়ী আত্মসত্তা থাকলে সে সম্পর্কে অবশ্যই ইন্দ্রিয়ছাপ থাকত। কিন্তু এমন কোনো ইন্দ্রিয়ছাপ আমাদের নেই।[১০৪] সুতরাং স্থায়ীসত্তারূপে আত্মসত্তা বলে কিছু নেই। এ কথা প্রমাণ করার জন্য হিউম এক পর্যায়ে নিজের মধ্যকার প্রত্যক্ষণগুলোকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন এভাবে:

> আমি যখন আমার 'আমি' (myself) বলতে যা বোঝাই, তার মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে প্রবেশ করি, তখন আমি কোনো না কোনো প্রত্যক্ষণের ওপর, গরম বা ঠাণ্ডার ওপর, আলো বা ছায়ার

Dhaka University Institutional Repository

> ওপর, আনন্দ বা বেদনার ওপর, ভালোবাসা বা ঘৃণার ওপর হোঁচট খাই। আমি কোনো প্রত্যক্ষণ ব্যতীত 'আমি' কে ধরতে পারি না।[১০৫]

হিউম দেখান যে, মন বা আমিত্ব বলতে যা-ই বোঝা যায় না কেন – তা বিভিন্ন প্রত্যক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয় অর্থাৎ মন হলো বিচিত্র প্রত্যক্ষণের সমষ্টি। তবে আরজ আলী মাতুব্বরও দৈহিক ঘটনার কার্যাবলি হিসেবে মন বা আত্মসত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। তাই আরজ আলীর মতে:

> ... মানুষের 'প্রাণশক্তি' যার বলে মানুষ উঠা, বসা, চলাফেরা ইত্যাদি সংসারের নানা প্রকার কাজকর্ম করিতেছে, তাহা কি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি? করি নাই। কারণ 'প্রাণ' মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। প্রাণকে কোনরূপে প্রত্যক্ষ না করিলেও প্রাণের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি।[১০৬]

এখানে দেখা যায়– আত্মা সম্পর্কে হিউম ও আরজ আলী উভয়ই প্রায় একই মত পোষণ করেছেন। হিউম মনকে মানসিক ঘটনাবলির সমষ্টি হিসেবে আর আরজ আলী মাতুব্বর দৈহিক ঘটনার কার্যকলাপ হিসেবে তুলে ধরেছেন। এ হিসেবে আরজ আলীকেও হিউমের মতো অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক বলা চলে। পরিশেষে দেখা যায় হিউম ও আরজ আলী যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, কিছু কিছু সংশয় হচ্ছে প্রকৃত যুক্তির দাবিদার। বস্তুত দু'জনেই ছিলেন তাঁদের দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত আপোসহীন । উভয় দার্শনিকই সংশয়বাদকে যুক্তি দিয়ে সংস্কার সাধন করেছেন। তাই উভয়ের দর্শন দার্শনিক বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার। তাই হিউমের এ মত: 'Be a Philosopher but amidst all of your Philosophy be still a man'[১০৭] অর্থাৎ দার্শনিক হও, কিন্তু সমস্ত দার্শনিকতার মধ্যে তুমি যে একজন জীবন্ত, চলন্ত ও স্বাভাবিক মানুষ, এ কথা ভুলো না। এভাবে হিউম সর্ব অবস্থায় মানুষের ব্যক্তিসত্তার গুরুত্ব দিয়েছেন। হিউমের এ মত আরজ আলী মাতুব্বরও বোধহয় উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সর্বত্রই তিনি যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

হিউমের মতে, মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এদিক থেকে হিউম প্রয়োজনবাদীদের পূর্বসূরি। 'প্রয়োজন' বলতে হিউম কেবলমাত্র ব্যক্তির প্রয়োজনই বোঝেন না, তিনি সামগ্রিকভাবে সামাজিক প্রয়োজনের কথাও বোঝেন, হিতেচ্ছা সকলের সুখ-বিধানের সঙ্গে যুক্ত বলে সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবে পরসুখকে আত্মসুখে পরিণত করে।[১০৮] আসলে সহানুভূতির ভিত্তিতে আত্মসুখ ও পরসুখের পার্থক্য লুপ্ত হয়ে যায়। হিউম এভাবে আত্ম সুখবাদ ও পরসুখবাদের সমন্বয় সাধন করেছেন।[১০৯] হিউমের এ আত্মসুখ ও পরসুখের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সামগ্রিক মানবকল্যাণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় অর্থাৎ নির্দ্বিধায় তা

Dhaka University Institutional Repository

সাম্যবাদের প্রতিধ্বনি। আরজ আলী মাতুব্বরও সমাজের মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করতেন, হিউমের পরার্থবাদেই বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন কুসংস্কারমুক্ত মানুষের মঙ্গলের জন্য। আর তাঁর কাছে ধর্ম হলো মানবতাবাদ। তিনি ছিলেন মাটি ও মানুষের একান্ত আপন জন। আরজ আলীর ভাষায় 'সমাজ' মানব জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও সামাজিকতা দৃষ্ট হয়। সমাজ জীবনের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে– সহঅবস্থান, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ইত্যাদি।[১১০] আরজ আলী মাতুব্বর আরো স্পষ্ট করে সাম্যবাদের কথা বলেন:

> মানব সভ্যতা ও সমাজ উন্নয়নের প্রধান প্রধান ধাপগুলোর মধ্যে সমাজতন্ত্রকে বলা হয় চরম ধাপ। সাম্যবাদী সমাজ গঠনের প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এর মূলনীতি হচ্ছে – প্রত্যেকে নিজের 'সাধ্য' অনুসারে সমাজকে দেবে এবং নিজের 'প্রয়োজন' অনুসারে নেবে। এ সমাজে কারো কাজের অনিশ্চয়তা থাকবে না, ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ থাকবে না, মেহনতী মানুষকে শোষণ করার মতো মালিক ও মুনাফাশিকারির দল থাকবে না, থাকবে না শ্রেণীগত বৈষম্যের বিশাল প্রাচীর।[১১১]

আরজ আলী মাতুব্বর এভাবে সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করে বিশ্বমানবের মঙ্গলের তথা পরার্থের কথা বলেন। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিংবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে প্রমাণ করা যায় না এমন কোনো সত্তায় যেমন ঈশ্বর বা অলৌকিক কোনো ঘটনায় হিউম আদৌ বিশ্বাসী নন। ধর্মের প্রাকৃতিক ইতিহাস এবং প্রাকৃতিক ধর্ম সম্বন্ধে সংলাপ নামক দুটি গ্রন্থে এবং অলৌকিক ঘটনা প্রসঙ্গে *Of Miracle* নামক একটি প্রবন্ধে তিনি এ বিষয় আলোচনা করেন। ধর্ম সম্পর্কে হিউম বলেন জীবনের ঘটনাবলির সঙ্গে সংস্রব, ভয়ভীতি এবং বিশেষ করে দুঃখের অনুভূতি থেকেই ধর্মের উদ্ভব। অর্থাৎ মানুষের কুসংস্কার থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। হিউম মানব আকৃতির অনুকরণে কল্পিত আদিম দেব-দেবীদের – ভূত পরী প্রভৃতিকে কাল্পনিক সত্তা বলে বিবেচিত করেন।[১১২] আর আরজ আলী মাতুব্বর অবশ্য ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে সরাসরি কোনো কথা বলেননি বা প্রশ্নও তোলেননি। তিনি ছিলেন মুক্তচিত্ত দ্রোহী ব্যক্তিত্ব। মুক্তবুদ্ধি আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়েই তিনি জীবনের সবকিছুকে বিচার করতেন। তিনি উল্লেখ করেন:

> বিজ্ঞানমতে–পদার্থের ধ্বংস নাই আছে শুধু পরিবর্তন। দেখা যায়, তদ্রুপ মানব মনের বিশ্বাসেরও লয় নাই, আছে শুধু পরিবর্তন। পূর্বে লোকে নানা প্রকার উপকথা, রূপকথায়ও বিশ্বাস করিত। কিন্তু এখন আর তাহা করে না। নানা প্রকার ভূতের গল্প, জিন-পরীর কাহিনী, নানা প্রকার তন্ত্র-মন্ত্রে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই আজকাল আর বিশ্বাস করে না। তবে যে উহা সমাজে একেবারেই

Dhaka University Institutional Repository

> অচল, তাহা নহে। 'রূপকথা' লোকে রূপকথা বলিয়াই গ্রহণ করিতেছে, 'সত্য' বলিয়া মনে করিতেছে না।[১১৩]

আরজ আলী মাতুব্বর ও হিউম উভয়ই একমত পোষণ করেন যে, ধর্মের কাল্পনিক ও অতিন্দ্রীয়সত্তা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। উভয় দর্শানিকই ছিলেন বাস্তববাদী এবং সব কিছুকে বাস্তবতার আলোকেই তাঁরা মূল্যায়ন করেছেন। উভয় দার্শনিকই মনে করেছিলেন অন্ধতা ও কুসংস্কারই মানব সমাজের উন্নতি ও প্রগতির প্রধান অন্তরায়। অতএব মানবিক প্রগতির জন্যই প্রয়োজন অন্ধত্ব ও কুসংস্কারমুক্ত এক মানব প্রজন্ম। এ উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়েছে এ দুই দার্শনিকের জীবনের কর্মকাণ্ড। আরজ আলী মাতুব্বর প্রায়োগিক যুক্তির কষ্টিপাথরে মানব প্রকৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের অস্তিত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে তিনি বিমূর্ত চিন্তা শক্তিকে মোটেই গুরুত্ব দেননি। মানুষের অবস্থা, অবস্থান, উদ্দেশ্য ও মনোভাব প্রভৃতির ব্যবহারিক দিকের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ আরজ আলী মাতুব্বর ও সমকালীন দর্শনে মানবতাবাদ

প্রাচীনকাল থেকেই দর্শনের ইতিহাসের সূত্রপাত। যুগে যুগে দার্শনিকরা জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যা উত্থাপন করেছেন। মানুষের এই সমস্যাজনিত চিন্তন যখন যৌক্তিকরূপ নিয়ে সুগঠিত হয় এবং স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হয়– তখনই তা দর্শনের মর্যাদার স্বীকৃতি লাভ করে। বিভিন্ন যুগে সমাজ সভ্যতার বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয়ের দার্শনিক আলোচনার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি তথা প্রকৃতি বিবর্তিত হয়। যুগে যুগে সমাজে দর্শনের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ প্রত্যেক দার্শনিকই তাঁর নিজস্ব সমাজ, সভ্যতা তথা যুগের বাস্তব অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হন।

গ্রিক দার্শনিক থেলিস থেকে পাশ্চাত্য দর্শনের সূত্রপাত ঘটে। আর সমকালীন যুগ হচ্ছে অতিসাম্প্রতিক যুগ। সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জীবনমুখিতা। সমকালীন যুগে দর্শনকে মানুষের প্রয়োজনে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করার কথা বলে। ব্যক্তিমানুষের বৈষয়িক প্রয়োজনকে সমকালীন যুগ বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনে বিজ্ঞানের প্রতি অধিকতর ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক আন্দোলনে বিজ্ঞান ও দর্শনকে একত্র করে ফেলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মার্কসবাদী দর্শন এবং অস্তিত্ববাদী দর্শন সরাসরি ব্যক্তি মানুষকে নিয়ে আলোচনা করেছে। কার্ল মার্কস (১৮১৮ খ্রি.-১৮৮৩ খ্রি.) এর মতে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি পৃথক জীবন ও কর্মচাঞ্চল্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজ অস্তিত্বের জন্য এদের প্রত্যেককেই একে অপরের উপর এবং সমাজের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সমাজের সমবায়ে গড়ে ওঠে এমন একটি একক অবিভাজ্য 'সমগ্র' যার উন্নতি ও অগ্রগতিতে ব্যক্তি অর্জন করতে পারে যথার্থ সুখ। কার্ল মার্কস এভাবে সর্বহারাদের পক্ষে কথা বলেছেন, বস্তুত ব্যক্তি নয়– সমাজই প্রকৃত মানবীয় একক। সব মানুষের সঠিক কল্যাণের জন্য তিনি মানুষের চিন্তাকে সমষ্টিগত, মানুষের কর্মকে সংঘবদ্ধ এবং মানুষের সম্পদের সুপরিকল্পিত ব্যবহারের কথা বলেছেন।[১১৪] এভাবে তিনি সমাজের সকল স্তরের মানুষের কল্যাণের কথা বলেছেন। আরজ আলী মাতুব্বর যাবতীয় ভেদাভেদের উর্ধ্বে জীবনের মানবিক দিকটিকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং মানবিক বোধের বাইরের সবকিছুকে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। তাই বলা যায়:

> যিনি আধুনিক চিন্তায় নিজেকে পরিপুষ্ট রাখেন, যিনি আধুনিক মননে নিজেকে শাণিত রাখেন তাঁর সামনে পৃথিবীর সীমানা খোলা থাকে। তাঁকে রাষ্ট্র, জেলা কিংবা গ্রামের সীমানা দিয়ে কখনো সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। যদি একজনের দার্শনিক অনুভব একটি ছোট্ট গ্রামের হাজার মানুষকে বদলে দিতে পারে তাহলে বুঝতে হবে তাঁর দার্শনিক সত্যে কোনো ঘাটতি নেই। সেটা মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

হৃদয় স্পর্শ করে আছে। এই দার্শনিক অনুভব দিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর নিজের জীবনকে পরিচালিত করেছেন এবং তাঁর পারিপার্শ্ব সমাজকে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন।[১১৫]

কার্ল মার্কস মেহনতি মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন। পৃথিবীর শোষণমুক্তির ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক সূত্র ও মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের আলোচনায়ই সীমাবদ্ধ ছিলেন না; তিনি জনগণের দারিদ্র্য, শোষণ অবসানের পথও নির্দেশ দেন।

তিনি স্বয়ং বহু শ্রমিক আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন। তিনি ১৮৬৪ সালে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস্ এসোসিয়েশন (International working Men's Association) প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই সংস্থা ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল বা প্রথম আন্তর্জাতিক (First International) নামে পরিচিত হয়। তিনি তাঁর তত্ত্ব ও এই সংস্থার মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ মুক্তির আন্দোলনে শামিল করার জন্য প্রয়াসী হন। ঘোষণা করেন শোষণ ও অন্যায় দূর করার মুখ্য ভূমিকা পালন করবে সর্বহারা শ্রেণী। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ১৯১৭ সালে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র কায়েম হয় –যা ছিল মার্কসবাদের প্রথম প্রায়োগিক রূপ তথা প্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠা।[১১৬]

দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেড়ে ওঠা আরজ আলী মাতুব্বরের চেতনায়ও শ্রেণী সংগ্রাম ও সামাজিক বৈষম্যের কথা উপলব্ধি করা যায়। মার্কসের মতো রাজনৈতিক আন্দোলনে তা কখনো মুখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে নি। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন, সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদ বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানের একমাত্র মাধ্যম। এ ছাড়া শুধুমাত্র রকেট রোবটের ব্যবহার ও স্বর্গ-নরকের দর্শনের দ্বারা উন্নয়নের প্রচেষ্টা অযৌক্তিক ছাড়া আর কিছুই নয়।[১১৭]

মার্কস বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে অর্থাৎ সর্বহারা মানুষের পক্ষে কথা বলার কারণে শ্রমিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ফলে নিজ মাতৃভূমি জার্মানি থেকে এবং পরে প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। লন্ডনে তাঁর জীবন ছিল দারিদ্র্যপীড়িত। উল্লেখ্য জার্মানিতে তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে। ছেলেমেয়েদের পেটভরে খাওয়ানোর জন্য নিজেকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হতো, শীতবস্ত্র ছিল না বললেই চলে। তবুও এই দুঃখ কষ্টকে উপেক্ষা করে 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম' লাইব্রেরিতে দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়াশোনা করতেন।[১১৮]আরজ আলী মাতুব্বরকে অবশ্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে (যা ছিল সর্বসাধারণের জন্য কল্যাণকর) পেতে হয়েছিল পবিত্র হাজতবাস। আরজ আলী মাতুব্বরও বাবাকে হারিয়ে বাবার কৃষি জমি হারিয়ে অর্থকষ্টে মার্কসের মতো দু'বেলা অন্নের জন্য স্ত্রী-পরিজন নিয়ে কষ্ট করতে হয়েছিল প্রচুর। আরজ আলীর ভাষায় তাঁর থাকার ঘর ছিল :

Dhaka University Institutional Repository

> দৈর্ঘ্য পাঁচ হাত ও প্রস্থে চার হাত ঘরখানা তৈরির সরঞ্জাম ছিল ধৈঞ্চার চাল, গুয়াপাতার ছাউনী, মাদারের খাম, খেজুরপাতার বেড়া ও তেঁকিলতার বাঁধ। আর তারই মধ্যে ছিল ভাতের হাঁড়ি, পানির কলসী, পাকের চুলো, কাঁথা-বালিশ সবই। রাতে শুতে হতো পা গুটিয়ে। ঘুমের ঘরে কবলে পা মেলে ফেললে হয়তো ভাতের হাঁড়ি কাত হয়ে পড়ত বা জলের কলসি পড়ে গিয়ে কাঁথা-বালিশ ভিজে যেত। একটি এটেকলা দ্বারা তখন আমরা মায়ে-পুতে পান্তা ভাত খেতাম দু' বেলা।[১১৯]

অতিকষ্টে এমনভাবে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়েছে আরজ আলী মাতুব্বরকে। দেখা যায় এ দুই দার্শনিক একই রকম দুঃখ-কষ্টে কালাতিপাত করেছেন। এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থেকেও তিনি মার্কসের মতোই তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন পড়াশোনা করে। প্রতিষ্ঠানিক আগ্রহের বাইরে থেকেই তাঁর বিদ্যাচর্চার প্রতি দুর্মর আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। তাঁর শৈশবে (বাংলা ১৩২১ সালে) জ্ঞাতিচাচার কাছ থেকে সীতানাথ বসাকের তৎকালীন দু'আনা দামের একখানা আদর্শলিপির বই পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর দরিদ্রতার কষাঘাতে তাঁর সে শখের বইখানা রক্ষা খুবই বিপদজ্জনক হয়েছিল। তার ভাষায়:

> সারাক্ষণ পড়তাম ও সাথে সাথে রাখতাম। ... কিন্তু আমার সে সাধের সম্পত্তিটুকু রক্ষা করতে বিপদ দেখা দিলো বর্ষাকালে। ... চালে বৃষ্টির পানি মানায় না। অল্প বৃষ্টির সময় যেখানে রাখতাম বৃষ্টি বেশি হলে সেখান থেকে সরাতে হতো, অত্যধিক বৃষ্টি হলে কোথাও স্থান পেতাম না। তখন উপুড় হয়ে বইখানা রাখতাম বুকের নিচে।[১২০]

মার্কসের মতো আরজ আলী মাতুব্বরের ছিল ভয়াবহ কঠিন সংগ্রামময় জীবন। তবুও এ সংগ্রামময় জীবন ও অভাব অনটন তাঁর পুস্তকপ্রীতি আর কৌতূহল শেষ করতে পারেনি। আদর্শলিপি পাবার সাত বছরের মাথায় তিনি অভাব-অনটনের মধ্যে পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ শুরু করেন এবং ১৮ বছরে তিনি ৯০০ বই সংগ্রহ করেছেন। বইয়ের আলমারি না থাকায় এক ঘূর্ণিঝড়ে দুর্বল ঘরের সাথে বইগুলি উড়ে যাওয়ায় উন্মাদের মতো চেষ্টা করেছিলেন বইগুলো সংগ্রহ করতে। তাঁর ভাষায়:

> পরের দিন পথে প্রান্তরে পেয়েছিলাম দু'চার খানা ছেঁড়া পাতা। মাতৃশোকে আমি কাঁদিনি, কিন্তু বইগুলোর দুঃখে সেদিন আমার যে কান্নার বান ডেকেছিল, তা আমি রোধ করতে পারিনি।[১২১]

সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে কার্ল মার্কস এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। গত এক শ'বছরের অধিক সময় ধরে তাঁর শিক্ষা ও দর্শন চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর তত্ত্বের সমর্থনে যেমন অসংখ্য মানুষ ও বুদ্ধিজীবী সমবেত হয়েছেন, তেমনি তাঁর বিরুদ্ধে বহু তাত্ত্বিক সরাসরি অথবা পরোক্ষ আক্রমণ করেছেন। তবে এ কথা সত্য যে পৃথিবীর শোষণ মুক্তির ইতিহাসে তাঁর নাম আজও অবিস্মরণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

এমিল বার্নসের ভাষায়, "মার্কসবাদ হলো আমাদের এই জগৎ এবং তারই অঙ্গ মানবসমাজ সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্ব।"[১২২]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ইতিহাসে আরজ আলী মাতুব্বরও এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর দর্শন ও চিন্তা এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মার্কসের মতো বুদ্ধিমুক্তির চিন্তার সমর্থনে একদল বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে মুক্তবুদ্ধির বুদ্ধিজীবিগণের অভূত প্রশংসা কুড়িয়েছেন, অপরদিকে মৌলবাদীদের পক্ষ থেকে পেয়েছেন প্রচণ্ড আঘাত। মার্কসবাদ কোনো আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী নয়। ইতিহাসের বিশেষ পটভূমিকে, বিশেষ অবস্থা ও অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করেই মার্কসবাদের সৃষ্টি ও বিকাশ। মার্কসের সময়ে ইউরোপ ও ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব সমাধা হওয়ায় উৎপাদন পদ্ধতিতে আমূল রদবদল ঘটে। বৃহদায়তন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার ফলে শিল্পপতিরা পুরুষ, মহিলা ও শিশু শ্রমজীবীদের কম মজুরিতে কাজে লাগাতে থাকে। এ অবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা বাড়তে থাকে। তাঁরা ক্রমশ অধিক গরিব হতে থাকে। এই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা ও অসম্মানজনক অবস্থা থেকে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য কার্ল মার্কস এক মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব।[১২৩]

আরজ আলী মাতুব্বর আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করেননি। বিজ্ঞানভিত্তিক অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করেই তাঁর দর্শন সৃষ্টি। তিনি মৌলবাদী গ্রাসে আক্রান্ত সমাজটিকে পাল্টে দিতে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। মার্কস শুধু শ্রমজীবীদের সপক্ষে কথা বলেছেন; আরজ আলী আপামর জনসাধারণের চেতনায় আঘাত হেনেছেন তাঁদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে। তিনি সমাজের কুসংস্কারের দ্রোহী ছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, "মানুষের মুক্তি এবং বিজ্ঞানের যুক্তি প্রতিষ্ঠার এক নম্বর বাঁধা, দীর্ঘদিনে সঞ্চিত কুসংস্কার।"[১২৪]

মার্কসের মতে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার জন্য ধর্মীয় অদৃশ্য শক্তিই দায়ী। ধর্মীয় নেশা মানবজীবনের কল্যাণের জন্য অপ্রয়োজনীয়, অনিষ্টকর—যার ফলে মানবসমাজে নেমে আসে দারিদ্র্যের কষাঘাত, কলহ ইত্যাদি। আর এ থেকে ধর্মযাজকদের উপর নির্ভর করে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নেই। মার্কসের মতে অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য দূর হতে পারে, এবং মানুষ দুঃখ–দুর্দশার করুণ পরিণতি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।

কিন্তু আরজ আলী মার্কসের মতো প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন না। ধর্মীয় বিধান ও ধর্মপতিদের মাধ্যমে সমাজে যে অন্যায় অবিচার তারই বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। খোদ ধর্ম কোনো কিছুর জন্য দায়ী নয়, দায়ী হলো সে সব ব্যক্তি যারা ধর্মকে অসাধু উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং ধর্মের নামে শোষণ ও নির্যাতন করছে– তারা। তাই আরজ আলী কখনো ধর্মের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

অভিযানের কথা বলেননি বরং ধর্মে বিধি–বিধান প্রয়োগকারীদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন যাদের জন্য সমাজে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, ধর্মের দোহাই দিয়ে দিনে দিনে বাড়ছে অমানবিকতার মাত্রা।

বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে বৌদ্ধ ধর্ম হল নাস্তিকতামূলক মানবতাবাদী দর্শনের ভিত্তি। মার্কসের ধর্মবিরোধী মনোভাব বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদী ছিলেন কিন্তু মার্কস ঈশ্বরবাদী ধর্ম-বিশ্বাসকে আক্রমন করেছেন, বৌদ্ধ ধর্মকে নয়। ঠিক তেমনি আরজ আলীও ঈশ্বরবাদী ধর্ম-বিশ্বাসকে আক্রমণ করেছেন। বৌদ্ধধর্ম বা অন্য মানবতাবাদী ধর্মকে নয়। কারণ আরজ আলী ছিলেন মানবতাবাদী।

আরজ আলীর মতে প্রাচীন কাল থেকেই রাষ্ট্রের উত্থান পতন আছে । কিন্তু ধর্মের তেমন উত্থান-পতন নেই। কারণ, রাষ্ট্রের আছে ধ্বংসকারী বিভিন্ন অস্ত্র, যা ধর্মের নেই। ধর্মের উপর নির্ভরশীল মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও অভিশাপ নামক অস্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত, তারা এখানে আত্মসমর্পণ করে।[১২৫] এখানে বুদ্ধ ও মার্কসের সাথে তাকে তুলনা করা যায়। বুদ্ধ ও মার্কস যেমন পৃথিবীতে মানুষের দুরবস্থার চিত্র এঁকেছেন, আরজ আলীও ধর্মভিত্তিক এবং ধর্মভীরু মানুষের দুরবস্থার কথা বলেছেন। বৌদ্ধধর্মে মানুষের এ অবস্থাকে বলা হয়েছে দুঃখ, মার্কসবাদে এ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা হলো দাসত্ববন্ধন। আরজ আলী এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার কারণ হিসাবে অন্ধবিশ্বাস ও যুক্তি উপলব্ধির অভাবকে চিহ্নিত করেছেন। আরজ আলীর মতে 'অভিশাপ ও আশীর্বাদ' নামক ধর্মের দুটো অস্ত্র-তা কোনো মানুষ, কোনো সম্প্রদায় বা জাতির উপর একেবারেই অকেজো, অর্থহীন। কারণ আরজ আলী, বুদ্ধ ও মার্কসের মতো তত্ত্বের চেয়ে ব্যবহারিক দিক ও অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বুদ্ধের মতে, সত্যকে কোনো মতবাদের মধ্যে পাওয়া যায় না, সত্যকে পেতে হবে সক্রিয় কর্মের মাধ্যমেঃ যেমন ধ্যান, বা যোগাসন, শীলপালন, নৈতিক জীবনযাপন প্রভৃতি অনুশীলনের মাধ্যমে। মার্কসও মনে করেন সত্যকে যাচাই করতে হবে অনুশীলন দ্বারা, সর্বোপরি মানবোচিত জীবনের অনুশীলনের মাধ্যমেই সত্যকে পাওয়া যাবে।

আরজ আলী আস্তিক্যবাদের ঘোরবিরোধী ছিলেন। কারণ আস্তিক্যবাদে ঈশ্বরের ধারণাই প্রধান। যার ফলে মানুষের নিজস্ব স্বাধীনতা বা মর্যাদা বলতে কিছু থাকে না। আস্তিক্যবাদে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি সাধনের জন্যই মানুষ বা জীবের প্রতি দয়া বা ভালোবাসার কথা বলা হয়। এভাবে প্রত্যেক ধর্মেই কিছু না কিছু নির্দিষ্ট বিধান আছে। আরজ আলীর মতে ধর্মের এ বিধানসমূহের সমালোচনা করার কোনো উপায় নেই, তা হলে সে পাপী বলে গণ্য হবে এবং তার স্থান হবে নরকে অর্থাৎ যথার্থ জীবনযাপন করতে হলে মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কাজেই ধর্মের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে সমালোচনা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ধর্মের বিধি-বিধানের যেমন নেই কোনো সমালোচনা তেমনি নেই কোনো উত্থান-পতন, এ যেন আপন গতিতে বহমান।

মার্কস ধর্মকে মনে করেছেন রোগের লক্ষণ হিসেবে। এ রোগ মানুষকে তাঁর স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, মানুষের পর্যুদস্ত অর্থনৈতিক অবস্থাই (যা সমগ্র সমাজকে গ্রাস করে ফেলে) এ বিচ্ছিন্নতার কারণ। যে সমাজে পুঁজিপতিরা তাদের নিজের সুবিধার জন্য সাধারণ মানুষকে শুধু পণ্য উৎপাদনকারীই মনে করে, সেই পুঁজিবাদী সমাজের স্বরূপ প্রকাশ পায় ধর্মে। মার্কস মনে করেন, ধর্ম হল নির্যাতিত প্রাণীর এক দীর্ঘশ্বাস। মার্কসের মতে সাধারণ লোককে যে ধর্ম মিথ্যা সুখের আশ্বাস দেয়, সে ধর্ম প্রকৃত পক্ষে ধর্ম নয়। আরজ আলীও মনে করতেন, প্রকৃতভাবে মানুষের মন যা চায়, ধর্ম তা দিতে পারে না। তাইতো তিনি উপলব্ধি করেছেন- "ক্ষুধার্ত বলদ যেমন রশি ছিঁড়িয়া অন্যের ক্ষেতের ফসলে উদরপূর্তি করে, মানুষের মনও তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ছুটিয়া যায় দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।"[১২৬] অর্থাৎ তাঁর মতে ধর্মের মিথ্যা প্রয়াস জ্ঞানপিপাসু লোক গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।

আরজ আলী "জ্ঞানই পুণ্য" এ কথা স্বীকার করতে নারাজ। তাঁর মতে, "কোন বিষয় বা কামনা সম্পর্কে না দেখিয়াও বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু একেবারেই না বুঝিয়া বিশ্বাস করে কিরূপে?"[১২৭] ধর্মযাজক যখন দৃঢ়কণ্ঠে সব কিছু না বুঝে, না দেখে বিশ্বাস করতে বলেন, তখন মানুষ তা বিশ্বাস না করতে পারলেও পাপের ভয়ে অথবা ধর্মীয় জাতীয়তা রক্ষার ভয়ে আপাতত স্বীকার করে নেয় বা স্বীকার করার ভান করে। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, এভাবে জ্ঞানের অগ্রগতিতে বাধা, মনের অদম্য স্পৃহায় আঘাত, আত্মার অতৃপ্তি ইত্যাদি কারণে মানুষের মধ্যে ধর্ম কর্মে শিথিলতা দেখা দেয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের মনের ক্ষুধা অতৃপ্তই থেকে যায়, সৃষ্টি হয় বিচ্ছিন্নতা।[১২৮]

জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। বিশ্বাস ছাড়া জ্ঞান হয় না। কিন্তু জ্ঞান ছাড়া বিশ্বাস হতে পারে। সত্যিকারের বিশ্বাস হতে হবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে কল্পনা বা অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস জ্ঞান নয়, তা হলো অভিমত; যাকে বলে অন্ধ-বিশ্বাস। সাধারণ লোকের কাছে এই অন্ধত্ব হলো 'বিশ্বাস'। প্রকৃত বিশ্বাস হতে হবে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা প্রত্যক্ষিত তা সর্বদাই বিশ্বাস্য। বিজ্ঞান সর্বদাই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে কোনো সন্দেহ থাকে না। ধর্মকে সন্দেহাতীতরূপে পেতে হলে অন্ধবিশ্বাসের মাধ্যমে সম্ভব নয়, ধর্মকে খাঁটি বিশ্বাস অর্থাৎ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

এখানেও দেখা যাচ্ছে আরজ আলী বুদ্ধ ও মার্কসের মতো তত্ত্বের চেয়ে ব্যবহারিক দিক বা অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বুদ্ধ ও মার্কস যেমন মনে করেন সত্যকে পেতে হবে

Dhaka University Institutional Repository

অনুশীলনের মাধ্যমে, আরজ আলীও তেমনি মনে করেন সত্যকে পেতে হবে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক ইত্যাদির ব্যবহারের সাহায্যে অনুশীলনের মাধ্যমে। অর্থাৎ যা কিছু প্রত্যক্ষ করা হয় তাই বিশ্বাস্য, এবং যা বিশ্বাস্য তাই সত্য।

তবে প্রাণশক্তি নামক অপ্রত্যক্ষিত জিনিসকে অনুমানের মাধ্যমে বিশ্বাস করতে হয়। কারণ প্রাণের কার্যকলাপ লৈহিক ঘটনারূপে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। মানুষের 'প্রাণশক্তি'র কারণেই মানুষ ওঠাবসা, চলাফেরা করে। আরজ আলীর মতে, প্রাণকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা না গেলেও তার কার্যকলাপ ও লৈহিক ঘটনারূপে প্রাণের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হচ্ছে। কার্য থাকিলে তাহার কারণ থাকতে বাধ্য, এই স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির বলে লৈহিক ঘটনাবলির কারণরূপে প্রাণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।[১২৯] এখানে আরজ আলী মাতুব্বর ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্মের উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। আরজ আলী প্রমাণ করেছেন যার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ নেই তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই; তাঁর মতে যে সব ঘটনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রমাণ নেই অথবা কার্যকারণ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়াস নেই, এক কথায় যুক্তি যেখানে অনুপস্থিত এইরূপ কাহিনীতে বিশ্বাস রাখার নামই অন্ধবিশ্বাস। বিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞানের যুগেও বহুলোক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের গভীরে নিমগ্ন।[১৩০] আর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই গুণটি পরিহারের মাধ্যমে তৈরি হবে একটি সুশীল সমাজ।

তিনি আরো লক্ষ করেন, ধনী ও গরিবের আয়-ব্যয়ের স্তরগুলি সর্বকালে সর্বযুগেই ভিন্ন ধরনের। মানুষ অনুকরণ প্রিয়, কালক্রমে ধনীর বিলাসিতা বিভিন্নভাবে প্রবেশ করতে শুরু করেছে গরিবের ঘরে। ফলে অমিতব্যয়িতা এবং অপর দিকে ধনীরা বিভিন্নভাবে গরিবদের গ্রাস করছে। অযথা ঈমানের অভাবকে গরিবদের দুঃখের কারণ বলে দায়ী করা হচ্ছে। এখানেও মার্কসের সাথে আরজ আলীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণ মানুষের দুঃখের কারণের জন্য মার্কস যেমন আক্রমন করেছেন :

১. বুর্জোয়া শ্রেনীর অধিপত্য;

২. সাধারণ মানুষের অধিকার হননকারী পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা;

৩. এবং মানুষের বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ হিসাবে ধর্ম;

আরজ আলী তেমনি সাধারণ মানুষের দুঃখের কারণ হিসাবে দায়ী করেছেন :

১. আল্লাহর বিধানের (নিয়তির) উপর মানুষ নিজকে অর্পিত করা;

২. ব্যক্তি-মানুষের সমাজ চেতনার অভাব;

৩. ব্যক্তির কর্মবিমুখতা।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, উপরোক্ত কার্যাবলি থেকে ব্যক্তি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারলে 'বরকত' উঠে গিয়েছে, ঈমান বা বিশ্বাসের অভাব জন্মেছে, এ কথা বলার অবকাশ থাকবে না। ফলে তাঁর ভাষায়ই বলতে হয়, দেশে: "বর্তমানে খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু ইহা খাদ্য- খাদকের সমতার অভাবেই ঘটিয়াছে, 'বে-ঈমান' বা অবিশ্বাসের জন্য নয়।"[১৩১]

তাই দেখা যায় মার্কসের মতো আরজ আলী মাতুব্বরেরও ধারণা সাধারণ মানুষ কুসংস্কারমুক্ত হলে সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। কার্ল মার্কস ও আরজ আলী মাতুব্বর উভয়ই বাস্তববাদী দার্শনিক। উভয় দার্শনিকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। সমাজে সাধারণত আমরা দু'ধরনের শোষণ-নিপীড়ন দেখতে পাই, যা থেকে মানুষ শোষিত ও নির্যাতিত হয়। তার মধ্যে কার্ল মার্কসের মতবাদ বর্তমান সময়ের নির্যাতিত শ্রমিকদের জন্য একটি মহান আদর্শ। এই মতবাদ পুঁজিবাদী ধনিক শ্রেণীর শোষণের প্রক্রিয়াটি সাধারণ মানুষের কাছে উন্মোচিত করেছে। শ্রমিক শ্রেণী তাদের অধিকার আদায়ের প্রতি সচেতন হতে এবং অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার হবার প্রেরণা পেয়েছে। অপরদিকে আরজ আলী মাতুব্বর অন্ধ-কুসংস্কারের যাতাকলে নিষ্পেষিত মানুষের উদ্ধারের লক্ষ্যে কথা বলেছেন। অধ্যাপক আহম্মদ শরীফের ভাষায় :

> আরজ আলী মাতুব্বরের মতো এমন অসাধারণ, অনন্য, অসামান্য বিস্ময়কররূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তিনি জীবনে দেখেন নি এবং শোনেন নি। ...মাতুব্বর সাহেব বিজ্ঞানী না হয়েও অসংশোধনীয় রূপেই বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন। চারিদিকে গুটগুটে অন্ধকার কুসংস্কারের, অশিক্ষার, কুশিক্ষা ও অবৈজ্ঞানিকতার। তারই মধ্যে হাতে একটি আলো নিয়ে ঘুরেছেন এই বৃদ্ধ একাকী।[১৩২]

দেখা যায় আরজ আলী মাতুব্বরও মার্কসের মতো একটু অন্যভাবে সর্বসাধারণ মানুষের কথা বলেছেন, সকল মানুষের হাতে আলোকবর্তিকা তুলে দিয়েছেন, চেতনায় উন্মেষ ঘটিয়েছেন। সমাজ চেতনাসম্পন্ন এ ধরনের মানুষই নির্ধারণ করে দেশ ও সমাজের ভবিষ্যত। আরজ আলী মাতুব্বর যা জীবন থেকে শিখেছেন। তিনি লড়াই করেছেন প্রাচীনপন্থি সমাজপতিতের বিরুদ্ধে, যে সমাজে ছিল কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কথা বলা ভীষণ অপরাধ। উদাহরণস্বরূপ তাঁর মায়ের মৃত্যুজনিত ছবি তোলার ঘটনাটি থেকেই বোঝা যায়। মার্কসের মতো তিনি কথা বলেছেন যুক্তির কথা, সত্যের কথা– যা সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে অপরিহার্য। যুক্তি ও বিজ্ঞানকে হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করে আঘাত হেনেছেন ধর্ম ও ধর্ম-বিশ্বাসকে। তাঁর ভাষায়:

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাই কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেও আমাদের সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান যাহা বলে, তাহা আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে বিশ্বাস করি। কিন্তু অধিকাংশ ধর্ম এবং ধর্মের অধিকাংশ তথ্য অন্ধ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।[১৩৩]

আরজ আলী যে সত্যের পক্ষে সারাজীবন লড়েছেন, সে সত্য দিনে দিনে আরও দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে। আরজ আলী প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। জ্ঞান চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন মার্কসেরই মতো। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্বসহ অনেক বিষয়ই ছিল তাঁর নখদর্পণে। মোট কথা তিনি ছিলেন সর্বোপরি একজন স্বশিক্ষিত মানুষ। আরজ আলী মাতুব্বর সারা জীবন নিজ শ্রেণীর মধ্যেই থেকেছেন। সমাজ সম্পর্কে আরজ আলী মাতুব্বরের উপলব্ধি এ রকম :

আমি একমাত্র কৃষক, তবে রাজনীতি করি না। কিন্তু এটুকু বুঝি সমাজের কৃষকেরা কাজ করছে কলের মতো। কল চালানোর জন্য যতটুকু তেল দরকার তাও দেওয়া হয় না। তাই তো কৃষকেরা না খেয়ে মরছে। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হোক-এটা আমি চাই ... আমরা কুসংস্কারের অন্ধকারের ভেতরে ডুবে আছি। এ অন্ধকার দূর না হলে আমাদের কিছু করার থাকবে না। কারণ শিক্ষা ও মুক্তবুদ্ধির আলো ছাড়া অন্ধকার কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। সব রাজনীতিবিদই শ্রমিক ও কৃষকের কথা বলেন। যখন ওরা রেডিওতে কৃষকের কথা বলেন, তখন রেডিও বন্ধ করে দেই। ...কুসংস্কার দূর করার জন্য লেখনী ধরেছি, সেটাওতো এক ধরণের রাজনীতি। তাছাড়া; একটা মানুষ কত কাজ করবো।[১৩৪]

দেখা যায় আরজ আলীর জন্ম শোষিত, নির্যাতিত, পিছিয়ে পড়া এক শ্রেণীতে। পিছিয়ে পড়া এই শ্রেণীর মধ্যে আরজ আলী উপলব্ধি করেছিলেন ক্লেদাক্ত মানবতা ক্রন্দন। তাই তিনি কথাগুলি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। মুজতবা আলীর ভাষায়:

যুগে যুগে মহাপুরুষরা এসেছেন দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও নতুন ধন বন্টন পদ্ধতি প্রচলন করতে। অন্যান্য নীতি ও রীতি প্রচার ছাড়াও তারা তা জোর দিয়ে বলেছেন বলেই সমাজে যারা শোষিত বঞ্চিত, হ্যাভনট প্রলেতারিয়েৎ বা সর্বহারা শ্রেণী, তারাই প্রথম ধর্মকে গ্রহণ করে। কিন্তু বড়ো পরিতাপের বিষয় কয়েক শতাব্দী পর দেখা গেল আবার সেই শোষকের দল, যারা পাদ্রী, পুরোহিত ও মোল্লা হয়ে অবির্ভূত হলো। তারা ধন সুষম বন্টনের কথা না বলে, সাম্যমৈত্রীর কথা না তুলে, তারা শুধু আচার-অনুষ্ঠান, দেবদেবীপূজা, অর্চনা, যীশুর নামে অঙ্গভঙ্গি, রোজা, নামাজ ও হজ্ব ইত্যাদির – কথাই বারবার বলেন জোর গলায়। ধর্মের ঐ অর্থনৈতিক দিকটা তারা আলোচনা করতে নারাজ।[১৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর ও মার্কস ধর্মীয় ও নৈতিক চিন্তাধারায় মানুষের স্বরূপের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রচলিত ধর্মব্যবস্থাকে তাঁরা সমালোচনা করেছেন। তাঁরা অনুধাবন করেছেন অতীন্দ্রিয় সত্তার বেদিমূলে মানবতাকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। মার্কস তাই বলেন, "ধর্মের জগৎ বাস্তব জগতের প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১৩৬] মার্কস বুর্জোয়াদের সমালোচনা করেন এবং শোষিত সর্বহারাদের পক্ষাবলম্বনের কথা বলেন। শোষিত সর্বহারাদের জন্য তিনি মানবীয় নৈতিক আবেদন যেমন, ন্যায়পরতা, সাম্য, পারস্পরিক সহমর্মিতা, দয়া ইত্যাদির কথা বলেন। মার্কসের মতে, "সব মানুষের সার্বিক কল্যাণ যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে মানুষের চিন্তাকে অবশ্যই সমষ্টিগত, মানুষের কর্মকে সংঘবদ্ধ, এবং মানুষের সম্পদকে অবশ্যই সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় অতীত ও বর্তমানে যেমন, ভবিষ্যতেও তেমনি আমরা এমন সব ব্যক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করব, যারা সমাজের সার্বিক কল্যাণের কথা না-ভেবে নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।"[১৩৭] এভাবে যারা মানুষের অস্তিত্ব ও প্রকৃতিকে নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিতে দেখার পক্ষপাতী, মার্কস তাদের সমালোচনা করেন।

আরজ আলী মাতুব্বর মার্কসের মতো নৈরাশ্যের পরিবর্তে আশাবাদি দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে দেখার কথা অনুভব করেন। তাঁর মতে দরিদ্র শ্রেণী আগেও যাদের দ্বারা শোষিত-নির্যাতিত হয়েছে আজও তা হচ্ছে। আরজ আলী মাতুব্বর এর ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছেন শেকড়সুদ্ধ উপড়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। সমাজের অভ্যন্তরে শিকড় বসিয়েছেন – অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মানুষের মুক্তির দাবিতে। তিনি লড়াই করেছেন কৃষক সমাজের জন্য, দূর করার চেষ্টা করেছেন শ্রেণীয় কূপমণ্ডূকতা ও পশ্চাৎপদ জরাজীর্ণতাকে। তাঁর *সত্যের সন্ধান* ও অন্যান্য রচনা ওই অনগ্রসর শ্রেণীর সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে, যা চেতনার জগতকে ভেঙ্গে দিয়ে শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটাতে পারে। ফলে মার্কসের মতোই এভাবে আরজ আলী মাতুব্বরকে আগামী দিনের মেহনতি মানুষ স্মরণ করবে শ্রদ্ধা করবে। ফলপ্রসূ হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরজ আলী মাতুব্বরের চেতনা ও দর্শন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল (১৮৭২ খ্রি.-১৯৭০ খ্রি.) ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতো একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইংরেজ দার্শনিক। শতাব্দীকালের দীর্ঘ জীবনে দুটি মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষকারী। মানবিক আদর্শ ও চিন্তাধারার জন্য বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন। জীবনের কোনো কিছুকে তিনি বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করেননি। তিনি এতই মানবতাবাদী ছিলেন যে, শতাব্দীকালের দুটি মহাযুদ্ধ তাকে ভীষণ বিচলিত করে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে সরকার তাঁকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করায় তার মনে সাম্যবাদ ও মানবপ্রীতির বীজ রোপিত হল। রাসেল তাঁর সুদীর্ঘ দার্শনিক জীবনে বহু মত ও পদ্ধতি পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু তাঁর মানবতাবাদী আদর্শ সর্বদাই সমুন্নত ছিল। তাঁর নব্বইতম জন্মদিনে উৎসাহী সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তাঁর দর্শনচর্চার মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> Three passions, simple but overwhelminghly strong, have governed my life, the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind.[১০৬]

অর্থাৎ তিনটি আবেগ আমার জীবনকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে, তা'হলো প্রেমের জন্য অপরিমেয় তৃষ্ণা, জ্ঞানের জন্য অপ্রতিরোধ্য অনুসন্ধান এবং দুর্গত মানবতার জন্য অপরিসীম মমতা। সমকালীন দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর সময়ের সমাজের করুণ অবস্থা দেখে বিচলিত হন। রাসেলের মতো কোনো কিছুকে সঠিকভাবে গ্রহণ করার জন্য ছিল তাঁর মনে হাজারো প্রশ্ন। সঠিক চিন্তা ও যুক্তিসম্মত চিন্তায় তিনি ছিলেন অটল। রাসেলের মতো আরজ আলীও যুক্তির মাধ্যমে সমাজের সংস্কার সাধন চেয়েছিলেন। মানুষ সবকিছু যুক্তির নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করলে একটি সমাজকে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বার্ট্রান্ড রাসেলের জীবনের লক্ষ্য ছিল সন্দেহাতীত সত্যে পৌছানো। নৈর্ব্যক্তিক পরম সত্য লাভ করাই ছিল তাঁর অন্যতম আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনি তাঁর *The Problems of Philosophy* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, এ জগতে এমন জ্ঞান কি আছে – যা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে না:

> Is there any knowledge in the world which is so certain that no reasonable man could doubt- it [১০৭]

রাসেলের *The Problems of Philosophy* গ্রন্থটি আরম্ভ হয়েছে কার্টেসীয় দর্শনের পদ্ধতির রীতিতে। ফরাসি দার্শনিক রেনি ডেকার্ট (১৫৯৬ খ্রি. - ১৬৫০ খ্রি.) ও রাসেলের সঙ্গে পদ্ধতিগত দিক থেকে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে ডেকার্ট যেমন সংশয়ের মাধ্যমে দার্শনিক নিশ্চয়তা খুঁজে পেয়েছিলেন, তেমনি রাসেল বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণ করতে চাননি। সংশয়মুক্ত সত্য পেতে হলে নিসংশয়ে কোনো কিছুকে গ্রহণ করা ঠিক নয়। রাসেলের বিচার-বিশ্লেষণের পদ্ধতির নাম যৌক্তিক বিশ্লেষণ। কোনো কিছুর বিশ্লেষণ ছাড়াও যৌক্তিক সংশ্লেষণেরও প্রয়োজন আছে। যৌক্তিক সংশ্লেষণের সাহায্যে জগতের সামগ্রিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই রাসেল বলেন, "Every philosophycal is a problem of analysis. The business of Philosophy as I conceived, is essentially that of Logical analysis followed by logical synthesis"[১০৮]

অর্থাৎ যদিও দর্শনের সমস্যা হল বিশ্লেষণের সমস্যা, তবুও যৌক্তিক বিশ্লেষণের সাথে যৌক্তিক সংশ্লেষণেরও প্রয়োজন আছে। কোনোকিছু বিশ্লেষণের করেই দর্শনের কাজ শেষ হয় না। যৌক্তিক

Dhaka University Institutional Repository

সংশ্লেষণের সাহায্যে জগতের সামগ্রিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এটাই ছিল রাসেলের ধারণা। আপাতত দৃষ্টিতে যাকে সহজ সরল বা অবিমিশ্র মনে হয় সংশয়ী মন নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে তাকে আর তেমন অবিমিশ্র মনে হয় না। যেমন- এক ফোঁটা দূষিত পানি খালি চোখে অবিমিশ্র দেখালেও মাইক্রোসকোপের সাহায্যে দেখলে সেখানে দেখা যায় অসংখ্য জীবাণুর উপস্থিতি, যা সম্ভব হয় যৌক্তিক বিশ্লেষণের কারণে। এ কারণেই রাসেল সংশয় পদ্ধতির প্রসংশা করেন এবং তিনি ডেকার্টের সংশয় পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন:

> By inventing the method of doubt, and by showing that subjective things are the most certain, Descartes performed a great service to philosophy.[১৪১]

অর্থাৎ সংশয়পদ্ধতি আবিষ্কার করে এবং আত্মসত্তার সুনিশ্চিত ধারণাকে স্বীকার করে ডেকার্ট দর্শনে বড় অবদান রেখেছেন। সন্দেহাতীত জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যেই রাসেল লৌকিক বিশ্বাসের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরেরও লক্ষ্য ছিল সন্দেহাতীত জ্ঞান অর্জন করা। রাসেলের মতো আরজ আলী মাতুব্বরেরও প্রশ্ন ছিল এজগতের এমন কিছু খুঁজে বের করা যা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে না। ডেকার্ট যেমন সংশয়ের মাধ্যমে দার্শনিক নিশ্চয়তা খুঁজে পেয়েছিলেন, আরজ আলী মাতুব্বরও সংশয়ের আবরণ ভেদ করে সত্য জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। আর তারই ফলে আরজ আলী যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণ করতে রাজি নন। ভৌগোলিক আবহাওয়া যেমন মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে, তেমনি যৌক্তিক আবহাওয়া মানসিক স্বাস্থ্যকে দৃঢ় করে। পৃথিবীতে মঙ্গল ও অমঙ্গলের সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন পরমমূল্য ও আদর্শ স্থাপন করা। আর তার জন্য প্রয়োজন যৌক্তিক বিশ্লেষণ, যার ফলে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সমন্বয়ে সৃষ্টি হবে বিশ্বমানবিকতা; যা সমাজের সকল মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এক ঐক্যের আদর্শ স্থাপনে সাহায্য করবে। ফলে যৌক্তিক নিয়মাবলি হবে ব্যক্তিমুক্তি ও সমষ্টি নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[১৪২]

মানুষ সব কিছু যুক্তির নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করলে একটি সমাজকে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আরজ আলী মাতুব্বরও রাসেলের মতো তাঁর দর্শনে যুক্তির নিরিখে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আলোকে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই উপলব্ধি থেকে আরজ আলী যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণ করতে চাননি।

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বরের মনের প্রশ্নের যে আকাঙ্খা তা আপনা আপনি তৈরি হয়নি, সে শক্তি এসেছিল মহাবিশ্ব ও মানুষ্য জগতকে দেখার ক্ষমতা থেকে। সামাজিক কর্তৃত্ব এবং মতাদর্শিক আধিপত্যকে অস্বীকার করার অব্যাহত লড়াই থেকে। আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়েই সামনে লাঠি হাতে দাঁড়ানো দেখেছিলেন ধর্মকেই। তিনি যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন সেগুলো আপাতত দৃষ্টিতে ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন মনে হলেও আসলে সেগুলো সমাজ ক্ষমতা কর্তৃত্ব অধিপত্তি সংস্কৃতি নিয়েই প্রশ্ন। কারণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট সমাজে ধর্মের অধিপতি অস্তিত্ব আসলে ঐ সময়ে ঐ সমাজের বিধিব্যবস্থা অনুশাসন আর প্রবল মতাদর্শিক অবস্থানের ঐ একটি সংগঠিত রূপ।[১৪৩]

রাসেলের মধ্যে সংশয় বোধ থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। রাসেল তাঁর এ সংশয়ের নাম দেন দার্শনিক সংশয়। দৈনন্দিন জীবনের নানা রকম ধারণা, যা আমরা বিনাবিচারে গ্রহণ করি, সে সম্পর্কে একটু যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণী মনোভাব পোষণ করলেই আমাদের মনে নানা রকম সংশয় জাগবে। আর সেই সকল সংশয়ের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দর্শনের জন্ম হয়েছে বলে রাসেল মনে করতেন। রাসেল তাঁর *An Outline of Philosophy* গ্রন্থের শুরুতেই দৈনন্দিন জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যার যৌক্তিক উত্তর খোঁজার বিষয়টিকে দর্শনের মূল উৎস হিসাবে চিহ্নিত করে বলেন:

> These Problems are all such as to raise doubt concerning what commonly passes for knowledge; and if the doubts are be answered, it can only be by means of a special study, to which we give the name 'Philosophy'.[১৪৪]

অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতে যাকে জ্ঞান বলে মনে হয় তার সম্পর্কে আমাদের মনে সংশয় জাগে এবং এ সংশয়ের উত্তর পাওয়া যেতে পারে কেবল এক বিশেষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে এবং তা হল দর্শন। পাঁচ বছর বয়সেই গোঁড়া চিন্তার বিরুদ্ধে রাসেলের প্রশ্ন ছিল, যখন তাকে জানানো হয়েছিল পৃথিবী গোল। এ তথ্য তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং এর সপক্ষে প্রমাণের জন্য পেমব্রোক লজের বাগানে একটি গর্ত করা শুরু করেন, যার মাধ্যমে তিনি অপরদিকের অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছতে পারেন। আবার যখন শুনলেন নিদ্রাবস্থায় ফেরেশতারা তাঁকে পাহারা দেয়, তখন তিনি সারারাত চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতেন ফেরেশতাকে এক নজরে দেখার জন্য। এ রকম অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ না পাওয়ার ফলে তাঁর মধ্যে সংশয়ের গভীরতা ক্রমেই বেড়ে যায়। ধর্মীয় কুসংস্কারপূর্ণ শিক্ষা থেকে দূরে রাখা তাঁর বাবারও কাম্য ছিল। আর সে কারণেই তাঁর বাবা তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল দু'জন নাস্তিক চিন্তাবিদের উপর। প্রচলিত ধর্মীয় ও অন্যান্য শিক্ষার প্রতি রাসেলের সংশয়ের মাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমান্ত বেড়েই চলতে থাকে।[১৪৫] সংশয়বাদী সত্যানুসন্ধানী রাসেল অযৌক্তিক কথা কোনো ক্রমেই মানতে রাজি ছিলেন না। সবকিছুর ভিতরে সঠিক সত্যটি খুঁজতেন এবং তা গ্রহণ করতেন। তিনি মুক্তিবুদ্ধি চর্চার মানুষ ছিলেন, সংশয়ের বিরুদ্ধে কথা বলার মানুষ ছিলেন।

আরজ আলী মাতুব্বরও রাসেলের মতো ছিলেন সত্যানুসন্ধানী এক ব্যক্তিত্ব। তার প্রশ্ন ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদও ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। রাসেলের মতো তিনিও সমাজের কুসংস্কারের ভূত তাড়াতে ছিলেন সোচ্চার। রাসেলের মতো তিনি অনুধাবন করেন, মানুষের মুক্তি এবং বিজ্ঞানের যুক্তি প্রতিষ্ঠার এক নম্বর বাধা দীর্ঘদিনের সঞ্চিত কুসংস্কার।[১৪৬] এভাবেই তিনি নিজের স্বকীয় প্রতিভার বলে নিজের চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আরজ আলী মাতুব্বরের মধ্যেও সংশয়বোধ থেকে সত্য সন্ধানের বোধ জাগে। সত্যের সন্ধানের প্রশ্নগুলোকে তিনি কয়েকটি প্রমাণে ভাগ করেছেন; 'আত্মা বিষয়ক', 'ঈশ্বর বিষয়ক', 'পরকাল বিষয়ক', 'ধর্ম বিষয়ক', 'প্রকৃতি বিষয়ক' এবং বিবিধ। এর মধ্যে আত্মা, ঈশ্বর ও প্রকৃতি বিষয়ক প্রস্তাব ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সৃষ্টির রহস্যের মধ্যে আছে আদিম মানুষের সৃষ্টি তত্ত্ব। ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যা – এ বিষয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের অভিমত, সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, সভ্যতার ক্রমবিকাশ, সমাজে সংস্কার ও কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ের উপর তিনি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন মূল সত্যটি খুঁজে বের করার জন্য। তিনি অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কোনো তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। যার স্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর লিখিত 'অনুমান' গ্রন্থের সাতটি অধ্যায়ে। তিনি প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন ছয়টি অধ্যায়ে যথাক্রমে 'রাবণের প্রতিভা', 'ফেরাউনের কীর্তি', 'ভগবানের মৃত্যু', 'আধুনিক দেবতত্ত্ব', 'মেরাজ', এবং শয়তানের জবানবন্দিতে। যেখানে তিনি অনেক তথ্য উপস্থাপন করে যুক্তি তর্কের মাধমে রাবণ, ফেরাউন, ভগবান, দেবতা, মেরাজ ও শয়তান সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। এভাবে দেখা যায় রাসেল যেমন খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, আরজ আলী মাতুব্বরও তেমনি হিন্দু, মুসলিম সব ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। ধর্ম থেকে কুসংস্কার দূর করে সত্যের নির্যাসটুকু বের করে আনার চেষ্টা করেছেন।

বর্ট্রান্ড রাসেলের সংশয়বাদ তাঁর চিন্তার বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে আছে। কোনো মতকেই তিনি বিনা বিচারে এবং সন্দেহ না করে মেনে নিতে পারেননি। প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর আস্থা। এ কারণেই আত্মার অমরত্ব, অলৌকিক ঘটনাবলি, প্রত্যাদেশ বা সহি স্বর্গ, নরক ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি বলেন, আমরা যতটা সম্ভব যুক্তিবাদী হওয়ার চেষ্টা করে যাব। রাসেলের ভাষায়: যদিও আমরা সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারি না, তথাপি বর্তমানের চেষ্টা আরেকটু বেশি যুক্তিবাদী হতে পারলে সম্ভবত আমাদের অবস্থা আরো ভালো হতো। নেহাত কম করে ধরলেও বলা যায়, যুক্তি (reason) আমাদের কোথায় নিয়ে যায় সেটা দেখা এক কৌতুকাবহ অভিযান হবে।[১৪৭]

রাসেলের সন্দেহবাদের মাত্রা গভীরে প্রথিত। নিশ্চিত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর জীবনভর। রাসেলের মতে সুনিশ্চিত কোনো জ্ঞানে কোনো ব্যক্তিই সন্দেহ করতে পারে না। তাঁর মতে, দর্শন ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মূলত একই। রাসেলের মতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উভয় বিদ্যাই সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জনে প্রয়াসী। উভয় বিদ্যাই একে অন্যের পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে তিনি ডেকার্টের সংশয়কে দার্শনিক পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করেন। ডেকার্ট ও রাসেল একইভাবে বিজ্ঞানের পথ অনুসরণ করে সংশয়বাদকে পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁদের মতে সংশয় পদ্ধতির মাধ্যমে সুনিশ্চিত শর্ত আবিষ্কার সম্ভব। এ প্রসঙ্গে রাসেল উল্লেখ করেন :

> Descartes (1596-1650) the founder of modern philosophy invented a method which may still be used with profit the method of systematic doubt[১৪৮]

অর্থাৎ, যা বর্তমানেও পদ্ধতিগত সংশয়ের ক্ষেত্রে ভালো অবদান রাখতে পারে, এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন দর্শনের জনক ডেকার্ট। সংশয় পদ্ধতিই প্রাগ্রসর মত প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখে। আরজ আলী মাতুব্বর বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা অসমর্থিত মতগুলোকে খণ্ডন করে প্রাগ্রসর মত প্রতিষ্ঠায় ছিলেন সদা সচেতন। তিনি কোনো ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তা ছাড়া বাহুল্যতা পছন্দ করেননি। নিজস্ব মতবিরুদ্ধে কোনো ব্যাপারে উত্তেজিত না হয়ে যুক্তি সহকারে শান্তভাবে অন্যের মত খণ্ডন করে অপরের যুক্তিপূর্ণ মত সহজে গ্রহণ করতেন। তিনি বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। রাসেলের মতে, তিনিও রহস্যময় কোনো সত্যতা স্বীকার করেননি। তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছেন, বিজ্ঞানীরাই চাঁদের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। রাসেলের মতো তিনিও যুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, অযৌক্তিক কথার কোনো মূল্য নেই। কোনো তত্ত্বমূলক বিষয়ে তো নয়ই, যুক্তিহীন বা অলৌকিক কথায়ও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। এভাবে তিনি রাসেলের সঙ্গে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানসম্মত বিচার বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন; যা মানব জীবনে অগ্রগতি ও অবক্ষয়ের ইতিহাসকে বিশ্বস্ত অনুচরের মতো অনুসরণ করবে। বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে রাসেল গণিত ও যুক্তিবিদ্যাকে একই অর্থে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন। গণিতের নিয়মগুলি যুক্তিপূর্ণ সত্যের

Dhaka University Institutional Repository

উপর নির্ভরশীল। গণিতে নির্ভুল ফল পেতে হলে যুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। গণিত যুক্তি ও বিশ্লেষণ আশ্রিত পরিপূর্ণ বিজ্ঞান। শুদ্ধ যুক্তিবিদ্যা থেকে গণিতকে পৃথক করা যায় না। অর্থাৎ রাসেল এখানে যুক্তির মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যা সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে।

আধুনিক যুগের বর্ট্রান্ড রাসেলের মতে এ বিশ্ব সম্পূর্ণ জড়ীয় নয়; আবার সম্পূর্ণ মানবিকও নয়, নিরপেক্ষ কোনো পদার্থে গঠিত। তাঁর এ মতে অতিপ্রাকৃততার কোনো স্থান নেই। বাস্তব জীবনে তিনি সমাজ সংস্কারক। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধের বিরোধিতা করে চাকরি হারান ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। মানুষের মঙ্গলের সাধক ছিলেন তিনি। ধর্ম ও যৌন সম্পর্কে বাস্তব বিশ্লেষণ করার ফলে তিনি দ্বিতীয় বার আমেরিকায় চাকরি হারান। মানুষের মঙ্গলের জন্য এহেন সৎ সাহস ও পরিশ্রম মানবতাবাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। গৌতম বুদ্ধের মতো রাসেলও মানুষের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি দুর্গতি দেখে বিচলিত হতেন এবং কিভাবে এসব দুঃখ কষ্ট হতে মুক্তি পাওয়া যায় সে ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তিনি কোনো পুরস্কারের লোভ বা তিরস্কারের ভয়কে বিশ্বাস করেননি। তাঁর মতে যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, ভয়-ভীতির উর্ধে থেকে স্বাধীন বলে দাবি করতে পারবে– তাঁর পক্ষে কোনো দেবদেবীর সাহায্য ছাড়াই এককভাবে জীবনসংগ্রামে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। ধর্ম ও প্রচলিত প্রথার অনুশাসন ব্যতিরেকে মানবিক অভিজ্ঞতায়ই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানুষের জীবনকে। রাসেলের মতে ধর্মের বাস্তবতাকে বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে।

রাসেলের মতো সমাজসংস্কারক আরজ আলীর মনেও অতিপ্রাকৃততার কোনো স্থান পায়নি। লোকভয়, শত্রুতার সম্ভাবনা, সরকারি নিষেধাজ্ঞা, তিরস্কার বা পুরস্কারের লোভ কোনো কিছুই তাঁকে সত্যের জন্য প্রতিবাদী হতে বাধা দিতে পারে নি। মানবকল্যাণের জন্য তাঁর সৎসাহস ও পরিশ্রমের কথা রাসেলের মানবতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি প্রত্যেক মানুষের মনে এমন এক স্বচ্ছ চিন্তার শক্তির বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন; যে চিন্তাশক্তি হবে সহজ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পন্ন। যার ফলে মানুষ নিজে কুসংস্কারমুক্ত হওয়ার পথ খুঁজে পাবে, বেরিয়ে আসতে পারবে অন্ধকারের বলয় থেকে। আলোকিত হবে সমাজ। অনুন্নত দেশগুলোতে উন্নত দেশের তুলনায় কুসংস্কারের মাত্রা অনেক বেশি। ফলে কুসংস্কারের কুফল আরজ আলীর মনে প্রবলভাবে আঘাত হানে। তাই তিনি সম্মুখীন হয়েছেন যুক্তি ভিত্তিক জীবনজিজ্ঞাসার; যা মানুষকে দেয় দিক–নির্দেশনার আদর্শ এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে করায়ত্ত করার অনুপ্রেরণা। এভাবে তিনি রাসেলের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর সত্যের সন্ধানী। সাধারণত মানুষও কামনা করে সত্যকে। কারণ সত্যের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত। জগতের সব ধরণের জ্ঞান যেমন দর্শন, বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য, প্রভৃতি জ্ঞানানুশীলনের বিভিন্ন বিভাগ চাইবে মিথ্যাকে বর্জন করতে। এভাবে যুগে যুগে যখনই অতীত জ্ঞানের মধ্যে ভুলভ্রান্তি দেখা দেয়, পরবর্তীতে তা সংশোধিত হয়। এক যুগের প্রতিষ্ঠিত সত্য, অন্য যুগে মিথ্যা প্রমাণিত হলে, সবাই সচেতনতার সাথে তা পরিহার করে। যেমন বিজ্ঞান, দর্শন, যা বিভিন্ন গ্রন্থের লেখক বা মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে সংশোধিত হয়। কিন্তু ধর্মগ্রন্থসমূহে যেমন তৌরিত, জব্বুর, ইঞ্জিল, কোরআন, বেদ-পুরাণ, জেন্দ-আভেস্তা ইত্যাদির যথার্থ লেখক সম্পর্কে আরজ আলী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, উল্লিখিত ধর্মগ্রন্থসমূহের সংশোধনী সম্ভব কিনা এবং কে এ দায়িত্ব পালন করবে?[১৪৯] আরজ আলীর মতে যেখানে সুনির্দিষ্ট প্রমাণের অভাব আছে এমন প্রমাণবিহীন জ্ঞান সত্যের পথকে উন্মোচিত করতে পারে না, প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায়ক হতে পারে না।

সামাজিক বাস্তবতায় বার্ট্রান্ড রাসেল ও আরজ আলী মাতুব্বরকে প্রয়োগবাদী বলে আখ্যায়িত করা যায়। কেননা, মানবকল্যাণের জন্য তাঁদের যৌক্তিক রীতি ও পদ্ধতি ছিল বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার সম্পর্কে উভয় দার্শনিক জ্ঞানানুশীলন ও সত্য আবিষ্কারের কথা বলেছেন। উভয়েই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ, অন্ধকুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম, আর অসত্য সমাজের প্রতি তাঁদের দৃপ্ত পদক্ষেপ এদেশের জনগণের মুক্ত চিন্তার বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছেন। জীবনের মান উন্নয়নে নিরন্তর সংগ্রাম, যুক্তিভিত্তিক জীবন-জিজ্ঞাসা, সংঘাত ও প্রতিকূলতা প্রভৃতি দিক তাঁদের অনেক জীবনাভিজ্ঞতাকে মহীয়ান করেছে। উভয় দার্শনিক যুক্তিবাদের জন্মদাতা নন। তবুও প্রত্যেক যুক্তিবাদী স্বীকার করবেন সমাজের চারিদিকে যেভাবে অন্যায়ের বিষবৃক্ষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাকে সমূলে বিনাশ করতে হলে এই দু'দার্শনিকের রোপিত যুক্তির অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে – বিশেষ করে বিশ্বের সকল মানুষের যুক্তি ও চৈত্তিক বিকাশের জন্য। কারণ সমাজ সংস্কারকের অমৃতবাণীর জীবনীশক্তি কখনো বিলুপ্ত হয় না। সেই সঙ্গে যুক্তি, নৈতিকতা প্রভৃতিকেও একে অপরের কাছ থেকে আলাদা করা যায় না। রাসেল যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানকে এক করে সঠিক তথ্য বা সত্যানুসন্ধান করেছিলেন আরজ আলী মাতুব্বরও তেমনি যুক্তি ও বিজ্ঞানকে সুসমন্বিত করে সত্যানুসন্ধান করেছেন।

স্বাভাবিক নিয়মেই দর্শনের ইতিহাসে কোনো এক সময় পুরাকাহিনীর কল্পলোকের মোহাচ্ছন্নতা কাটিয়ে মানুষের মনে জাগ্রত হয় মননশীল চিন্তার স্তর। মানুষের ধীশক্তি প্রখরতর হয়ে উঠে চেতনার আলোকে। বিচারমূলক চিন্তা ও নানা বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নাবলি জর্জরিত করতে থাকে মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

কৌতূহলী মনকে। এই সব প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে 'অস্তিত্ব' বিষয়ক নানা সমস্যার সমাধান দেন দার্শনিকগণ। এমন দু'জন দার্শনিক হলেন আরজ আলী মাতুব্বর ও জ্যাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫ খ্রি.-১৯৮০খ্রি.)।

অস্তিত্ববাদের মূল সুর, মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁদের অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয় না। খ্রিস্টপূর্ব যুগে দার্শনিক সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে অস্তিত্ববাদের আভাস খুঁজে পাওয়া যায়। উনিশ শতকে কিয়ার্কেগার্ড (১৮১৩ খ্রি.-১৮৬৬ খ্রি.), নীটশে (১৮৪৪ খ্রি.-১৯০০ খ্রি.), ভসতোয়ভস্কি (১৮২১ খ্রি.-১৮৮১ খ্রি.) প্রমুখ দার্শনিকগণ অস্তিত্বের স্বাধীনতা তথা মানব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে অস্তিত্ববাদী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। তবে বিশ শতকে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অস্তিত্ববাদ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, ফ্রান্সের দার্শনিক লেখক ও ঔপন্যাসিক জ্যাঁ পল সার্ত্রের দর্শনে। সার্ত্রে অস্তিত্ববাদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে :

> In any case, we can begin by saying that existentialism, in our sense of the word, is a doctrine that does render human life possible; a doctrine, also, which affirms that every truth and every action imply both an environment and a human subjectivity.[১৪০]

অর্থাৎ অস্তিত্ববাদ প্রত্যেক সত্য ও প্রত্যেক কর্মে ব্যক্তিসত্তা ও পরিবেশ উভয়কে অনুমিত করে, মানবজীবনকে যে কোনো ভাবে সম্ভব করে তোলার কথা বলে। অস্তিত্ববাদ অমূর্ত দর্শন ও সার্বিক ধারণার পরিবর্তে ব্যক্তিসত্তার উপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। অস্তিত্ববাদীদের মতে মানুষের ভাগ্যের নির্মাতা হচ্ছে মানুষ নিজেই। কারণ মানুষের ক্ষমতার কথা অস্তিত্ববাদীদের মনেই জেগেছিল। মানুষের জীবনের অর্থপূর্ণ দিক হলো তার প্রত্যক্ষ চেতনাবোধ। অমূর্ত চিন্তা এ চেতনাবোধকে দুর্বল করে দেয়। মানুষকে বাস্তব অবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে ফেলে। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সব চিন্তা ও অর্থ গড়ে ওঠে।

> Reality or being is existence that is found in the 'I' rather than it'. Thus the centre of thought and meaning is the existing individual thinker.[১৪১]

অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে বাস্তবতা বিদ্যমান। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সব চিন্তা ও চেতনা গড়ে ওঠে। অস্তিত্ববাদ নিঃসন্দেহে মানবতাবাদ। কারণ মানুষের জগতে মানুষই সব। মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো

Dhaka University Institutional Repository

বিধান কর্তা নেই। মানুষ স্বাধীন; তাই সব কিছুর মধ্যে মানুষের এই উপলব্ধি হয় যে, হতাশার মধ্যে থেকেও তাঁকে প্রচেষ্টার দ্বারা একটি নতুন সমাজ বা অবস্থা তৈরি করতে হয়। কারণ যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাই এ দর্শন কর্ম ও বাস্তবের দর্শন। অস্তিত্ববাদকে অবশ্যই আশাবাদ বা মানবতাবাদ বলা যেতে পারে।

অস্তিত্ববোধ জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, স্নেহ-মমতা ও নিয়ম-নীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। যে জীবন জীবন্ত, দায়িত্বপূর্ণ ও বর্ধিষ্ণু সে জীবন অর্থপূর্ণ। প্লেটোর নিকট ব্যক্তিমানুষের মূল্য নেই, শ্রেণী মানুষের মূল্য আছে। তবে অস্তিত্ববাদীরা জীবনমুখী দর্শনে বিশ্বাসী, অস্তিত্ববাদীর শ্রেণী মানুষের চেয়ে ব্যক্তি মানুষের অধিক মূল্য দেয়, জ্যাঁ পল সার্ত্রের ভাষায় বলা যায় :

> What man needs is to find himself again and to understand that nothing can save him from himself, not even a valid Proof of the existence of God.[১৫২]

অর্থাৎ মানুষের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তার নিজেকে নতুন করে চেনা এবং বুঝা যে, কোনো কিছুই তাকে তার নিজের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না, এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বের বৈধ প্রমাণও নয়।

অস্তিত্ববাদীরা যুক্তির আলোকেই মানুষের অস্তিত্বের কথা বলেন। আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তা-ভাবনায় যুক্তির আলোকে নিজেকে জানার এক আত্মপ্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তিনি একজন বিজ্ঞানী ও দর্শনিক অভিধায় ভূষিত হন। বার্ট্রান্ড রাসেল খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন; জ্যাঁ পল সার্ত্র ঈশ্বরের বিশ্বাসী ছিলেন না। তবুও তাঁরা নিজ দেশে অনেক সম্মান পেয়েছেন। আরজ আলীও ছিলেন যুক্তিবাদী দর্শনের একনিষ্ঠ অনুসারী। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী। বিবর্তনবাদে তাঁর ছিল পূর্ণ আস্থা। ঈশ্বর সম্পর্কে তার অভিমত হলো, বিশ্ব ঈশ্বরময়, ঈশ্বর বিশ্বময়। তাঁর বর্ণিত ঈশ্বর ও প্রকৃতি অভিন্ন, একাকার। যেখানে অলৌকিকতার কোনো স্থান নেই। তাঁর ঈশ্বর বিশ্বময় বক্তব্যের সূত্র ধরে কেউ কেউ তার মতের সঙ্গে সুফিবাদের সাযুজ্য খুঁজেছেন। তবে তিনি সুফিবাদীদের মতো আত্মা বা চেতনার আলাদা সত্ত্বায় বিশ্বাস করেননি। সেই দিক থেকে তাঁর জীবনের ব্যাখ্যায় চার্বক দর্শনের সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে। তবে তা আরও বিজ্ঞানসম্মত, হেগেলের দ্বান্দ্বিকতাবাদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রকৃত অর্থে তিনি বস্তুবাদী দর্শনের অনুসারী। ফলে বলা যায় তিনি আধুনিক চার্বাকবাদী।[১৫৩]

বহুকাল থেকে আমাদের সমাজে চলে এসেছে বাস্তববাদের চর্চা। সুদূর অতীতে আমাদের সমাজে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের মধ্যেও মূর্ত হয় বস্তুনির্ভর ধারণা, চিন্তা ও জ্ঞান। আর তখন থেকেই উদ্ভব হয় লোকায়ত বা চার্বক দর্শন। আধুনিককালে বাঙালির দর্শনে অক্ষয় কুমার দত্ত থেকে

Dhaka University Institutional Repository

আহম্মদ শরীফ পর্যন্ত অনেকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা করেছেন, আরজ আলীও তাঁদের মধ্যে একজন। তবে আরজ আলী এদের মধ্যে শিক্ষিত ছিলেন না, ছিলেন স্বশিক্ষিত। তিনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অত্যন্ত কাছে থেকে তাদের মধ্যে সঞ্চিত অন্ধবিশ্বাসগুলোকে চিহ্নিত করেছেন; প্রশ্ন তুলেছেন, যুক্তি দিয়েছেন সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায়। আরজ আলীর যুক্তি উদ্বুদ্ধ করেছে কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের। এভাবে আরজ আলীও সার্ত্রের মতো মানুষকে শিখিয়েছেন নিজেকে নতুন করে চেনার জন্য, বুঝার জন্য, অর্থাৎ সবকিছু তাঁর নিজের গণ্ডির মধ্যে। সার্ত্রের মতো আরজ আলীর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণও মানুষের হাতে। সার্ত্রের চিন্তায় ধ্বনিত হয়েছে বলিষ্ঠ কণ্ঠের বিপ্লবী সুর। সে সুর হলো অস্তিত্ববাদীর সুর, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিমর্যাদার সুর। সে সুরের ভিত্তি হলো নাস্তিকতা যা নীট্‌শের 'ঈশ্বর মৃত' সুর থেকে আরও অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও তীব্র। ঈশ্বর মৃত বললে মনে হয় ঈশ্বর কোনো এক সময় জীবিত ছিল। কিন্তু সার্ত্রের কাছে ঈশ্বর কোনো কালে জীবিত ছিল না – ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারে না বা যদি থেকেও থাকে তাতে কিছু আসে যায় না, মানুষের কাছে সে-ঈশ্বর দুর্বল, নগণ্য, নিষ্ক্রিয় ও অপ্রয়োজনীয়।[১৫৪] আরজ আলী বর্ণিত ঈশ্বর ও প্রকৃতি অভিন্ন একাকার।

সার্ত্রের মতো আরজ আলীর দর্শনেরও মূল কথা হলো, সত্তার মূল হচ্ছে মানুষ নিজে। মানুষ কোনো নিয়মের দাস নয়, নিজের ভাগ্য সে নিজে তৈরি করে। স্বাধীনভাবে মানুষ তার মধ্যে নিজ সত্তাকে উপলব্ধি করে। ব্যক্তি জড় পদার্থ নয়, সজীব ও সচেতন অস্তিত্বশীল জীব হিসেবে সে শির উন্নত করে দাঁড়াবে। এখানে সার্ত্র মনুষদেহধারী মন বা প্রাণবিশিষ্ট 'আমি' সত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরও প্রাণ ও মনের অস্তিত্ব যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ করে মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আরজ আলীর ভাষায়, প্রাণ যদিও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে, তবুও এর কার্যকলাপ দৈহিক ঘটনারূপে আমরা প্রত্যেক্ষ করছি, কার্য থাকলে তার কারণ থাকতে বাধ্য – এই স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির বলে আমরা দৈহিক ঘটনাবলির কারণ রূপে প্রাণের অস্তিত্বকে অনুমান করছি এবং বিশ্বাস করছি যে, প্রাণ আছে।[১৫৫] এভাবে আরজ আলী প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণের মাধ্যমে 'আমি' সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হলে অবশ্যই ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ থাকতে হবে। যার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ নেই তার অস্তিত্ব স্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই।[১৫৬] এভাবেও আরজ আলী 'আমি' সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন, যা মানবিক মূল্যবোধ তৈরি করে।

সার্ত্রের মতে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। নাস্তিকতাই হচ্ছে সার্ত্রের দর্শনের মূল উৎস। সার্ত্রেসবার উর্ধ্বে মূল্য দিয়েছেন মানুষকে, তাঁর ব্যক্তিত্বকে, স্বাধীনতাকে, মানবিক মর্যাদা ও মূল্যবোধকে। তিনি এমন একটি পৃথিবী বা সমাজের কথা চিন্তা করেছেন যা হবে ঈশ্বরবিহীন,অস্তিত্ববাদী ও

Dhaka University Institutional Repository

মানবতাভিত্তিক। মানুষ নিজেই সে সমাজ সৃষ্টি করবে, সেখানে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই, ভূমিকাও নেই। আমাদের চিন্তা জগতে ধর্মবিরোধী এত বড় বিপ্লবী মতবাদ আর কেউ দিতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।[১৫৭]

আরজ আলী মাতুব্বর ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মানুষের মনোজগতে প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করবার ক্ষেত্রে অস্বস্তি এবং ভয় কাজ করে। তবে আরজ আলীর বিশিষ্টতা এখানে যে, তিনি এই অন্ধকার বলয় থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আরজ আলী লিখেছেন "এলোমেলোভাবে মনে যখন যে প্রশ্ন উদয় হইতেছিল, তখন তাহা লিখিয়া রাখিতেছিলাম, পুস্তক প্রণয়ণের জন্য নহে, স্মরণার্থে। ওগুলি আমাকে ভাসাইতেছিল অকূল চিন্তা সাগরে এবং আমি ভাসিয়া যাইতেছিলাম ধর্মজগতের বাহিরে।"[১৫৮]

আরজ আলী আরো বলেন, "ধর্মীয় কাহিনী ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ব হইতে মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হইতেছিল, বেদ, বাইবেল কোরান ও দর্শন- বিজ্ঞানের সমন্বয়ে তাহার যুক্তিসম্মত সমাধানের চেষ্টা করি।"[১৫৯] এভাবে আরজ আলী জগৎ জীবন সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে পর্যবসিত হয়েছিলেন নাস্তিকবাদে। এই প্রচার শুনে এলেন দণ্ডমুণ্ডকর্তা সমাজ শাসন রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা। ৫০ বছরেরও বেশি সময় আগে (১৯৫১ সালে) ১৩৫৮ সনের ১২ জ্যৈষ্ঠ বরিশালের তৎকালীন ল-ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও তবলিগ জামাতের আমিরকে তিনি প্রশ্নের তালিকা দেন। জবাবে সন্তুষ্ট হলে তিনি জামাতভুক্ত হবেন এই প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন। কিন্তু আরজ আলীর ভাষায় সেই, "করিম সাহেব চলিয়া যাইবার পরে আমি পাইয়াছিলাম ক্ষুন্নিজনের অপরাধে আসামী হিসেবে ফৌজদারী মামলার একখানা ওয়ারেন্ট, কিন্তু আমার প্রশ্ন[১৬০] গুলির জবাব আজও পাই নাই।"[১৬১]

আরজ আলী মাতুব্বর ১৯৫১ সালের প্রশ্ন থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে নিভৃত গ্রামে একা, মৃদু কেরোসিনের বাতির আলোর যেসব বিষয় অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও সূত্রবদ্ধ করেছেন সেগুলো হল:

১. দৈনন্দিন দুর্ভোগ এবং পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা;

২. লোভ ও ভয়কেন্দ্রিক ধর্মালোচনা;

৩. জগতের উদ্ভব ও তার নিয়ম;

৪. ঈশ্বর, শয়তান, রাম, রাবণ, ফেরেশতা, দেবতা সম্পর্কিত মিথ পর্যালোচনা – ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন মানুষের মানবিক মর্যাদাবোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে। যেমন : উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে :

Dhaka University Institutional Repository

> তিনি বলেন ভাগ্যলিপি কি অপরিবর্তনীয়? ... রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষকে শিক্ষা দিতেছে – কর্ম কর, ফল পাইবে। কিন্তু ধর্ম শিক্ষা দিতেছে ইহার বিপরীত। ধর্ম বলিতেছে– কর্ম করিয়া যাও, ফল অদৃষ্টে (তকদীরে) যাহা লিখিত আছে তাহাই পাইবে। ... তাহাই যদি হয়, অর্থাৎ কর্মের দ্বারা ভাগ্যলিপি পরিবর্তিত না হয়, তবে কর্ম করিয়া লাভ কি? বিশেষত মানুষের কৃত 'কর্মের দ্বারা ফলোৎপন্ন' না হইয়া যদি ঈশ্বরের নির্ধারিত 'ফলের দ্বারা কর্মোৎপত্তি' হয়, তবে 'সৎ' বা 'অসৎ' কাজের জন্য মানুষ দায়ী হইবে কেন?[১৬২]

এভাবে সার্ত্রের মতো আরজ আলী মাতুব্বরও এ কথাই প্রমাণ করতে চান যে, মানুষ নিজেই যে সমাজ সৃষ্টি করবে, যেখানে ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা নেই। সার্ত্রের মতে অস্তিত্ববাদীদের মূল স্বীকার্য হলো : "অস্তিত্ব সারসত্তার পূর্বগামী" এই নীতি অনুযায়ী মানুষ কোনো পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য নিয়ে আসে না। সারসত্তা তার জন্মগত বৈশিষ্ট্যই নয়। মানুষ হলো অপরিহার্যভাবে 'শূন্য' (nothing) । এমন কোনো সারসত্তা নেই যা দ্বারা মানুষ চালিত হয়; বরং মানুষের কর্ম দ্বারাই মানুষের সারসত্তা নির্ণীত হয়। এজন্যই সারসত্তা অস্তিত্বের পরে আসে।[১৬৩] অস্তিত্ববাদীদের মতে মানুষের ভাগ্য নির্মাতা মানুষ নিজেই। আরজ আলী মাতুব্বরও সার্ত্রের মতো কর্মে বিশ্বাসী। তাই তিনি অকর্মা কবিতায় বলেন:

যে আশাতরু মূলে ঢাল কর্মজল
অবশ্য তাহার গাছে ফলে মিষ্ট ফল।[১৬৪]

কাজের মাধ্যমে তিনি আত্মমর্যাদা বজায় রাখার কথা বলেন। তিনি মানুষের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই সমাজে মুক্তবুদ্ধি বিজ্ঞাননস্ক ও বস্তুতান্ত্রিক চেতনা চর্চার দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। কাজেই দেখা যায় সার্ত্রের মতো আরজ আলী মাতুব্বরের মতেও মানুষের কর্মশক্তিই তার (মানুষের)। অস্তিত্ব নিরূপণের কথা বলে দেয়, – এখানে বলা যেতে পারে কর্মই মানুষের অস্তিত্ব নিরূপণ করে।

সার্ত্রেযেমন মানতে রাজি নন যে, মানুষ বাইরের কোনো শক্তির উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ মানুষ কখনও একটি উৎপাদিত সামগ্রী নয়, পরিবেশগত কারণেই মানুষ নিজেকে নিজের তৈরি করে নেয়। আরজ আলীও তেমনি যুক্তি দ্বারা প্রমাণের মাধ্যমে বাইরের কোনো শক্তিকে স্বীকার করতে রাজি নন। আরজ আলীর ভাষায় মানুষের, "যাবতীয় অসৎকাজের উদ্যোক্তা মানুষের অভ্যন্তরীণ রিপুসমূহ, বাহিরের কিছু নয়"।[১৬৫] ভাগ্য গড়বার জন্য, ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য বিভিন্ন ধর্মে নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আরজ আলী বিশ্বের নানা দেশের উদাহরণ দিয়ে দেখান যে, সম্পদ বা সামর্থ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে ধর্মীয় বিধানের কোনো সম্পর্ক নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সার্ত্রের মতে অস্তিত্ববাদ এমন এক মতবাদ যা মানবজীবনের অগ্রযাত্রাকে সম্ভব করে তোলে। সার্ত্রে অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারার সঙ্গে মানবতাবাদের মিল দেখিয়েছেন। তাই তিনি অস্তিত্ববাদী দর্শনকে মানবতাবাদী বলে চিহ্নিত করেন। কারণ তাঁর দর্শন ব্যক্তিমানুষ ও সমাজের মানুষের কল্যাণের কথাই বলে। ব্যক্তিমানুষ যখন কোনো কিছু নির্বাচন করেন, তখন সে সমগ্র মানবজাতির জন্যই করেন। যা সকলের জন্য মঙ্গলজনক ব্যক্তি তাই পছন্দ করেন। তাঁর মতে সব যুগের পক্ষ থেকে ভালো কাজের জন্য ব্যক্তি চিন্তা করেন। বিষয়টি তিনি মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তি নিজেকে গড়ার স্বার্থেই মানবজাতিকে গড়ার প্রয়াস পান। তাঁর বক্তব্য উল্লেখ্য :

> I am thus responsible for myself and for all men, and I am creating a certain image of man as I would have him to be. In fashioning myself I fashion man.[১৬৬]

অর্থাৎ আমি আমার নিজের প্রতি এবং সকলের প্রতি দায়বদ্ধ এবং আমি একটি বিশেষ মানবসত্তার প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করে যাচ্ছি, যা আমার নিজেকে ও অন্যকে আলোকিত করবে। সার্ত্রের মতে মানুষ ব্যতীত আর কোনো বিধানকর্তা নেই। তিনি নামের চেয়ে কর্মের মূল্যের গুরুত্ব আরোপ করেন, যে-কারণে ১৫৯৪ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হলে তা প্রত্যাখ্যান করেন। সার্ত্র উপলব্ধি করেন, বিশ্বযুদ্ধ হতাশা ও নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। তিনি মানুষের গুরুতর ও মহান দায়িত্ব সম্পর্কে মানবজাতিকে বিশেষভাবে সচেতন করতে চেয়েছে। তিনি মানুষকে দুর্দশাপীড়িত অবস্থা থেকে মুক্ত করে একটি সুন্দর অবস্থা স্থাপনের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মানুষকে নিয়েই তাঁর চিন্তা ও লেখনী নিবেদিত। কারণ এ জগতে 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নহে, নহে কিছু মহীয়ান'। তাই তাঁর দর্শন মানবতাবাদ।

আরজ আলী মাতুব্বরও মানবজাতিকে অখণ্ড সত্যের অংশস্বরূপ মনে করেন। দেশকালের উর্ধ্বে সত্যবোধ, ন্যায়-নিষ্ঠা, উদারদৃষ্টি ও অনন্ত সত্যের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর লেখনীতে। তাঁর সময়কার অভাবগ্রস্ত, শিক্ষাহীন, দুর্দশাগ্রস্ত জাতির অবস্থা দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের পথে দ্বেষ, হিংসা, পীড়ন, শোষণ ইত্যাদি অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন চরমভাবে সোচ্চার। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এ সমস্ত কিছুর পিছনে দায়ী ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস। মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে ঘৃণিত সেখানেই তিনি ছিলেন প্রতিবাদমুখর। তাঁর মতে, হিন্দুধর্মে লক্ষ্মীদেবী সম্পদ বিতরণের মালিক হওয়ার কারণে কেষ্টসাধু (আরজ আলীর প্রতিবেশী) পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত কলা গাছকে লক্ষ্মী সাজিয়ে পূজা করে ধনী হতে পারেনি। অথচ আমেরিকার ফোর্ড সাহেব (Henry Ford)

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্মী পূজা না করেও সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি ছিলেন।[১৬৭] তিনি সমাজের এ অবস্থা দেখে হতাশ হন।

পৃথিবীতে কোনো মানুষই প্রতিবাদী বা বাস্তববাদী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে তাঁরা জীবনমুখী হয়। এমনি ভাবে ভিন্নধর্মী দুটি সামাজিক আঘাত আরজ আলী ও সার্ত্রের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। যার ফলে জীবনমুখী দার্শনিক জ্যাঁ-পল সার্ত্রের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফরাসীদের জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণেই সম্ভবত তিনি ভাববিলাসী না হয়ে জীবন ভিত্তিক দার্শনিক হয়েছেন। হতাশা ও ব্যর্থতায় পুষ্ট মানবজীবনের এক করুণ চিত্র তাকে দারুণভাবে নাড়া দেয়, যা তাঁর দর্শনে স্থান পেয়েছে। এরই ফলে প্রথম জীবনের গল্প, নাটক, উপন্যাস ও কবিতার রূপকার সার্ত্রে বিশ শতকের মধ্যভাগে অস্তিত্ববাদের অন্যতম নেতা হিসাবে পরিচিত হন। তাঁর মতে কোনো সহজাত গুণ নয় চলমান অস্তিত্বই ব্যক্তিত্বের প্রতীক। বেঁচে থাকার তাগিদে ব্যক্তিকে তাঁর পরিবেশ তৈরি করে নিতে হয়, মানুষের সারাজীবন ধরে চলতে থাকে এ আত্মগঠন প্রক্রিয়া। সমাজে চলার পথে যে আদর্শকে অনুসরণ করতে হয়, তা হল স্বাধীনতা অর্থাৎ ব্যক্তিসত্ত্বার অপর নাম স্বাধীনতা। বিশৃঙ্খল ও প্রতিকূল জগতের ব্যক্তির অস্তিত্বের মৌল চাহিদাকে সার্ত্রে ভাববাদের সাথে বেঁধে রাখতে চাননি।

অপরদিকে ধার্মিক মাতার ছেলে আরজ আলী মাতুব্বর ও প্রাণপ্রিয় মৃত মায়ের স্মৃতি আগলে রাখার জন্য একখানা ছবি তুলতে গিয়ে সমাজের কাছে যে অমানবিক আচরণের শিকার হয়েছিলেন, সে দুঃখ এবং বিষাদময় ঘটনাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে যুক্তিবাদী হতে, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে। মায়ের অবমাননা তাকে ভীষণভাবে আঘাত করে। এ ব্যাপারে তিনি কোনোমতেই নিজের সঙ্গে আপোস করতে পারেন নি। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন: "মা! আজীবন ছিলে তুমি ধর্মের একনিষ্ঠ সাধিকা। আজ সেই ধর্মের নামেই হলে তুমি শেয়াল-কুকুরের ভক্ষ্য। সমাজে বিরাজ করছে এখন ধর্মের নামে অসংখ্য অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো আমার জীবনের ব্রত হয় যেন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণ অভিযান। আর সে অভিযান সার্থক করে আমি যেন তোমার কাছে আসতে পারি।"[১৬৮]

মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তিনি ধর্মীয় বিধানের প্রবল দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হন। তাঁর মনে এতদিনের লালিত বিশ্বাস, ধারণা ক্ষতবিক্ষত হলো প্রবল আঘাতে। তাঁর মনে দানা বাঁধল একটি প্রত্যয় সত্য বা যুক্তির। এখানেই ঘটে তাঁর সত্যের (যুক্তির) সন্ধানের হাতেখড়ি। ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতাকে প্রমাণ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত করা। সার্ত্রের মতো তাঁরও লক্ষ্য ছিল মানুষকে তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

সার্ত্রে মানুষের মধ্যে এক অসহায় অবস্থায় চিত্র এঁকেছেন। সে অবস্থা হল মানুষের অপূর্ণতা, অর্থাৎ মানুষের স্বভাবে স্থিতির অভাব। বস্তুর স্থিতি আছে; একটি বস্তু শুধুই বস্তু তার বেশিও নয় কমও নয়। কিন্তু একজন মানুষ বর্তমানে যা, ভবিষ্যতে তাঁর মধ্যে তা না হওয়ার সম্ভাবনা সর্বদা বিরাজমান। মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণতা লাভ অসম্ভব ও অবাস্তব। তাই সার্ত্রের মতে মানুষ হলো 'অর্থহীন ভাবাবেগ।'

এখানে আরজ আলী সার্ত্রের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন–"বিজ্ঞান মতে পদার্থের ধ্বংস নাই, আছে শুধু পরিবর্তন। দেখা যায়, তদ্রূপ মানবমনের বিশ্বাসেরও লয় নাই, আছে শুধু পরিবর্তন।"[১৬৯] তাই বিশ্বাসযোগ্য 'বস্তু' বা 'বিষয়'- এর পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। এবং যে বিষয়ে মানুষের জ্ঞান জন্মেছে সেখানেই বিশ্বাস (ঈমান) হচ্ছে। এখানেই মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। তবে যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ নেই, সে বিষয়ে কার্যকরণ সম্পর্কের ঘাটতি রয়েছে যা বিবেকবিরোধী। বর্তমানে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সে ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করতে অপরাগ হবেন। তিনি মনে করেন সার্ত্রের মতো মানুষ 'অর্থহীন ভাবাবেগ' নয়। কারণ মানুষের মধ্যের জ্ঞান ও বিশ্বাসে এর ধ্বংস নেই। তাই দেখা যাচ্ছে, একদিকে আরজ আলী প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞাননন্দ দার্শনিক, আর অপরদিকে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ মানবতাবাদী। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণই ছিল তাঁর কাম্য। সার্ত্রে যেমন বলেছিলেন, "What we choose is always the better and nothing can be better for us unless it is better for all"[১৭০] অর্থাৎ কোনো জিনিসই ভালো নয়, যদি না তা সবারই জন্য ভালো। এ ব্যাপারে আরজ আলীও ছিলেন সার্ত্রের মতো একই সূত্রে গাঁথা।

অতএব বলা যায়, আরজ আলী মাতুব্বর আস্তিক্যবাদের ঈশ্বর বা সৃষ্টির ধারণাকে প্রধান হিসাবে মনে- প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। আস্তিক্যবাদের মতে, এক দিকে মানুষ হলো ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, অন্যদিকে আবার অতিজাগতিক বা ঐশ্বরিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। এ হিসাবে স্রষ্টার করুণা, দয়া বা সাহায্য ছাড়া মানুষের পক্ষে কিছুই সম্ভব নয়। এখানে মানুষের মর্যাদা বা স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। এমনকি মানুষ বা জীবের প্রতি ঈশ্বর যে দয়া বা ভালোবাসা দেখিয়ে থাকেন তাও তাঁর (ঈশ্বরের) নিজের সন্তুষ্টির জন্যই করে থাকেন।

তাই আরজ আলী মাতুব্বরের মুক্ত মন আস্তিক্যবাদের এ কথা মানতে রাজি নয়। কারণ তাঁর মতে, বোবা লোকেরও কল্পনাশক্তি আছে, মুখে কিছু বলতে না পারলেও সে বিশ্বের ঘটনাবলি, সম্পর্কে চিন্তা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বোবার সেই ভাবসমূহের অভিব্যক্তি ঘটে তাঁহার কার্যাবলির মধ্য দিয়ে। এখানে ব্যক্তিমানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ এই নয় যে, সে সমাজ থেকে আলাদা। আসলে সমাজ একটি মূর্ত ধারণা, যা ব্যক্তি ছাড়া অকল্পনীয়। তাই সমাজ চেতনা বা সমাজের অগ্রগতি বলতে

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিমানুষের চেতনা বা অগ্রগতিকেই বুঝায়। সার্ত্রে মানুষের শুধু কর্মসম্পাদন বা নির্বাচনের স্বাধীনতার কথাই বলেননি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতার কথা বলেছেন। এখানে আরজ আলী ও তাঁর সাথে সুর মিলিয়ে বলেছেন ধর্মজগতে মানুষের স্বাধীনতা নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "তাই বাঁধ ভাঙ্গা জলস্রোতের ন্যায় সময় মানুষের কল্পনা ধর্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিধি-নিষেধের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যায়।"[১৭১] এভাবে মানুষের অন্তরে স্বাধীনতার বীজ সঞ্জীবিত হয়। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের লক্ষ্য ছিল মানুষকে তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করা। ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতাকে প্রমাণ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। সার্ত্রের মতো আরজ আলীও চেয়েছেন মানুষের মনে যে স্বাধীনতার বীজ লুক্কায়িত আছে, মানুষ তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হোক।

আরজ আলী মাতুব্বরের আমাদের দেশের চাষী, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের করুণ অবস্থায় ব্যথিত হয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যে সমাজ চেতনা বা সমাজের অগ্রগতি বলতে কোনো জ্ঞান নেই। সমাজে বসবাসকারী সদস্য বা ব্যক্তিমানুষের চেতনা বা অগ্রগতিই যে সমাজ চেতনা বা সমাজের অগ্রগতির মধ্যে অন্তর্নিহিত – এ বোধ সাধারণ লোকের মধ্যে নেই। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী চিন্তার যে প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানুষকে তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করা, যা সাধারণ লোকের নেই। আরজ আলী মাতুব্বরেরও উদ্দেশ্য ছিল সমাজের মানুষকে তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করা। যার ফলে ক্ষেতে ফসল অজন্মা হলে, পুকুর নদীতে মাছ না পড়লে, কলেরা-বসন্ত, বন্যা-বাদল, অনাবৃষ্টি হলে সমাজে অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষের ঈমান অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাবকেই দায়ী করা হয়। এ ধরনের করুণ অবস্থাকে শোষিত ও বঞ্চিত জনগণ "আল্লাহ্‌র বিধান" বলেই সহজে মেনে নেয়।

এখানে মানুষের নিজস্ব স্বাধীনতা বা মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। মানুষকে নির্ভর করতে হচ্ছে স্রষ্টার করুণার উপর যা আরজ আলী গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেন। তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে, আমাদের এই সোনার বাংলায় চাষীরা দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে বিঘাপ্রতি বার্ষিক যে পরিমাণ ধান জন্মাচ্ছে, তাঁর চেয়ে প্রায় সাত-আট গুণ ধান জাপানের চাষীরা উৎপাদন করছে। "জাপানের এই চাষীরা অ-মুসলমান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, কাফের, যাহাদের ধর্মে ঈশ্বরের নামগন্ধও নাই। আমাদের মতে উহারা বে-ঈমান বা অ-বিশ্বাসী।"[১৭২] আবার, "রাশিয়ানরা অধিকাংশই সাম্যবাদী (Socialist)। তাঁহারা দেব-দেবী বা আল্লাহ-নবীর ধার ধারেন না। তবুও যাবতীয় কাজে তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালি প্রয়োগ করিয়াই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিতেছেন।"[১৭৩] উল্লেখ্য, ফসল উৎপাদনের বিষয়টি কোনো মতেই ঈমানের ব্যাপার নয় বরং চাষাবাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপার। এ প্রমাণিত সত্যটি ধর্মভীরু মানুষের মন থেকে আড়াল হয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে মনুষ্যত্বনামী দানবীয় শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য তিনি মন গঠনে ছিলেন সোচ্চার। মানবতা মানে ঈশ্বর প্রেম বা অতিমানব বা দেবতার প্রেম নয়। মানবতা মানে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা। অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণের মাধ্যমে শান্তির অপরাজেয় পূজারী আরজ আলী ছিলেন সাধারণ কৃষক। মানব জাতির শোষণনীতি, বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর দর্শনে ফুটে উঠেছে। নিপীড়িত জনতা বিশেষ করে অন্ধবিশ্বাসে নিপীড়িত জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়:

মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে',
"এবার ফিরাও মোরে",রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হয়ত কবিগুরুর এ বাণী আরজ আলী মাতুব্বরের উপলব্ধি করেই প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন, ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন সব কুসংস্কার,সংস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সমাজ গড়ার।

আরজ আলী মাতুব্বর ও সার্ত্রের চিন্তা-চেতনার বেশ কিছু সাদৃশ্য বর্তমান। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে উভয়ই প্রতিবাদী, প্রত্যয়ী এবং দৃঢ়চেতা। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো তাঁদের সহজাত গুণ। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে উভয়ই সোচ্চার, উভয়ের দর্শনই দায়িত্বশীলতার এবং মানবতার দর্শন। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় আরজ আলী মাতুব্বর ও সার্ত্র একই সৌরজগতের দুটো উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং তাঁরা হবেন অনাগত ভবিষ্যতের জন্য অনুকরণীয়।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে মানবতাবাদী ব্যক্তিত্বের সাথে আরজ আলী মাতুব্বরের তুলনা করতে গেলে গ্রিস দেশের দার্শনিক ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গই প্রথম আসে। উপসংহারে বলা যেতে পারে কোনো দার্শনিক চিন্তাই হঠাৎ আবির্ভূত হয়নি। ভৌগোলিক এবং সামাজিক পরিবেশ দ্বারা দার্শনিক চিন্তা সাধারণত নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। কোনো দেশের দার্শনিক চিন্তায় সেই দেশের মাটি ও সংস্কৃতি দুইই প্রভাব বিস্তার করে। আবার কোনো এক দার্শনিকের মতো অন্য দার্শনিকের মতের পরিণতি অথবা সমালোচনাত্মক প্রতিক্রিয়া বলে মনে হয়; প্রাচীনকাল থেকে সমকালীন দার্শনিকদের দর্শনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কালানুক্রমে দার্শনিকদের স্থাপন করে তাদের মতের সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বর যেভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার যে বিবর্তন ঘটেছে তাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর সমাজে অস্পষ্ট চেতনার বহির্প্রকাশ ঘটিয়ে মানব সমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন,আধুনিক ও সমকালীন দার্শনিকরা ছিল সভ্যতার পথপ্রদর্শক। আর আরজ আলী মাতুব্বরও সভ্যতার দিক নির্ণয় ও সময়মতো বিভিন্ন সংকট মুক্তির লক্ষ্যে ছিলেন সোচ্চার। তাঁর দর্শন আবহমানকাল এদেশেরই মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে, স্বস্তি দেবে ও পথ নির্দেশনা দেবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র :

১. বসুধা চক্রবর্তী, *মানবতাবাদ*, দীপায়ন, কলিকাতা, ১৯৬১, পৃ.২৩

২. ঐ, পৃ. ৩২

৩. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ২০০১,পৃ. ৭৩

৪. এশিয়া মইনরের পশ্চিম সীমান্তবর্তী আইওনিয়া রাজ্যের মাইলেটাস নগরে গ্রীক দর্শনের সূত্রপাত। মাইলেটাস ছিল তদানীন্তন এশিয়া মাইনরের এক বৃহৎ, সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যিক নগরী। এশিয়ার সাথে এ নগরীর বাণিজ্যিক যোগাযোগ থাকার কারণে মাইলেটাস আন্তর্জাতিক নগর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এরিস্টটলের মতে অবকাশ ও সম্পদ, এ দু'টি দার্শনিক চিন্তার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। আর মাইলেটাস এ দুটোরই অধিকারী ছিল বলে সেখানে জন্ম নিয়েছিল পাশ্চাত্যের প্রথম দর্শন, গড়ে উঠেছিল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধানের এক বিরাট ঐতিহ্য। মাইলেটাসের নাম অনুসারে আলোচ্য দার্শনিকদের মাইলেসীয় দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয়। আবার আইওনিয়া রাজ্যের নামানুসারে এদের আইওনিক দার্শনিকও বলা হয়।

৫. W.T. Stace, *A Critical History of Greek Philosophy*, Macmillan, London, 1767, পৃ.২০

৬. আমিনুল ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৮, পৃ. ২৮

৭. Frank. Thilly, *A History of Philosophy*, Central Book Depo, Allahabad, 1973, পৃ.২৩

৮. Bertrand Russell, *A History of Western Philosophy*, Gorege Allen and Union, London, 1962, পৃ. ৪৫

৯. Edward Zeller, *Outlines of the History of Greek Philosophy*, Routledge, London, 1931, পৃ. ২৮

১০. আমিনুল ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ. ৩৭

১১. ঐ পৃ. ৩৯

১২. Bertrand Russell, *A History of Western Philosophy*, পৃ.৪৭

১৩. ঐ পৃ, ৪৪

১৪. ঐ পৃ. ৭

১৫. প্রদীপ রায় (অনূদিত), *বার্ট্রান্ড রাসেল:পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ.১৮

১৬. সরদার ফজলুল করিম, 'আরজ আলী মাতুব্বর: আমাদের সক্রেটিস', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর: চিন্তা জগৎ*, নন্দিত, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১২

১৭. ঐ পৃ. ১২

১৮. আনু মুহাম্মদ, 'প্রশ্নের শক্তি: আরজ আলী মাতুব্বর', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪

১৯. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ১২

২০. আইয়ুব হোসেন, *আরজ আলী মাতুব্বর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৫৭

২১. গ্রিসের পৌরাণিক সঙ্গীতবিদ ও কবি অরফিউস সংক্রান্ত, কথিত আছে অরফিউসের সঙ্গীতে বনের পশুরা পর্যন্ত আত্মহারা হয়ে যেত।

২২. প্রদীপ কুমার রায় (অনূদিত), *বার্ট্রান্ড রাসেল:পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, পৃ. ২২-২৩

২৩. আমিনুল ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ. ৩২

২৪. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর: শতবর্ষে ফিরে দেখা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা,পৃ. ১৪৩

২৫. ঐ পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

২৬. প্রদীপ কুমার রায় (অনূদিত), *বার্ট্রান্ড রাসেল: পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস* , পৃ. ২৫

২৭. আরজ আলী মাতুব্বর, *সত্যের সন্ধান*, বাংলাদেশ লেখক শিবির, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৬

২৮. প্রদীপ কুমার রায় (অনূদিত), *বার্ট্রান্ড রাসেল: পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, পৃ. ২৮

২৯. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত). *আরজ আলী মাতুব্বর,রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ২৬

৩০. E Zeller, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৩১. F. Thilly., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৩২. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর, রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৫০

৩৩. W.T. Stace, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৩৪. আরজ আলী মাতুব্বর, *সত্যের সন্ধান*, পৃ. ৩৬

৩৫. ঐ পৃ. ৩৬

৩৬. সাইয়েদ আবদুল হাই, *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৯৬৩

৩৭. আমিনুল ইসলাম, *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১১৮

৩৮. সরদার ফজলুল করিম, *প্লেটোর সংলাপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৩

৩৯. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর,রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ২৬৭

৪০. H. Sidgwick, *Outline of the History of Ethics*, Macmillan, London, 1767, পৃ. ২৩-২৪

৪১. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর,রচনা সমগ্র-৩*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৭,পৃ. ৫২

৪২. ঐ, পৃ. ৫২-৫৩

৪৩. ঐ, পৃ. ৬৩

৪৪. আমিনুল ইসলাম, *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, পৃ. ১১৯

৪৫. Xenophon, *Memorabilia*, trans.,and annotated by Amy L. Bonnette, with an introduction by Christopher Bruell, Coronell University, Press U.S.A. 1994, Chap. Socratic.

৪৬. ফেরদৌসি বেগম, 'আরজ আলী মাতুব্বর: প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট', *Copula*, Vol. xxiv, June, Jahangirnagar University,Savar, Dhaka, 2007, পৃ. ৯

৪৭. শফিকুর রহমান,'বিদ্রোহী আরজ আলী', আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর : শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ১২০

৪৮. আইয়ুব হোসেন, 'সত্যসন্ধানী আরজ আলী মাতুব্বর', আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর : শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ১৯৬

৪৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *'আরজ আলীর সংশয় ও সংগ্রাম'*, আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর : শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ৬১

৫০. ঐ, পৃ. ৬১

৫১. E. Zeller, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৫২. প্রমথ চৌধুরী, 'প্রাণের কথা', *প্রবন্ধ-সংগ্রহ*, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৪৮৯-৪৯০

৫৩. আমিনুল ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ. ১৪১-১৪২

৫৪. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর, রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. ১৪.৩.৮১ তারিখের 'মানব কল্যাণে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত' এই শিরোনামে 'ইত্তেফাক' পত্রিকার সংবাদ ছাপা হয়।

৫৬. আমিনুল ইসলাম, *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, পৃ. ১২৩

৫৭. আনু মুহাম্মদ, 'প্রশ্নের শক্তি: আরজ আলী মাতুব্বর', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৫৮. সৈয়দ মকসুদ আলী (অনূদিত), *প্লেটোর রিপাবলিক*, বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৩, মযাহারুল ইসলাম-এর 'প্রসঙ্গ কথা' দ্রষ্টব্য

৫৯. কাজী নুরুল ইসলাম, 'আরজ আলী মাতুব্বর: জীবন দর্শন', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ- ১২৬-১২৭

৬০. মোঃ মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১২৬

৬১. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর, রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৩৮

৬২. ছন্দা চট্টোপাধ্যায় (অনূদিত) ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *দর্শন-দিগ্‌দর্শন*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১১২

৬৩. কাজী নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

৬৪. এরিস্টটলের সময় বই বলতে পাণ্ডুলিপিকেই বোঝাতো।

৬৫. Bertrand Russell. *History of Western Philosophy*, পৃ.১৭৪

৬৬. এরূপ বই অনেক আছে, যা দু-একবার পড়ে তৃপ্তি মেটে না, বারবার পড়তে ইচ্ছে হয়। হাতের কাছে বই থাকলে সে ইচ্ছা পূরণ সম্ভব হয়। ... গ্রন্থশালা একটি সিন্দুকবিশেষ। কোন ধনী তার যাবতীয় অর্থ পকেটে রাখে না, রাখে সিন্দুকে এবং যথাসময়ে তা ব্যবহার করে সিন্দুক হতে। গ্রন্থ সংগ্রহশালা এরূপ একটি জ্ঞানের সিন্দুক। বইয়ের অভাবে তার জ্ঞান সাধনা ব্যাহত হয়েছে। তাঁকে এক একদিন চৌদ্দ মাইল হাঁটতে হয়েছে বরিশালের পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবহারের জন্য এবং ষোলো মাইল হাঁটতে হয়েছে বি.এম কলেজের লাইব্রেরির জন্য। তাই পারিবারিক অভাব দূর করার আগেই মাত্র ২৫ বছর বয়সে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময়ে এর গুরুত্ব ছিল কতখানি তা সহজেই অনুমেয়।' উদ্ধৃতি, কাজী নুরুল ইসলাম, 'আরজ আলী মাতুব্বর : জীবন ও দর্শন', *মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), আরজ আলী মাতুব্বর: চিন্তা জগৎ*, পৃ.১৩৬

৬৭. বদরুদ্দীন উমর, 'মুক্ত মানুষ আরজ আলী মাতুব্বর'; আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর: শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ৩৫

৬৮. আমিনুল ইসলাম, *নীতিবিজ্ঞান ও মানব জীবন*, পৃ. ৮১-৮২

৬৯. ঐ পৃ. ৮২

৭০. খ্রিস্টপূর্ব ৩০৮ অব্দে গ্রীক দার্শনিক জেনো (Zeno) (খ্রি. পূ. ৩৪০-২৬৫) এথেন্সে স্টোয়িক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়ের মতে মানুষের জন্য একমাত্র সদ্‌গুণই হল মঙ্গল। সক্রেটিসের মতো এই সম্প্রদায় জ্ঞানকেই সকল মঙ্গল, সদগুণ ও সুখের উৎস মনে করত। এই দৃষ্টিভঙ্গির বশবর্তী হয়ে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা নিজদিগকে জাগতিক সুখ-দুঃখ ও তুচ্ছতা থেকে ঊর্ধ্বে রাখত। এই জন্য এই সম্প্রদায়কে কৃচ্ছ্রসাধন সম্প্রদায় বা বিষয় বৈরাগ্য সম্প্রদায় বলা হয়ে থাকে।

৭১. আমিনুল ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ. ২৪৫

৭২. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর, রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৩৮

৭৩. আমিনুল ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ. ২৮০

৭৪. ঐ, পৃ. ৩০১

৭৫. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর, রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৫২

৭৬. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৭৪

৭৭. ঐ পৃ. ৭৩

৭৮. ফেরদৌসী বেগম: 'যুক্তিবাদী আরজ আলী মাতুব্বর', ফেরদৌসি বেগম (সম্পাদিত), *জীবন দর্শন*, ১মবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ. ৮০

৮০. টমাস হবস (১৫৮৮ খ্রি. ১৬৭৯ খ্রি.) সমাজ ও রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রশ্নে রাজার ঐশ্বরিক অধিকারের তত্ত্বকে নাকচ করে সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব সমর্থন করেন। তাঁর মতে মানুষের সাম্মলিত চুক্তির ভিত্তিতে সমাজ তৈরি হয়েছে এবং রাজা ও চুক্তির ভিত্তিতে রাজ্য শাসন করেন। রাজার হাতে চুক্তি ভিত্তিতে অধিকার সমর্পণ করার পর নাগরিকদের রাজাকে অমান্য করার কোনো যুক্তি থাকে না।

৮১. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ. ৯০

৮২. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর, রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ২৮৩

৮৩. ছন্দা চট্টোপাধ্যায় (অনূদিত) ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *দর্শন-দিগদর্শন*, পৃ.১৫৪

৮৪. Bertrand Russell, *The Problems of Philosophy*, Oxford University *Press. New York. 1980.* পৃ. ১৮

৮৫. ঐ পৃ-১

৮৬. আরজ আলী মাতুব্বর, *সত্যের সন্ধান*, পৃ. ৪০

৮৭. ঐ, পৃ. ৪০-৪১

৮৮. ঐ পৃ. ৪১

৮৯. বসুধা চক্রবর্তী, *মানবতাবাদ*, দীপায়ন,কলিকাতা, ১৯৬৭, পৃ-৪৬

৯০. মোঃ মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬

৯১. আমিনুল ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ. ৯২

৯২. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২০

৯৩. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ. ১২৪

৯৪. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৫১

৯৫. ১৬৮৮ সালের নভেম্বর মাসে উইলিয়াম ডেভনশায়ারের টোবে নামক স্থানে সসৈন্যে উপস্থিত হলে দ্বিতীয় জেমস ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে পালিয়ে যান, এভাবে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হয়। এই বিপ্লব গৌরবময় বিপ্লব বা রক্তপাতহীন বিপ্লব নামে পরিচিত। এই বিপ্লবের ফলে ঈশ্বর প্রদত্ত রাজশক্তির মতবাদের বিলুপ্তি এবং পার্লামেন্টই সার্বভৌম শক্তির অধিকারীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়।

৯৬. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ. ১৮৭

৯৭. আমিনুল ইসলাম, *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, পৃ. ১৮৭

৯৮. A. Flew, *Hume's Philosophy of Belief*, Routledge and Kegan Paul, London.1961, পৃ. ১৭৩

৯৯. সম্পাদকের কথা, মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর: চিন্তা জগৎ*

১০০. বদরুদ্দীন উমর, 'মুক্ত মানুষ আরজ আলী মাতুব্বর' মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর: চিন্তা জগত*, পৃ. ২৮

১০১. ইন্দ্রিয়ছাপ সম্পর্কে হিউম বলেন: 'যে সব প্রত্যক্ষণ তীব্রণ তীব্র এবং প্রচণ্ড তাদের নাম দেখা যায় ইন্দ্রিয়ছাপ। মনে আগত প্রথম সংবেদন অতিরাগ বা গভীর অনুভূতি ও প্রচণ্ড আবেগকে এ পর্যায়ে ফেলা যায়।"

ধারণা সম্পর্কে হিউম বলেন': ধারণা বলতে আমি চিন্তা ও ন্যায় ক্রিয়ায় বা যুক্তিতে ইন্দ্রিয়ছাপের ক্ষীণ প্রতিবিম্বগুলিকে বুঝি। যেমনএ আলোচনা হতে উদ্ভূত প্রত্যক্ষণগুলো হচ্ছে ধারণা।

১০২. David Hume, *A Treatise of Human Nature*, Penguin Books, England, 1985. পৃ ৪৯

১০৩. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ১৬৪

১০৪. David Hume, *A Treatise of Human Nature*, পৃ. ২৯৯

Dhaka University Institutional Repository

১০৫. ঐ পৃ. ৩০০

১০৬. আরজ আলী মাতুব্বর, *সত্যের সন্ধান*, পৃ. ৪০

১০৭. David Hume, *An Enquiry Concerning Human Understanding*, Collar Book, New York, 1962, Preface

১০৮. নীরদবরণ চক্রবর্তী, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, লক, বার্কলি, হিউম*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ১০৩

১০৯. ঐ, পৃ. ১০৪

১১০. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ২৭৮

১১১. ঐ পৃ. ২৮২

১১২. আমিনুল ইসলাম, *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, পৃ. ১৮৮

১১৩. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৫৭

১১৪. আমিনুল ইসলাম, *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, পৃ. ২৪০

১১৫. সেলিনা হোসেন, 'সময়ের অগ্রগামি মানুষ' মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩

১১৬. হিমাংশু ঘোষ অনূদিত , টম বটোমোর, *মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব*, বাগচী এণ্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. *xvii - xviii*

১১৭. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ২৮৩

১১৮. হিমাংশু ঘোষ অনূদিত , প্রাগুক্ত, পৃ. *xvii*

১১৯. আনু মুহাম্মদ, 'প্রশ্নের শক্তি : আরজ আলী মাতুব্বর', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

১২০. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-১*, পৃ.২১৪

১২১. ঐ, পৃ. ২১২

১২২. হিমাংশু ঘোষ অনূদিত , প্রাগুক্ত, পৃ. *xiv*

১২৩. ঐ, পৃ. *xv*

১২৪. আলী নূর, 'স্বশিক্ষিত কিন্তু সুশিক্ষিত', আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর : শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ১৪০

১২৫. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-১*, পৃ. ২৫৩

১২৬. ঐ পৃ. ৫৪

১২৭. ঐ, পৃ. ৫৩

১২৮. ঐ, পৃ. ৫৪

১২৯. ঐ, পৃ. ৫৪

১৩০. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-২*, পৃ. ২০

১৩১. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-১*, পৃ. ১৬৪

১৩২. কাজী নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

১৩৩. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-১*, পৃ. ৫৪-৫৫

১৩৪. সম্পাদকের কথা, মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত,

১৩৫. আমজাদ হোসেন, মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), ঐ, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

১৩৬. ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অনূদিত), *মরিস্ কর্ণফোর্থ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১০৪

১৩৭. আমিনুল ইসলাম, *সমকালীন প্রাচ্যত্য দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৯৩

১৩৮. B. Russell, *The Autobiography of Bertrand Russell*, Allen & Unwin, London, 1967, preface

১৩৯. B. Russell, *The Problems of Philosophy*, পৃ. ১

১৪০. B. Russell, *Logic and Knowledge*, Unwin Hyman, London, 1988, পৃ. ৩৪১

১৪১. B. Russell, *The Problems of Philosophy*, পৃ. ৮

১৪২. ফেরদৌসি বেগম, (সম্পাদিত), *জীবন দর্শন*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৭৯

১৪৩. আনু মুহাম্মদ, প্রশ্নের শক্তি : 'আরজ আলী মাতুব্বর', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

১৪৪. B. Russell, *An outline of Philosophy*, Routledge, London, 1993, পৃ. ২

১৪৫. B. Russell, *Passionate Sceptic*, Allen,London, 1957, পৃ. ১৭-১৮

১৪৬. বদরুদ্দীন উমর, 'মুক্তমানুষ আরজ আলী মাতুব্বর', আইয়ুব হোসেন সম্পাদিত: *আরজ আলী মাতুব্বর: শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ৩৩

১৪৭. আব্দুল মতীন (অনূদিত), *বার্ট্রান্ড রাসেল, দর্শনের রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৮

১৪৮. B. Russell, *The Problems of Philosophy*, পৃ. ৭

১৪৯. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-১*, পৃ. ৫২-৫৩

১৫০. J.P Sartre, *Existentialism and Humanilism*, trans by Phlip Mairet. Methuen & Co. Ltd. London, 1970, পৃ. ২৪

১৫১. H. Titus, *Living issues in Philosophy*, Van Nostrand Reinhold Company, New York. 1970, পৃ. ২৯৭-২৯৮

১৫২. J.P Sartre, *Existentialism and Humanilism*, পৃ. ৫৬

১৫৩. আবু সাইয়িদ খান, 'আরজ আলী মাতুব্বর: প্রতীকী চরিত্র', মোহাম্মদ আলী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

১৫৪. নীরুকুমার চাকমা, *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা*, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৮৩,পৃ. ৮০

১৫৫. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৫৪

১৫৬. ঐ, পৃ. ৫৪

১৫৭. নীরুকুমার চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

১৫৮. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৪৭

১৫৯. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২৬১

১৬০. আরজ আলী মাতুব্বর বলেন, ধর্ম জগতে যে সব নীতি, প্রথা, সংস্কার, ঘটনার বিবরণ আছে তা সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য নয় এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গেও সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান ইত্যাদি মতবাদের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর মনে প্রশ্নের উদয় হয়।

১৬১. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৪৭

১৬২. ঐ, পৃ.৭৮

Dhaka University Institutional Repository

১৬৩. J.P Sartre, *Being and Nothingness*, trans by Hazel. E. Barnes, Philosophical Library, New York, 1965, পৃ. ৪৬৮

১৬৪. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২৪৩

১৬৫. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১, পৃ. ৮২

১৬৬. J.P Sartre, *Existentialism and Humanilism*, পৃ.৩০

১৬৭. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৯৯

১৬৮. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২, পৃ. ৩০৭

১৬৯. আইয়ুব হোসেন সম্পাদিত, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৫৭

১৭০. J.P Sartre, *Existentialism and Humanilism*, পৃ. ২৯

১৭১. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৫৩

১৭২. ঐ পৃ. ৫৫

১৭৩. ঐ পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরজ আলী মাতুব্বর ও সমকালীন বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর ও সমকালীন বাংলাদেশ

বাঙালি আবেগপ্রবণ ও কল্পনাবিলাসী হলেও যুক্তিবাদী ও জীবনবাদী। আবেগের সাথে বিবেক, বিশ্বাসের সাথে যুক্তির অপূর্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে আদর্শ ও জীবন দর্শনের সার্থক রূপকার হতে পেরেছিলেন বাংলাদেশে সমকালীন দার্শনিকরা। তাঁদের চিন্তাধারায় ছিল মানুষ ও সমাজের স্বরূপ সন্ধান। তাই বাঙালি দার্শনিকরা তথ্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব ও জীবনমুখী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা কোনো কিছুকেই যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ না করে গ্রহণ করেননি। মানবকেন্দ্রিক ভাবাদর্শের প্রভাবেই বাঙালি পায়, মানুষ ও সমাজকে নতুন করে দেখার, নতুন করে ভাবার – নতুন দিশারি।

সমকালীন বাঙালি দার্শনিকগণও মানুষেরই জীবনসম্পৃক্ত মানব কল্যাণের কথা বলেন। তাঁদের দর্শন, চিন্তা ও মনন সাধনার বিকাশ ধারায় এ সত্যের অনিবার্য উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে বেগম রোকেয়া (১৮৮০ খ্রি.-১৯৩২ খ্রি.), মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭খ্রি. - ১৯৫৪ খ্রি.) ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ খ্রি.-১৯৭৬ খ্রি.) প্রমুখ সমকালীন দার্শনিকদের মানবতাবাদী দর্শনের সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের মানতাবাদী দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার উপর আলোকপাত করাই হলো মূল উদ্দেশ্য। বেগম রোকেয়া, মানবেন্দ্র নাথ রায়, কাজী নজরুল ইসলাম প্রত্যেকেই জীবনমুখী ও জনসাধারণের কল্যাণার্থে কথা বলেছেন। আলোচনার উদ্দেশ্য এক হলেও বিষয়বস্তুর গুরুত্বের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন ত্রিধাবিভক্ত। বেগম রোকেয়া জীবনমুখী আলোচনা করেছেন নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে। মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশ্বপরিস্থিতিতে মানবকল্যাণে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য যার মধ্য দিয়ে আরাধ্য মানবকল্যাণের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। নজরুল বিদ্রোহাত্মক কথা বলেছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনের সঙ্গে এই দার্শনিকদের মুক্তি-অন্বেষী আলোচনা বাঙালির চেতনায় নতুন উদ্দীপনা বয়ে আনবে।

Dhaka University Institutional Repository

২.১. আরজ আলী মাতুব্বর ও বেগম রোকেয়ার মানবতাবাদ

পৃথিবীতে এমন কিছু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা অনন্য সাধারণ মনীষা দ্বারা স্থান, কাল, ধর্ম ও নীতির অচলায়তন আবর্ত ছিন্ন করার নিরলস প্রচেষ্টা চালায়। তাঁদের প্রতিভা ও উদার ব্যক্তিসত্তার চিরন্তন মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের রচনা শৈলীতে। তাঁরা সমাজের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কূপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, বিদ্রোহ করেছেন ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। তাঁদের বিদ্রোহের মূল সুর ছিল সমাজ পরিবর্তন এবং সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের মানুষের ভিতরে মানবিক মূল্যবোধের চেতনার সঞ্চার করা। সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে এই দুই ব্যক্তিত্ব আরজ আলী মাতুব্বর ও বেগম রোকেয়া (১৮৮০খ্রি.-১৯৩২খ্রি.) স্মরণীয় হয়ে আছেন, মানুষকে তাঁর যথাযথ মর্যাদাবোধে উন্নীত করার অগ্রদূত বা মুক্তিদাতা হিসেবে। রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামের এক সম্ভ্রান্তজমিদার পরিবারে বেগম রোকেয়ার জন্ম এমন এক সময়ে যখন সমাজে পর্দার কড়াকড়ি ছিল এবং মুসলিম পরিবারে ইংরেজী-বাংলা ভাষার চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। বেগম রোকেয়া তাঁর অদম্য আগ্রহে, পিতার অলক্ষ্যে বড় ভাই আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবের, বড়বোন করিমুন্নেছা খানম এবং স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের ঐকান্তিক আগ্রহে, সহযোগিতায় ঘরে বসেই ইংরেজি ও বাংলায় লেখাপড়া করেন।[১]

অপরদিকে আরজ আলী মাতুব্বর বরিশাল শহরের অদূরে লামচরি গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিতান্ত ছোট বয়সে, তাঁর বাবা মারা গেলে খাজনার দায়ে কৃষি জমিটুকু নিলাম করিয়ে নেন লাখুটিয়ার জমিদার। গ্রামের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায়, শরীয়তী শিক্ষাদানের জন্য এক মুন্সি সাহেবের মক্তবে এতিম ছেলে হিসেবে কিছু দিন অবৈতনিকভাবে লেখাপড়া করেন। কিন্তু বেতন অনাদায়হেতু এ মক্তবটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর আনুষ্ঠানিক বিদ্যালিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। সেখানে তিনি তালপাতায় ও কলাপাতায় যথাক্রমে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ এবং বানান-ফলা শিক্ষাগ্রহণ করেন। বই-শ্লেট কেনার সঙ্গতি ছিল না। পড়ালেখায় অতি আগ্রহ দেখে, আরজ আলীর এক আত্মীয় রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা' নামক একখানা বই কিনে দিলে – ঐ বইখানাই ছিল তাঁর বাল্যশিক্ষা জীবনের একমাত্র সম্বল। তাঁর ভাষায় : "সেদিন ছিল আমার জীবনের সর্বপ্রথম বই হাতে ছোঁবার দিন। তাই আনন্দে আমার মনটা ফেটে যাচ্ছিল, ... সে বইখানা ছিল আমার ক্ষুধার্ত মনের খাদ্য।"[২]

ব্যক্তিগতভাবে লেখাপড়ার জন্য বরিশাল বিএম কলেজ থেকে নানাবিধ অভাব-অনটনের মধ্যেও তিনি পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ করে লেখাপড়া করেন। অভাব-অনটনের জন্য তিনি কোনো শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি। তাঁর ভাষায়: "কোনো স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, আমার শিক্ষাপীঠ নয়,

Dhaka University Institutional Repository

আমার শিক্ষাপীঠ হলো লাইব্রেরী।"[৩] এভাবে বেগম রোকেয়া এবং আরজ আলী মাতুব্বরের শিক্ষাজীবন ছিল প্রতিবন্ধকতামূলক, একজনের বাঁধা ছিল পর্দার কড়াকড়ি ও অন্যজনের বাঁধা ছিল আর্থিক টানা-পোড়া। তবুও শিক্ষার্থী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং জীবনদর্শন চর্চায় কেউ থেমে থাকেননি, যদিও এদের দু'জনের চিন্তা ও কর্মের সময় ছিল ভিন্ন। রোকেয়ার মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও বাঙালি হিন্দু - মুসলমানদের সমাজ ছিল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। বরিশাল জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে লামচরি গ্রামে, যেখানে আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম, সেখানে মৌলবাদীদের আধিপত্য সম্পর্কে তরুণ বয়সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছেন। তিনি বলেন:

> ধার্মিকের সংখ্যা বেশি নয়, তবে ধর্মের বাতাস বয় জোয়ালো। ... বিদ্রোহী কবি নজরুল আক্ষেপ করে বলেছেন, "বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখন বসে, বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজছি ফেকাহ-হাদিস চষে।" এ গ্রামটির অবস্থাও তা-ই।[৪]

মৌলবাদীদের ধর্মীয় কুসংস্কার তিনি কোনো মতেই মেনে নিতে পারেননি। বেগম রোকেয়া নারীজাতিকে আত্মমর্যদায় পরিবারে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আজীবন বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত-বঞ্চিত নারীকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সমাজে তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়ে তিনি মানবতাবাদেরই পরিচয় দিয়েছেন। এ কারণেই তিনি, "সমাজের ভবিষ্যৎ জননীদিগের শিক্ষার ভার নিজের হাতে লইলেন।"[৬] নারীর অধিকার বাস্তবায়নের জন্যই তিনি সেই অন্ধকার যুগে পর্দার আড়ালে থেকে নারী শিক্ষার বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছিলেন, মুসলমান মেয়েদের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের পথ সুগম করেন। বেগম রোকেয়ার ভাষায়:

> মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ নারীরূপে পরিচিত হইতে পারে।[৭]

স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে তিনি আরো বলেন :

> আমরা যা চাহিতেছি তাহা ভিক্ষা নয়, অনুগ্রহের দান নয় – আমাদের জন্মগত অধিকার। ইসলাম নারীকে সাত শত বছর আগে যে অধিকার দিয়েছে তার চেয়ে আমাদের দাবি এক বিন্দু বেশি নয়।[৮]

এভাবে তিনি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে আপোসহীন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর মতে অবরোধ হচ্ছে - ঘরে বন্দী, ধর্মীয় গোঁড়ামি, পর্দার ব্যাপারে অহেতুক বাড়াবাড়ি। অন্যদিকে পর্দা হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক পবিত্রতা রক্ষার অন্যতম মাধ্যম, যার সঙ্গে উন্নতি বা শিক্ষার কোনো বিরোধ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়া মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন নারীদেরকে অত্যাচার, নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে শিক্ষা ছাড়া কোনো মাধ্যম নেই। তাঁর ভাষায়:

> শিক্ষা বিস্তারই এইসব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ। অন্ততপক্ষে বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে। শিক্ষার অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি, গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা! আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে আন্তরিক আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতারূপে গঠিত করিবে।[৯]

মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলন বা নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে বেগম রোকেয়ার চিন্তা ও কর্মধারা পর্যালোচনা করলে দু'টি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে; যেমন নারী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণ এবং অবরোধ প্রথার অবসান। রোকেয়ার সমস্ত রচনার পেছনে আছে সমাজসংস্কার বা সমাজহিতের নির্দেশ।[১০] তিনি লিখেছেন দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য। তিনি তাঁর জীবনদর্শনকে বাস্তব রূপ করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবতার পরিচয় দিয়েছেন।

আরজ আলী মাতুব্বরও যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষকে দিয়েছেন মানবিক মর্যাদাবোধ। মানুষকে সব সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির উর্ধ্বে থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। জাগতিক যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি নিরন্তর সাধনায় রত ছিলেন। তিনি প্রমাণ করে গেছেন একটি সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত ও আলোকিত করার একমাত্র উপায় জ্ঞান। এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তিনি নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'আরজ মনজিল' পাবলিক লাইব্রেরি। তাঁর ভাষায় দীর্ঘকাল বিভিন্ন লাইব্রেরীর সংস্পর্শে থেকে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, লাইব্রেরী মানুষকে মানুষ বানাতে পারে, পারে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে দূর করতে। তাই তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত করেন:

> মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার, মানুষ হিসেবে সেবা করার মানসিকতা আসবে জ্ঞানের মধ্য দিয়েই। শুধু অন্তহীন জ্ঞানই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে চরম অজ্ঞানতা থেকে।[১১]

আরজ আলী মাতুব্বরও এভাবে বেগম রোকেয়ার মতো উপলব্ধি করেন যে, জ্ঞান লাভের মাধ্যমেই মানুষ কুসংস্কারমুক্ত হতে পারে। তিনি আরো উপলব্ধি করেন অত্যাচার, নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে হলে শিক্ষা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আরজ আলীর মতে শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব খাদ্য, বস্ত্র, রোগ ইত্যাদি সংক্রান্ত অজস্র আর্থিক সমস্যার সমাধান করা। সমাজের এই আর্থিক বৈষম্য দূর করে সমতা আনয়নের মধ্যেই রয়েছে বিশ্বমানবের কল্যাণ নিহিত। আর এই বৈষম্য দূর করে সমতা আনয়নের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে 'সমাজতন্ত্র'। তাই 'সমাজতন্ত্র' তথা 'সাম্যবাদ' হচ্ছে বিশ্বমানবের

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গল বিধানের একমাত্র মাধ্যম। মার্কসবাদ তাঁকে মানবতার সেবায় সব শক্তি নিয়োগ করার স্বপ্ন দেখিয়েছে। মার্কসের মতে বিজ্ঞানীকে অবশ্যই মানবতার সেবায় নিয়োজিত হতে হবে। মাতুব্বর তাঁর সীমিত ক্ষমতার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করে সেগুলো মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন।[১২] মুষ্টিমেয় লোক বিজ্ঞানের দ্বারা উপকৃত হোক আরজ আলী মাতুব্বর তা' চাননি। আরজ আলী মাতুব্বরের ভাষায়:

> মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এমন কোনো বিষয় পাওয়া যায় না, যে বিষয়ে বস্তুবাদীদের (বিজ্ঞানী) কোনরূপ অবদান নেই। বিজ্ঞানীদের যাবতীয় সাধনার মৌলিক উদ্দেশ্য-আত্ম স্বার্থ বিসর্জনপূর্বক সভ্যোদ্ঘাটন ও মানুষের কল্যাণ সাধন করা। তাই স্বভাবতই তাঁহারা ত্যাগী ও মানপ্রেমিক। অধুনা বস্তুবাদের সহিত ত্যাগ ও প্রেমযোগে মানব জগতে গড়িয়া উঠিয়াছে এক নতুন মতবাদ, যাহার নাম মানবতাবাদ। ইহা বৈজ্ঞানিক সমাজে সমাদৃত, অলেক্ষ্টা বাহিরেরও। বিজ্ঞানে দুর্বার অগ্রগতি দেখিয়া মনে হয় যে, একদা মানবজগতের আন্তর্জাতিক ধর্মই হইবে মানবতাবাদ।[১৩]

এভাবে আরজ আলী প্রমাণ করেন, সব ধর্মের উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ যেখানে কোনো কুসংস্কার প্রশ্রয় নিতে পারে না। রোকেয়া এবং আরজ আলী উভয়ের সময়ের সামাজিক অবস্থান ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। কুসংস্কারের কারণে পাঁচ বছরের বালিকাকেও পুরুষ অথবা মহিলাদের চোখের আড়ালে যেতে হতো। রোকেয়ার সংগ্রাম ছিল এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, তাঁর মতে – পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েরা পাঁচ বছর বয়সের গণ্ডি পার হলেই ঘরের বাইরে আসতে পারত না। তৎকালীন সমাজ ছিল নারী শিক্ষার বিরোধী। উনিশ শতাব্দীর শেষভাগেও অবরোধপ্রথা ও অশিক্ষা ছিল বাঙালি মুসলমান নারীর নিয়তি। শৈশবের পরিবেশ সম্পর্কে রোকেয়া উচ্চারণ করেন :

> সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত। ... পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত, অমনি বাড়ির কোন লোকচক্ষুর ইশারা করিত, আমি যেন প্রাণ ভয়ে যত্রতত্র – কখনও রান্নাঘরে ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও কোন ঢাকনাদির গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে কখনও তক্তপোসের নিচে লুকাইতাম। ... তাই কোন সময় চক্ষের ইশারা বুঝিতে না পারিয়া সৈযাৎ না পালাইয়া যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম, তবে হিতৈষণী মুরব্বিগণ, 'কলিকালের মেয়েরা কি বেহায়া, কেমন বেগয়রৎ' ইত্যাদি বলিয়া গঞ্জনা দিতে কম করিতেন না।[১৪]

বেগম রোকেয়া সমাজের এমনি কুসংস্কারপূর্ণ অনাচার, অত্যাচার থেকে নারীমুক্তির লক্ষ্যে, নারী-পুরুষের সমান মর্যাদার লক্ষ্যে, নারীর আত্মবোধের উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে সাধনা করেছেন। এ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই তিনি নিজ চেষ্টায় বড় ভাইয়ের সাহায্যে লেখাপড়া শিখেছেন এবং তৎকালীন এ

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁর সময় বাঙালি মুসলমান সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের চর্চা একেবারেই ছিল না। বেগম রোকেয়া ও আরজ আলী মাতুব্বর উভয়েই নিজ নিজ পরিধিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বেগম রোকেয়ার জীবনেতিহাস থেকে জানা যায়, তিনি মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৯০৯ সালে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলই ১৯৩১ সালে বেগম রোকেয়া অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইংরেজি গার্লস স্কুলে পরিণত করেন। শৈশবে পিতৃহীন আরজ আলী মাতুব্বরও নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত হয়ে উঠে তাঁর গ্রামে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি লামচরি গ্রামের উন্নতিকল্পে লাইব্রেরির সঙ্গে একটি নৈশ বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে যায়।

জাতির বৃহত্তর কল্যাণার্থে বেগম রোকেয়া সমাজ উন্নয়নের কাজে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নারী পুরুষকে সমাজের দু'টি চক্ষু হিসেবে বিবেচনা করে নারীদের কল্যাণকে জীবনের মূল ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর সাহিত্যে নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত মূল্যবান সামাজিকতত্ত্ব উপস্থিত করেন। তাঁর মতে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্য। শ্রম বিভাজনে শুধু যে স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য আছে তা নয়, রোকেয়া লক্ষ করেন নারী-শ্রমের মূল্যায়নই হয় না। রোকেয়ার মতে নারী শ্রমিক ঘরে বাইরে কোথাও তাঁর শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় না।[১৫] রোকেয়ার প্রধান কাজই ছিল সমাজের দোষত্রুটির যৌক্তিক সমালোচনা করা। বিপরীতে আঘাত পেয়েছেন সমাজের কিছু তথাকথিত শিক্ষিত লোকের কাছ থেকে আর ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের কাছ থেকে। রোকেয়া তাঁর জীবদ্দশায় নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি দেখে যেতে পেরেছেন। নারী যে কেবল উন্নয়নের ভোক্তা নয়, সে তাঁর সাধ্যমতো উন্নয়নের কাজে অবদান রাখে – এ ধারণা স্বীকৃতি পেয়েছে।

বেগম রোকেয়া যেমনি নারীমুক্তির উপায় হিসেবে নারীর শ্রমের মূল্যতত্ত্ব দিয়েছেন; আরজ আলী মাতুব্বর, কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্র সর্বহারা মানব মুক্তির পথ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আরজ আলীর মতে মানব সভ্যতা ও সমাজ উন্নয়নের প্রধান ধাপগুলোর মধ্যে সমাজতন্ত্র হলো চরম ধাপ। তিনি আর বলেন : "প্রত্যেকে নিজের 'সাধ্য' অনুযায়ী সমাজকে দেবে এবং নিজের 'প্রয়োজন' অনুসারে নেবে। এ সমাজে কারো কাজের অনিশ্চিয়তা থাকবে না, ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ থাকবে না। মেহনতী মানুষের শোষণ করার মতো মালিক বা মুনাফা শিকারির দল থাকবে না, থাকবে না শ্রেণীগত বৈষম্যের বিশাল প্রাচীর।"[১৬] চুয়াশি বছর বয়সে আরজ আলী মাতুব্বর জগৎ, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে লিখেছেন তাঁর একান্তউপলব্ধির কথা। তাঁর মতো সমাজের আর্থিক বৈষম্য দূর করে সমতা আনয়নের মধ্যেই রয়েছে বিশ্বমানবের কল্যাণ নিহিত। তাই 'সমাজতন্ত্র' তথা 'সাম্যবাদ' হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানের একমাত্র মাধ্যম। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, রকেট-রোবট ব্যবহার ও স্বর্গ-নরকের দর্শনের দ্বারা সমাজ উন্নয়নের প্রচেষ্টা নিতান্তই একটা প্রহসন।[১৭] সমাজের করুণ চিত্র, অসহায় অবস্থা তাকে এতই ব্যথিত ও বিচলিত করেছে যার জন্য তিনি সমাজের পঙ্গুত্বের সাথে একটি লোকের পঙ্গুত্বের উদাহরণ দিয়ে সমাজের পঙ্গুত্বের কারণ নির্ণয় করেন। একজন গরিব লোকের বাম পা ছিল স্বাভাবিক আকারের অর্থাৎ প্রায় আড়াই ফুট। কিন্তু তার ডান পা লম্বা ছিল সাড়ে চার ফুট। অনুরূপ আর একটি লোকের ডান হাত ছিল স্বাভাবিক কিন্তু বাম হাতখানা লম্বা ছিল মাত্র ছয় ইঞ্চি। এ লোক দু'টির দেহে অঙ্গবিশেষের অস্বাভাবিকতার জন্য একজন হয়েছে পঙ্গু ও অপরজন হয়েছে অকর্মণ্য। তিনি এই উপমা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, সমাজদেহের পঙ্গুত্ব ও অকর্মন্যতার কারণেই শ্রেণীবিশেষে অতিমাত্রায় উত্থান ও পতন ডেকে আনে। তিনি দুঃখের সাথে আরো উপলব্ধি করেন যে, সমাজের ডান ও বামপন্থী (ধনী ও দরিদ্র) দের মধ্যে আর্থিক বৈষম্যের পাহাড় দিন দিন বেড়েই চলছে। একমাত্র সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই এ বৈষম্য দূর করা সম্ভব।[১৮]

বেগম রোকেয়া ও আরজ আলী মাতুব্বর এভাবে দু'জনেই সাধারণ লোকের কথা বলেন। নির্যাতিত নিপীড়িত লোকের কথা বলেন, কারণ দু'জনেই সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত। দু'জনের মূল রচনা ছিল বাংলা প্রবন্ধ এবং দু'জনেই কবিতা রচনা করেছেন। রোকেয়ার স্বামী সুশিক্ষিত ও সরকারি উচ্চ পদে নিযুক্ত থাকায় স্বামীর কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ পেতেন, মাতুব্বর বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকেই বেশি উৎসাহ পেয়েছেন। জ্ঞানচর্চার সহায়ক হিসেবে তিনি পেয়েছেন ব্রজমোহন কলেজ লাইব্রেরি এবং ব্যাপটিস্ট মিশন লাইব্রেরি। মাতুব্বর মেধা ও মননে ছিলেন উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন। তাঁর জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি ছিল অন্বেষণ, পুণঃঅন্বেষণ ও সর্বোপরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সমাজজীবন পর্যবেক্ষণ করে তিনি আবিষ্কার করেছেন সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের বাস্তব সত্যতাকে। তাঁর ধর্ম চেতনা এবং সাধারণ শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশা লাঘব করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি ধর্মকে বিচার করতে চেয়েছেন যুক্তির সাহায্যে; বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোকে। তিনি বিজ্ঞানকে জ্ঞানের পদ্ধতি হিসেবে বেছে নিয়েছেন এই কারণে:

> বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আমাদের সন্দেহ নাই। ... ধর্মকে সন্দেহাতীতরূপে পাইতে হইলে উহাকে অন্ধবিশ্বাসের উপর রাখিলে চলিবে না। উহা খাঁটি বিশ্বাস অর্থাৎ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।[১৯]

যুক্তিবাদী বেগম রোকেয়াও বার বার অনুসন্ধান করেছেন নারীজাতির অধস্তন অবস্থার কারণ। রোকেয়ার মতে ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালি মুসলমান পুরুষ নারীর আত্মমর্যাদা খর্ব করে নারীকে

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরশীল রাখতে চেয়েছেন। ফলে আত্মগতভাবে নারী তার অধস্তন অবস্থা অনুভব করে না। তাই রোকেয়া অনুভব করেন, জন্মসূত্রে নারী এমনভাবে শোষণ ও শাসনের শিকার হয় যে, নিজেকে সে আর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বলে ভাবতে দাবি করতে পারে না। তাই রোকেয়ার মতে নারীকে, 'সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবে'।[২০] 'জাগিতে হইবে' অর্থাৎ নারীজাতিকে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হতে হবে। কারণ রোকেয়া অনুভব করেন– 'আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি।'[২১] কিন্তু এ অবস্থা থেকে অবশ্যই পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। তা না হলে নারীও যে 'মানুষ'– এই আত্মশক্তিতে নারীকে বলীয়ান করা যাবে না। এভাবে তিনি অসহায় নির্যাতিতদের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। গতানুগতিক আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। তাই তিনি মেয়েদেরকে এই আত্মজ্ঞানে বলীয়ান করতে চেয়েছেন যে, মেয়েরাও মানুষ।

আরজ আলী মাতুব্বরও সমাজের গতানুগতিক আচার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ছিলেন স্বাধীন ও মুক্তমনের ব্যক্তিত্ব। তিনি বিশেষ করে গতানুগতিক ধর্মীয় আচারের সমালোচনা করে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদের সমর্থন করেন। তিনি যুক্তির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনার করুণ চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেন কিছু লোক মহা উল্লাসে অন্ধলোকের আরো রক্ত শুষে নিচ্ছে। মাতুব্বর লক্ষ করেছেন, শোষণ ও শাসনের ফলে আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলে মানুষ। আরজ আলীর প্রতিবাদ ছিল এইসব অক্ষনের বিরুদ্ধে। তিনি মানবজাতির আত্মমর্যাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারণ করেন:

> প্রতারক ধূর্ত পণ্ডিতগণ আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরলোক ও স্বর্গ-নরকাদির কল্পনা করিয়া জনসমাজকে বৃথা ভীত এবং অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।[২২]

এভাবে আরজ আলী মানুষের মধ্যে চেতনাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। কারণ শক্তিহীন অবস্থা থেকে মুক্তি কেবল তাঁদের নিজস্ব চেতনা দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। বেগম রোকেয়া ও আরজ আলী মাতুব্বর উভয়ই ভালো করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কায়েমী স্বার্থ রক্ষার্থে অদৃষ্টবাদের ভূমিকা অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন ভালোমন্দ নির্বাচন করার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে এই অদৃষ্টবাদ অবশ্যই বর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে মহাকবি ইকবালের[২৩] মতের সঙ্গে বেগম রোকেয়া ও মাতুব্বরের কোনো দ্বিমত নেই। মুসলমান সমাজ পশ্চাৎপদ থাকার কারণ হিসেবে বেগম রোকেয়া উল্লেখ করেন – নারী ও পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য এবং অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার বৈষম্য। রোকেয়া

Dhaka University Institutional Repository

বলেন – বাঙালি মুসলমান যে নারী বিদ্বেষী[২৪] তা নয়, তারা নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ ধর্ম পালন করেন না, 'নামাজ নামাজ' খেলা করেন।[২৫] তিনি নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষার উপর অত্যন্তগুরুত্ব দেন। তাই নারী উন্নয়নকল্পে তিনি নিজ বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য অর্থ বুঝে কোরান পাঠের ব্যবস্থা করেন। তিনি লক্ষ করেন, ইংরেজ শাসন আমলে চাকরিজীবী পুরুষসমাজের মানসিকতা জনকল্যাণমূলক নয়। তাঁর মতে, পুরুষরা অল্পবিস্তর অর্থব্যয়ে দেশের কোনো মহৎ কর্ম করা অপেক্ষা খান বাহাদুর, রায় বাহাদুর উপাধি লাভের প্রত্যাশী হয়ে থাকেন। বেগম রোকেয়া আরো লক্ষ করেন, বিত্তহীন পরিবারে পুত্রসন্তান বিধবা মাতাকে শিশুকন্যাসহ নিজ ব্যয়ে প্রতিপালন করে। আর ক্ষমতাসীনদের কাছে মা একজন অবোধ মেয়ে মানুষ এবং উপেক্ষার পাত্রী। সাধারণ মানুষের কাছে তাহলো 'স্বর্গের আশীর্বাদ বিশেষ'। তাই দেখা যায় বিভিন্নভাবে আচার আচরণে সমাজের শ্রেণী বৈষম্যের কারণে সমাজবদ্ধ মানুষ এত পশ্চাৎমুখী; জাতি আজ এত অনুন্নত। তাই তিনি শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষা মানুষকে ক্ষমতাবান করে তোলে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একটি জাতি যত শিক্ষিত হতে পারবে ততই দেশ উন্নত হবে। তাই রোকেয়া বলেন, উপযুক্ত এবং সহায়ক পরিবেশের মাধ্যমেই নারীরা নিজের চেষ্টায়ই বিদূষী হয়ে উঠতে পারে। যদিও পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টায় নারীকে অনেক বাধা পেতে হয় তবুও তাকে থেমে থাকলে চলবে না। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া নারীজাতির পক্ষে বলেন :

> যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ করা হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইল আমরা লেডী কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিস্টার, লেডি জজ সবই হইব।[২৬]

বেগম রোকেয়া লক্ষ করেছিলেন, মুসলমান মহিলারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে অথচ বাংলাদেশের মুসলমান মহিলারা ঐসব সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। তাই রোকেয়া মনে করেন, নারী জাতির উন্নতির কথা নিজেদেরকে ভাবতে হবে।[২৭] এভাবে বেগম রোকেয়া নারীজাতির মধ্যে চেতনা তথা আত্মসচেতনতা জাগাবার প্রক্রিয়ায় সচেষ্ট থেকেছেন। কারণ নিজস্ব চেতনা ছাড়া শক্তিহীন অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয় – এটা বেগম রোকেয়া মরমে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার জন্য প্রয়োজন যৌথ-শক্তিকে কাজে লাগানো।

আয়জ আলী মাতুব্বর লক্ষ করেছেন, শোষণ ও শাসনের ফলে আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলে মানুষ। অতিপ্রাকৃতের দোহাই দিয়ে ধর্মযাজক, মৌলভি, পুরোহিতরা আধিপত্য করে সমাজে। নিজেদের শক্তিহীন মনে করে বঞ্চিতরা মেনে নেয় এসব ক্ষমতাসীনদের দৌরাত্ম্য। তাই তিনি স্বচ্ছ-

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই সমাজের নারীদের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করেন। এই বিশ্লেষণের সপক্ষে আরজ আলী মাতুব্বর রামায়ণের উদাহরণ উল্লেখ করেন:

> ... কুশলবকে গ্রহণ করলেও সীতাকে গ্রহণ করেননি রামচন্দ্র সেদিনও। সীতাদেবী হয়তো আশা করেছিলেন যে, বহু বছরান্তে পুত্ররত্নসহ রাজপুরীতে এসে এবার তিনি সমাদর পাবেন। তাই তিনি ক্ষোভে দুঃখে হয়তো আত্মহত্যা করেছিলেন। নারী হত্যার অপবাদ লুকোনোর উদ্দেশ্য এবং ঘটনাটি বাইরে প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে শ্মশানে দাহ করা হয়নি। সীতার শবদেহটি, হয়তো লুকিয়ে প্রোথিত করা হয়েছিল মাটির গর্ভে, পুরীর মধ্যেই। আর তা-ই প্রচারিত হয়েছে, 'স্বেচ্ছায় সীতা দেবীর ভূগর্ভে প্রবেশ বলে'।[২৭]

এই বিশ্লেষণ এটাই প্রমাণ করে যে আবহমান কাল থেকে নারীর অবস্থান ছিল কত দুর্বল। উল্লিখিত ঘটনা আমাদের ধর্মীয় সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকবোধকে প্রবলভাবে আঘাত করে। আরজ আলী মাতুব্বরের দৃষ্টি সমাজ বিশ্লেষণের কত গভীরে নিপতিত হলে দীর্ঘকালের চলে আসা এমন একটি ধারণা সমাজের আলোকে তুলে ধরেছেন। সমাজের নারী অবস্থানের আরজ আলী মাতুব্বর দ্বিতীয় বিশ্লেষণ হলো মুসলিম সমাজের হিল্লা প্রথা নিয়ে। আরজ আলী উল্লেখ করেন :

> তালাকের ঘটনা যে ভাবেই ঘটুক না কেন, ত্যাজ্য স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে স্ত্রী যে নির্দোষ, ইহাই প্রামাণিত হয়। মনে হয় যে, ক্রোধ, মোহাদি কোন রিপুর উত্তেজনায় স্বামী ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃতি হইয়াই অন্যায়ভাবে স্ত্রীত্যাগ করে এবং পরে যখন সম্বিৎ (জ্ঞান) ফিরিয়া পায়, তখন স্থির মস্তিষ্কে সরলীকরণে ত্যাজ্য স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। ...ইহাতে দেখা যায় যে, স্ত্রীর উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া অথবা ক্রোধাদির বশবর্তী হইয়া স্ত্রীত্যাগে স্বামীই অন্যায়কারী বা পাপী, অথচ পুনঃগ্রহণযোগ্য নির্দোষ স্ত্রীকে পুণঃগ্রহণে 'হিলা' প্রথার নিয়মে স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত করিতে হয় সেই নির্দোষ স্ত্রীকেই। অপরাধী স্বামীর অর্থদণ্ড বেত্রাঘাত ইত্যাদি না-ই হউক, অন্তত তওবা (পুনরায় পাপকর্ম না করিবার শপথ) পড়ারও বিধান নাই, আছে নিষ্পাপিনী স্ত্রীর ইজ্জতহানির ব্যবস্থা। একের পাপে অন্যকে প্রায়শ্চিত করিতে হয় কেন?[২৮]

ধর্মীয় আচরণ কীভাবে নারীকে হেয়প্রতিপন্ন করে রাখার জন্য তৈরি হয়, এ প্রশ্নের মাধ্যমে সেই ধর্মকেই কটাক্ষ করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বর বর্তমান নারী আন্দোলনের যে বিষয়গুলি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে আরজ আলী মাতুব্বরের মনে আরো দুই-তিন দশক আগেই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। নারী জাতির সপক্ষে এ প্রশ্ন একটি সময়ে প্রোথিত দীর্ঘদিনের অনিয়মের বিরুদ্ধে একটি কঠোর প্রতিবাদ। নারীকে তিনি দেখেছেন সমাজের বৃহত্তর অংশ হিসেবে। এই বৃহত্তর অংশের নিপীড়ন তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক মনে হয়েছে। যে কারণে তিনি ধর্মের নামে প্রচলিত সেই মূলে আঘাত হেনেছেন। সাধারণ অর্থে বোঝা যাবে না যে, আরজ আলী শুধু নারীবাদী ধারণা থেকেই সমাজকে এমন ভাবে আঘাত করেছেন। নারী নির্যাতনের বিষয়টি তাঁর কাছে জীবনের মৌল সত্যের বিপরীত কাজ বলে মনে হয়েছে। এই অর্থে আরজ আলী মাতুব্বরের ভূমিকা হলো একজন বড় মাপের সমাজ সংস্কারক হিসেবে।[৩০]

তবে আরজ আলী মাতুব্বর ধর্মীয় কুসংস্কারক পরিবর্তনের পাশাপাশি মুক্তবুদ্ধির চর্চার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যে কারণে তিনি নিজ গ্রামে তাঁর সীমিত পরিসরে স্থাপন করেছেন পাঠাগার। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জ্ঞানের মাধ্যমেই মৌল সত্যকে বের করে নিয়ে আসা যায়। তিনি অন্তরে এমন এক মৌল সত্যকে ধারণ করেছেন, যার ভিতর থেকে সমাজ পরিবর্তনবাদী চিন্তার কথা আসে এবং যে চিন্তা হয় উদার ও মানবিকবোধসম্পন্ন। কারণ শিক্ষা ছাড়া কুসংস্কার দূরীকরণ সম্ভব নয়। আর তার জন্য প্রয়োজন মুক্তবুদ্ধির চর্চার।

ভাষা এবং ধর্ম মানুষের জীবনের দুটি মৌলিক বিষয়। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিতরে ভাষা ও ধর্ম উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ। নানা কারণে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই শাশ্বত সত্যের ভিতর আবিলতা প্রবেশ করে। ধর্মকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয় সেটি আবিলতারই নজির। আর একমাত্র সত্যসন্ধানী মানুষেরাই ধর্মের নামে এই পঙ্কিলতা সৃষ্টিকারীদের প্রতিহত করতে অগ্রসরমান; যা মানবিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে অত্যন্তপ্রয়োজন। আরজ আলী মাতুব্বর মানবিক বোধের বাইরে যা কিছু আছে তাকে প্রতিহত করে সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে জীবনের মানবিক দিকটাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বেগম রোকেয়ার মতে, স্ব-স্ব ধর্মের সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কই হবে মানুষের জন্য কল্যাণময়। বেগম রোকেয়ার দর্শনে আত্মোপলব্ধির চেতনা ছিল। তিনি মনে করতেন, সকল ধর্মের নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণকর। অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন :

> আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহিনা। মানবিক উন্নতি করিতে হইলে হিন্দুকে হিন্দুর হিন্দুত্ব, খ্রষ্টানকে খ্রষ্টানী ছাড়িতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়।[৩১]

এখানে 'পার্থক্য' বলতে তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে ধর্মই হলো আধ্যাত্মিক অনুভূতির উৎস এবং এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা অনন্তপ্রেম উপলব্ধির সঙ্গে অন্য কোনো অনুভূতির তুলনা নেই। রোকেয়া ইসলাম ধর্ম অনুসারে হজ পালন সম্বন্ধে বলেছেন, নিজের

Dhaka University Institutional Repository

মন-প্রাণ আল্লাহর দরবারে বিসর্জন দেওয়াতেই হাজীদের আনন্দ। প্রকৃত প্রেমিকের ন্যায় যে বাঞ্ছিতজনের গৃহের চারিপাশে দ্রুত প্রদক্ষিণ করে এবং দেশ-দেশান্তরে ঘুরে সেখানেই এসে উপস্থিত হয়, বস্তুত সে নিজের সকল স্বার্থ ভুলিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরমাত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে।[৩২] হজব্রত পালনের মধ্যে রোকেয়া সাম্যবাদের পরিচয় পান। তাই ধর্মের এই আধ্যাত্মিকদিক রোকেয়াকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কারণ এখানে রাজা-প্রজা, জ্ঞানী- মূর্খ, পুরুষ-নারী সবাই এক পোশাক পরিধান করে একই নিয়মে হজব্রত পালন করে। সেখানে কেউ নিকৃষ্ট বলে গণ্য হয় না। আবশ্য 'কাবা' ঘরে পরমাত্মা বন্দি থাকে না। পবিত্র কাবা গৃহ প্রতীক হিসেবে মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ উপলব্ধি করে মানবপ্রেম ; আর লোভ, লিপ্সা, হিংসা নামক কুপ্রবৃত্তিগুলি কোরবানি হয়। কোরবানি মানুষকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। তবে আরজ আলী মাতুব্বরের মতে কোরবানি কখনও মানুষকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে না এবং তিনি হযরত ইব্রাহিমের দৃষ্টান্ত অনুসারে কোরবানি করা প্রয়োজন মনে করতেন না। তার মতে : হযরত ইসমাইল পিতার ছুরির সামনে স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দিয়েছিলেন কোরবানি হওয়ার জন্য; গরু, ছাগল বা দুম্বা জবেহ করা ঠিক এ জাতীয় কাজ নয়। 'প্রতীক' হিসেবে ছাগল, দুম্বা ব্যবহার করা হয়। ছাগল, দুম্বা স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে ছুরির সামনে এগিয়ে আসে না।[৩৩]

মানুষ এক সময় শিশু বলি দিত, সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে শিশু বলি বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বলেন, "ধর্মবেত্তারা সকলেই ছিলেন মানব কল্যাণে আত্মনিবেদিত মহাপুরুষ। কিন্তু তাঁরা তাঁদের দেশ ও কালের বন্ধন মুক্ত ছিলেন না। তাঁদের প্রবর্তিত সেকালের অনেক কল্যাণকর ব্যবস্থাই একালের মানুষের অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"[৩৪] ভ্রূণহত্যা এখনও প্রচলিত আছে। আরজ আলী মাতুব্বরের কালে এবং বর্তমানকালেও পরিবার পরিকল্পনার একটি পদ্ধতি হিসেবে ভ্রূণ হত্যা করা হয়। মাতুব্বর মনে করেন যে, গর্ভপাতের ব্যবস্থা দ্বারা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করা যায়। তবে এর কুফল রয়েছে। এ ব্যবস্থায় গর্ভবতি নারীর প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে।[৩৫] মাতুব্বরের মতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়ও অন্যায় কাজ সংগঠিত হয়। বেগম রোকেয়া ও আরজ আলী মাতুব্বর উভয়ই সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন, ধর্মীয় রীতিনীতির পরিবর্তনের মাধ্যমেই সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব। তাঁরা দু'জনেই সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছেন মোল্লা সম্প্রদায়ের অকারণ ভ্রুকুটি ও আধিপত্য থেকে। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাঙালি মুসলমান জাতির জাগরণ। এ সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার স্পষ্টোক্তি:

Dhaka University Institutional Repository

> কবে মুসলমান 'মানুষ' হইবে? রসনা-পূজা ছাড়িয়া ঈশ্বর-পূজা করিতে শিখিবে? জগতের অনেক জাতি জাগিয়ে উঠিয়াছে। ভাল-মন্দ বুঝিয়াছে, কেবল ইহাদের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই।[৩৬]

সমাজে অবহেলিত নারীর অবস্থা দেখে বেগম রোকেয়া উদ্বিগ্ন হন। এ জন্য তিনি ধর্মীয় কুসংস্কারকেই দায়ী করেন, এবং উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই সমাজে কুসংস্কার বিদ্যমান। তাই মনে করতেন বাঙালি মুসলিম নারীকে শিক্ষিত করার অর্থই পুরো সমাজকে জাগ্রত করা। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন, মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রী শিক্ষায় ঔদাস্য।[৩৭] অপরদিকে মুক্তমনা আরজ আলী মাতুব্বর সমাজকে অন্ধকুসংস্কার থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানকে তিনি মানবতাবাদে উন্নীত করেন।[৩৮]

আরজ আলী মাতুব্বর ধর্ম, দর্শন, সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবনের যাবতীয় মৌলিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করেছেন বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে। তিনি এ ক্ষেত্রে ব্যাপক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, "তা আমাদের একাডেমিক অঙ্গনে আজ অনুপস্থিত। এই পর্যায়ে মনন চর্চা আজও দুর্লভ।"[৩৯] আরজ আলী মাতুব্বর আশা পোষণ করেন মুক্তবুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে মুক্তমনা নাগরিক গড়ে উঠবে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হয়ত কিছুটা দূর হবে, দূর হবে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, আর এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অত্যন্ত জরুরী হলো মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ লোকশিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি সাধন করা। কারণ দেশ আজ ভোগের সমাজে পরিণত হয়েছে। তাঁর ভাষায় :

> আজ সারা দেশে চলছে ভোগের তুমুল লড়াই, ত্যাগের নয়, ভোগের ময়দানে সৈন্যরা গিজ গিজ করে, কিন্তু ত্যাগের ময়দান সৈন্যহীন।[৪০]

তিনি লক্ষ্য করেছেন সব ধর্মেই আছে নৈতিকতার বাণী। তিনি দুঃখ করে বলেন, এ বিজ্ঞানের ধর্ম মানুষের নৈতিক গুণাবলিকে সুরক্ষা করতে পারছে না, বহু ধর্মবিরোধী কাজ এখন রাষ্ট্রীয় সমর্থনপুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ নারী স্বাধীনতা, সুরা পান, সুদপ্রথা এসব আচার-আচরণের কুফল সম্বন্ধে জনগণ সচেতন হলে সমাজের কল্যাণ হবে।[৪১] যদিও তিনি নিজে গান বাজনা করতেন, তবুও তাঁর ভাষায় :

> ধর্মাবেত্তাদের, প্রবর্তিত সে কালের অনেক কল্যাণের ব্যবস্থাই একালের মানুষের অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই ধর্মীয় সমাজ বিধানে ফাটল ধরেছে বহুদিন আগে থেকেই।[৪২]

তিনি নিজে এ ব্যাপারটি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করেছেন। তাই তিনি আবারও উচ্চারণ করেন, "সে সবের বিরুদ্ধে সনাতনপন্থীরা কখনো প্রতিবাদের ঝড় তোলেননি। অথচ প্রতিবাদের ঝড়

Dhaka University Institutional Repository

তুলেছেন ফজলুর রহমান, বযলুর রহমান, আ.র.ম. এনামুল হক, আবুল ফজল প্রমুখ মনীষীদের দু'কলম লেখায়, কতকটা আমারও।"[৪৩] অর্থাৎ যাঁরা মুক্তবুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক। এভাবে তিনি পারলৌকিক জীবনের পরিবর্তে জাগতিক জীবনের কল্যাণের দিকে আলোকপাত করেছেন। পারলৌকিক জীবনকে তিনি কল্পনা বলে গণ্য করতেন। বাস্তব বাদী আরজ আলী মাতুব্বর ঈশ্বর কবিতায় প্রশ্ন করেছেন :

বশীভূত থাক সদা-বিভুর চরণে।
বল কে সহায় তব জনমে-মরণে ?[৪৪]

তিনি বলেন সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন জ্ঞানের, অন্যদিকে প্রয়োজন ঐকমত্যের। তাই 'মনের অস্থিরতা' কবিতায় জ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে এ বাণী উচ্চারণ করেন :

নির্দোষ জগৎপতি; জ্ঞানহীন লোক
সংকল্পদোষেতে পায় পদে পদে শোক।[৪৫]

আবার 'বিশ্বাসঘাতক' কবিতায় তুলে ধরেন ঐকমত্যের গুরুত্বে কথা :

মনে সুখে কাজে যার নাহি আছে ঐক্য,
এরূপ জনের সাথে না করিও সখ্য।[৪৬]

এভাবে তিনি তিলে তিলে অনুভব করেন একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য অত্যন্ত জরুরী হলো কুসংস্কারমুক্ত জ্ঞান অথবা যুক্তিসম্বলিত জ্ঞান এবং অপর দিকে প্রয়োজন সে ব্যাপারে এক ঐকমত্য গড়ে তোলা। তাহলেই তৈরি হতে পারবে একটি সুশীল সমাজ। নিজের দেশের জনসাধারণের দরিদ্রতা আরজ আলী মাতুব্বরকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে, তাই তিনি বলেন :

> যে দেশে লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশু অনাহারে অস্থি-কঙ্কালসার হয়ে সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে একমুঠো অন্ন পাচ্ছে না, সে দেশের বিমানবিহারী হাজিদের নিজে উড়ে, টাকা উড়িয়ে হজব্রত পালনের কোনো সার্থকতা নাই। যে দেশের হাজার হাজার গৃহহীন মানুষ মুক্তাকাশের তলে পথে-প্রান্তরে রাত কাটাচ্ছে, সে দেশে উপাসনামন্দিরে সাততলা মিনার তৈয়ারে কোনো সার্থকতা নাই।[৪৭]

আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন মানবদরদী, তাই তাঁর কাছে এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতা অবান্তব বলে মনে হতো। শুধু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করলেই প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না। বরং আল্লাহে বিশ্বাস রেখে মানবকল্যাণে ব্রতী হতে পারলেই সে হবে প্রকৃত মুসলমান। আরজ আলী বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশের অনেকেই এ দৃশ্য দেখে মর্মে মর্মে অনুভব করেন তবে মুখ ফুটে সাহস করে কিছু বলেন না,[৪৮] আরজ আলী আরও স্পষ্ট উপলব্ধি করেন যে, এভাবে মানুষ দুঃখপীড়িত মানুষকে সহজে আর্থিক সাহায্য করতে অনিচ্ছুক। তাই তিনি 'অর্থ' কবিতায় উল্লেখ্য করেন :

অর্থের অভাবে লোকে কেহ নহে কার,
সুখের সংসার হয় দুঃখের সংসার।[৪৯]

আরজ আলী মাতুব্বর স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষই সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি কর্তা। অর্থনীতিকে দৈবশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে না। এদেশের শতকরা আশিভাগ লোকই দরিদ্র। বেগম রোকেয়া তাঁর 'চাষীর দুঃক্ষু' প্রবন্ধে কৃষকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চাষীদের দরিদ্রতা দূর করার লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা এবং ঘরে ঘরে চরকা ও টেঁকো তৈরির কথা বলে।[৫০] সমাজকে আশরাফ আতরাফ ভাগে বিভক্ত দেখে আরজ আলী মাতুব্বরের ন্যায় তিনিও সাংঘাতিকভাবে দুঃখ পেয়েছিলেন। মুসলিম সমাজের সংস্কার ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। বেগম রোকেয়া ধর্মের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যন্ত মুক্তমনা ছিলেন। যেমন তিনি দার্শনিক যুক্তিতে ঈশ্বর প্রেরিত দূত দ্বারা 'ওহি নাজেল' অর্থাৎ দৈববাণীর গুরুত্ব দেননি। তাঁর মতে, "এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান কোনো স্ত্রীমুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন।"[৫১] বেগম রোকেয়া কোনো নির্দিষ্ট ধর্মকে আক্রমণ করেননি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, যে শাস্ত্রে ধর্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন।[৫২] ধর্ম বলতে এখানে ধর্মের সামাজিক বিধানকে বুঝানো হয়েছে। রোকেয়া কোনো রকম দৈববাণীকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি বলেন, "দৈব ঘটনাবলী কতকটা বৃটিশ বিচারের মতো – রামের পাপের জন্য শ্যামকে ভুগিতে হইবে।"[৫৩]

বেগম রোকেয়া এবং আরজ আলী মাতুব্বর উপলব্ধি করলেন কায়েমী স্বার্থ রক্ষার্থে ভোগবাদী লোকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং কায়েমী স্বার্থ রক্ষার্থে অদৃষ্টবাদের ভূমিকা অত্যন্ত প্রকট। তাঁদের প্রতিবাদ ছিল অদৃষ্টবাদ বর্জনের লক্ষ্যে এবং অদৃষ্টবাদ বর্জনের মাধ্যমেই তাঁরা ভাল-মন্দ নির্বাচন করার ক্ষমতায় উপর আস্থা রেখেছেন। বেগম রোকেয়া এবং আরজ আলী মাতুব্বর উভয়ই নিজের চেষ্টায় জ্ঞানীগুণী হয়ে উঠেছেন। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন। ফলে কায়েমী স্বার্থের বিরোধী হওয়া তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ ছিল আরজ আলী মাতুব্বরের আত্মার আত্মীয়। কারণ তিনি নিজেও ছিলেন একজন কৃষক। তবে তিনি তাঁদের দলবদ্ধ করে শ্রেণী সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল বিজ্ঞান ভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি তত্ত্ব, বংশগতি, সভ্যতার গতি ও বিকাশ এবং বিভিন্ন ধর্মের মতবাদ। আরজ আলী মাতুব্বরও বেগম রোকেয়ার মতো, লেখনীর মাধ্যমে মতবিরোধীদের সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত ছিলেন। জনগণের সাথে সরাসরি কথোপকথনের প্রয়োজন ছিল – কিন্তু তা আরম্ভ করেই বিপদগ্রস্ত হন,ভোগ করতে হয় হাজতবাস। ফলে তাঁর কথোপকথন কলমের বন্ধনেই আবদ্ধ করেন। মাতুব্বর বিভিন্ন ধর্মের মতামত আলোচনা করে চার্বাক মতবাদকেই বিজ্ঞান ভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য মনে করেন।তিনি বলেন : "বস্তুত চার্বাকীয় মতবাদ ছিল অভিজ্ঞতাভিত্তিক, যাহা পরবর্তীকালে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভিত্তিরূপে স্বীকৃত।"[৫৪] তিনি আরো বলেন : বর্তমান জগতের বিশেষত বিজ্ঞান জগতের অনেকেই বাহ্যত না হইলেও কার্যত চার্বাকীয় মতবাদের অনুসারী।[৫৫] তিনি ভোগবাদী ছিলেন না। অর্থের পিছনে তিনি কখনো ধাবিত হননি।

বেগম রোকেয়া এবং আরজ আলী মাতুব্বর উভয়ের লক্ষ্য ছিল মানুষকে আত্মসচেতন করা। রোকেয়ার লক্ষ্য ছিল নারীর জীবন স্ব-নিয়ন্ত্রিত করা। তিনি লক্ষ করলেন, শিশুর ন্যায় নারীজাতি অন্য লোকের মুখে ধর্মের ব্যাখ্যা শোনে এবং বিশ্বাস করে। অবাস্তব ও কল্পিত জুজুর ভয়ে যেমন শিশুরা ভীত হয়, নারীও পাপাচার করে নরকে যাবার ভয়ে ভীত হয়।[৫৬] আরজ আলী মাতুব্বরও সমাজে প্রচলিত অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার কথা বলেন। মাতুব্বর বলেন, শুধু নারী নয়, ষাট বছর বয়সের পুরুষেরাও শিশু সমতুল্য থাকতে পারে। তারা বিশ্বাস করে – শ্মশানে ভূত ও গোরস্তানে শয়তান থাকে।[৫৭] বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও মুক্তচিন্তার শক্তির মাধ্যমেই একমাত্র বদ্ধমূল বিশ্বাস বর্জন করা সম্ভব। মাতুব্বর বলেন, কুসংস্কারই হলো মানুষের রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের অন্তরায়। অনেক ক্ষেত্রে মানসিক বৈকল্যের কারণ হিসেবে জিন-পরীর কার্যকলাপকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু আরজ আলী মাতুব্বরের মতে, এসব রোগের চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক উপায়ে করা যায়।[৫৮] তিনি নারী জাতির প্রতি ছিলেন খুবই সংবেদনশীল। তিনি স্ত্রী-পুরুষের ভূমিকাকে কখনও পৃথক করে দেখেননি এবং সেভাবে শ্রম বিভাজনের নীতি গ্রহণ করেননি। তাঁত বোনা, রন্ধন ও অন্যান্য গৃহস্থালির কাজ তিনি নিজ হাতে করতেন। তিনি উল্লেখ করেন, কৃষি কাজের সূচনা নারীর হাতেই হয়েছে। তাঁর ভাষায় :

448528

> আদিম কালের মেয়েদের হাতেই প্রবর্তন হইল গম ও বার্লির চাষ অর্থাৎ কৃষিকাজের সূচনা। বস্তুত পৃথিবীতে কৃষিকাজের প্রবর্তন করিয়াই নারীরা, যীশুখ্রীষ্ট জন্মিবার প্রায় সাড়ে চারি হাজার বৎসর আগে।[৫৯]

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন অত্যন্ত মাতৃভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর মাকে **অত্যন্ত** শ্রদ্ধা করতেন তাঁর ভাষায়, "আমার মা ছিলেন অতিশয় নামাজী কালামী ধার্মিকা রমনী।"[৬৩] সাধারণ লোকের মাঝে তিনি ধর্মপরায়ণতা এবং কর্তব্য পরায়ণতা লক্ষ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি রোকেয়ার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। বেগম রোকেয়া ও আরজ আলী মাতুব্বর দু'জনেই তাঁদের সমাজের সময়ের স্রোতে একাকী অন্ধকার পথে অনেক নিন্দা গ্লানি, বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে পথ চলেছেন। অকারণে তাঁদের বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁরা দমে যাননি বা বিচলিত হননি। বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন ছিল মুসলিম নারী সমাজের সংস্কারসাধন করা। তাই তিনি বলেন, "শুধু পুথিগত বিদ্যাই নয়, বালিকাদিগকে নানাভাবে দেশ ও জাতির সেবা ও পরোপকার ব্রতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাও আমাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।"[৬১]

কারণ নারী জাতিকেও বুঝতে হবে যে, সামাজিক ন্যায়বিচার সমাজের বিত্তশালী লোকের ক্ষমতা ও আইন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আরজ আলী মাতুব্বরও উপলব্ধি করেছিলেন সমাজে শ্রমিক অপেক্ষা মালিকদের মর্যাদা বেশি। তিনি বিপদের ঝুঁকি নিয়েও নিজস্ব চিন্তা, পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে পারায় তাঁর মনের ক্ষোভ কিছুটা লাঘব হয়। সৃষ্টির প্রতি মাতুব্বরের ছিল অসীম শ্রদ্ধাবোধ। সৃষ্টির নিয়মকে তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরের রহস্য নির্মূল হচ্ছে। তিনি বলেন, সামাজিক নিয়মকানুন তৈরি হয় ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে। যারা সুবিচার পায় না তাদেরকেও তিনি নিজ কর্ম দিয়ে মঙ্গলজনক কাজ করার কথা বলেন। তিনি তাঁর 'ত্যাগ' কবিতায় বলেন :

বংশের মঙ্গল হেতু কড়ি কর দান,
গ্রামের মঙ্গল হেতু দাও যশ-মান,
সর্বস্ব করিবে ত্যাগ দেশের কারণ,
জগতের জন্য কর মৃত্যুকে বরণ।[৬২]

এভাবে তাঁর ভাষায় প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্গসুখ পৃথিবীতে ভোগ করা যায়, সুবিচার না পেলেও পরার্থে ত্যাগের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা যায়। যে কোনো মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি, সাধ আছে, কিন্তু সাধ্য নেই। কিন্তু কল্যাণমুখী কাজের জন্য ক্ষুদ্র শক্তিই যথেষ্ট। মরণোত্তর চক্ষুদান করে এবং নিজ মরদেহ বরিশাল মেডিকেল কলেজকে উৎসর্গ করে তিনি অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বেগম রোকেয়াও পরিপূর্ণ ইতিহাস চেতনা নিয়ে জাতির বৃহত্তর কল্যাণ স্বার্থে নারী সমাজকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অবরোধের অভিশাপ থেকে উদ্ধারের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও জাগরণের বাণী নিয়ে এসেছিলেন। সমাজের নাগরিক কুপ্রথা ও কূপমন্ডূকতার বিরুদ্ধে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। নারী পুরুষকে সমাজের দু'টি চক্ষু হিসেবে বিবেচনা করে

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের কল্যাণকে জীবনের মূল ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে রোকেয়া পরহিতে আত্মত্যাগের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, "আত্মত্যাগের শিক্ষা রমণীরা গৃহে বসে লাভ করে। কাহারও আত্মত্যাগ কেবল গৃহজীবনে সীমাবদ্ধ থাকে। কাহারও আত্মত্যাগ সংসারময় ব্যাপ্ত থাকে।"[৬৩]

নারী সমাজের কল্যাণার্থে বেগম রোকেয়ার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন স্টেটসম্যান পত্রিকা মন্তব্য করেছিল "She devoted her life and all the resources to the cause of education for girls" অর্থাৎ নারী শিক্ষার জন্য তিনি তার সমগ্র জীবন ও সব সম্পদ উৎসর্গ করেছিলেন। সামাজিক কূপমন্ডূকতার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজ কল্যাণের স্বপ্ন তাঁকে সংগ্রামে প্ররোচিত করেছিল। সে সংগ্রামের পরিনামে রক্ষনশীলতার পরাজয় ঘটেছে, এটাই তাঁর স্বার্থকতার চরম নিদর্শন।[৬৪] দেখা যায় আরজ আলী মাতুব্বরের সেই 'ত্যাগ' কবিতায় তাঁর জীবনেও সদা একই বাণী উচ্চারিত।

আরজ আলী মাতুব্বর সভ্যতার ইতিহাস তুলে ধরে ধর্মীয় মতবাদের বিবর্তনের কথা বলেছেন। রোকেয়া সভ্যতার ইতিহাসে নারী পুরুষের সম্পর্ক পরিবর্তনের মাধ্যমে নারী জাতির উত্থানের কথা বলেছেন। কারণ নারীজাতি পুরুষদের কাছে বন্দী। পাশ্চাত্যের অধিবাসী ঈশ্বরকে হারিয়েছে ভোগবাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের মধ্যে। রোকেয়া বলেন- ধর্ম সাধনের নিমিত্ত শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন কারণ-"কে বে-ইল্‌মে নাতওয়া খোদারা শেনাখত"[৬৫] অর্থাৎ জ্ঞান না হলে ঈশ্বরকে চেনা যায় না। মাতুব্বরও জ্ঞানের মাধ্যমে ঈশ্বরকে চিনতে চেয়েছেন। মাতুব্বর রোকেয়ার মতোই ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা উভয়েই নিজ নিজ জ্ঞানের আলোকে পরমেশ্বর বা আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। কেবলমাত্র শক্তিবান ও ক্ষমতাশীলরা পৃথিবীকে ভোগদখল করবে – তাঁরা এ ধরনের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। হিংসা দ্বেষ, প্রতিযোগিতা নয় – সহযোগিতার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও বিশ্বসমাজকে বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে মুক্তিবুদ্ধির এই দু'দার্শনিকের চেষ্টা ছিল অত্যন্তবলিষ্ঠ। বেগম রোকেয়া ও আরজ আলী মাতুব্বর নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য, ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। মাতুব্বর আর একটি কথা যোগ করেছেন –"সব মানুষ এক মানবতার ছায়াতলে শান্তিলাভ করতে পারে। বিশ্বব্যাপী একটি ধর্ম থাকবে যার নাম মানবধর্ম। শক্তিহীন মানুষ সেখানে পদানত থাকবে না কারণ দুর্বল, বিকলাঙ্গ, অন্ধ সব একই স্রষ্টার সৃষ্টি।"[৬৬]

সব মানুষের মনেই কিছু মৌলিক প্রশ্ন জাগে যেমন কেন তাঁর সৃষ্টি, কোথা থেকে সৃষ্টি ইত্যাদি। রোকেয়া যদিও এসব প্রশ্ন করেননি। রোকেয়ার অকাল মৃত্যু এবং ক্ষমতাহীনদের চক্রান্তে মাতুব্বরের জীবন থেকে বিশটি বছর ঝরে পড়ায় এ দু'জন দার্শনিকের নিঃস্বার্থ আত্মপ্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে:

Dhaka University Institutional Repository

যার ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে। মাতুব্বর আশা করেন, মানবতার ধর্ম হয়ে উঠবে একদিন বিশ্ববাসীর ধর্ম এবং একটি বিশ্বপরিবার গড়ে উঠবে তারই ভিত্তিতে। কিন্তু কিভাবে গড়ে উঠবে তার দায়িত্ব দিয়েছেন বুদ্ধিজীবীদের উপর।[৬৭] বেগম রোকেয়া ও আরজ আলী মাতুব্বর উভয়েই মনে করেন যে, যে ধর্মের মৌলিক প্রশ্নের উত্তর সর্বক্ষেত্রে যাচাইযোগ্য নয়, অনুমান ভিত্তিক সে ধর্মই স্পষ্টবাদিতার জন্য মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্জন করবে।

আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের যাকিছু অশুভ অমঙ্গল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। তবে নিজের একক চেষ্টায় মানুষের কল্যাণের জন্য যা করেছেন সেটাও একটা বিশাল প্রতিবাদ । যে মানুষ জগৎ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত তীক্ষ্ণ-প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে পারেন এবং যার চিন্তার স্বচ্ছতা সব কিছুকে কাটিয়ে উঠতে পারে সে মানুষই তো মৌলিক। তিনি যে পরিবেশে যেভাবে নিজেকে প্রস্ফুটিত করেছেন, বিস্তৃত করেছেন সেটা বুদ্ধিদীপ্ত মহলের সকলের কাছেই বিস্ময়কর। বিশ্বব্যাপী চলছে সবকিছুরই পরিবর্তন, চলছে সামাজিক পরিবর্তন। আর এ পরিবর্তনকে সফল করতে হলে প্রয়োজন যুক্তি এবং আদর্শ যা সকল নারীপুরুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকলেও থাকা উচিত। আর এ প্রচ্ছন্নতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার আলোকবর্তিকা, যা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি বেগম রোকেয়া ও আরজ আলী মাতুব্বরের মধ্যে। এই দুই দার্শনিকের জীবন কর্ম সীমিত হলেও তাঁদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সৃষ্টির দিশা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি মুক্ত থাকা, ইহজাগতিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও গণসম্পৃক্ততা। বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা সমস্যার প্রেক্ষিতে তত্ত্ব চর্চা, বিনয়, শিক্ষাগ্রহণে অকুণ্ঠ হওয়া, প্রচলিত বিশ্বাসকে প্রশ্নাতীতভাবে মেনে না নেওয়া, সহজবোধ্যতা ইত্যাদি নানা দিক থেকে আরজ আলী অনুসরণীয়। তাহলেই আশা করতে পারি আগামী দিনের দর্শন এবং বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ অগ্রগতি হবে, উপকৃত হবে সমাজ তথা বিশ্ব।

Dhaka University Institutional Repository

২.২. আরজ আলী মাতুব্বর ও মানবেন্দ্রনাথ রায়

দর্শনের ইতিহাসে মানবতাবাদের ধারণা অতি প্রাচীন। প্রাচীন গ্রীক দর্শন ছাড়াও এদেশের বৈষ্ণব ও দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনায় মানবতার পরিচয় পাওয়া যায়। মানবতাবাদের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ। সমাজ জীবনের যাবতীয় বিষয়ের বিচার বিবেচনায় মানুষের শক্তি, সত্তা ও গুণসমূহ প্রাধান্য পায়। তবে মানবতাবাদের দু'টি ধারা যেমন নিরীশ্বরবাদ ও ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকবাদ দীর্ঘকাল থেকেই চলে আসছে। নিরীশ্বরবাদী মানবতাবাদ অনুসারে মানুষ স্বয়ং সম্পূর্ণ, মানুষই সবকিছুর বিচার বিবেচনার মাপকাঠি, নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা এবং ভালোমন্দের উৎস। অপর দিকে আধ্যাত্মিক মানবতাবাদীরা মানবাতীত এক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে নেয় আর মানুষ ও বিশ্বরূপ হলো সেই শক্তির অংশ। আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের সমর্থকদের মধ্যে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আর নিরীশ্বরবাদী বা বস্তুবাদী মানবতাবাদীর হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭ খ্রি.-১৯৫৪ খ্রি.)। কেবলমাত্র মানবেন্দ্রনাথই এদেশে আধুনিককালে মানবতাবাদকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে দেখেছেন। বাঙালির চিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী ও মানবতাবাদী ধারার যে ক্রমিক বিবর্তন ঘটেছে তারই ধারাবাহিকতায় বিশ শতকে আবির্ভাব ঘটে আরজ আলী মাতুব্বর ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো খ্যাতিসম্পন্ন জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত বরেণ্য দুই মহাপুরুষের। তাঁদের মানবতাবাদের মূলে রয়েছে আত্মশক্তি, কর্মশক্তি ও বস্তুজ্ঞানের সমন্বিতরূপ। মানবেন্দ্রনাথ রায় যিনি ইতিহাসে এম. এন. রায় নামে খ্যাত এবং আরজ আলী মাতুব্বর উভয়েই ছিলেন দার্শনিক ও কর্মযোগী। তাদের একমাত্র বিশ্বাস ছিল যে, সকল রকম কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে না পারলে মানুষ কখনও প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না । এ কারণেই তাঁরা সকল রকম সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা হয়ত উপলব্ধি করেছিলেন যে, ১৯৪৭ সালের পর এই উপমহাদেশের মানুষ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে রাজনৈতিকভাবে মুক্ত হলেও, আঞ্চলিকতা অগণিত মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে রেখেছে। বিশেষ করে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে এখনও অধিকাংশ মানুষ আবদ্ধ। এ দুই দার্শনিকের মানবতাবাদী দর্শন আমাদের প্রকৃত মুক্তির সন্ধান দিতে পারে, যদি সে দর্শন সত্যিকারার্থে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। এ দুই দার্শনিকই সমাজে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন , এ জন্য তাদেরকে বিপ্লবী দার্শনিক এবং দার্শনিক বিপ্লবী বলে আখ্যায়িত করা যায়। তাঁরা সমাজের স্রোতের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। বাঙালি চিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষ, বস্তুবাদী ও মানবতাবাদী মনোভিত্তির যে ক্রমিক বিবর্তন তারই ধারাবাহিকতায় বিশ শতকে আবির্ভাব ঘটে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় সামাজিক মুক্তিযুদ্ধের

Dhaka University Institutional Repository

একজন অংশীদার ছিলেন।[৫]... ভারতের এনার্কো ন্যাশনালিস্ট আন্দোলনের নেতা এবং বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সাম্যবাদী বিপ্লবের অংশীদার ছিলেন। তিনি কিশোর বয়সে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবনদানের প্রতিজ্ঞা করে আত্ম-নিবেদন করেন।[৬৮] মানবেন্দ্রনাথ কৈশোর থেকেই নিপীড়িত মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও শোষণ-পীড়ন মুক্ত করার লক্ষ্যে নিবেদিত ছিলেন। তাঁর নিজের উক্তি থেকে জানা যায়:

> আমার বয়স যখন চৌদ্দ – স্কুলে পড়ি, তখন থেকেই আমার রাজনৈতিক জীবনের শুরু। তখন থেকেই আমি মুক্তির সন্ধানে ঘুরছি। হয়তো জীবনটা বৃথাই কেটে যেত, কিছুই মিলত না, তথাপি সেদিন আমার আকুতির অন্ত ছিল না। একান্তভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পাবার দুর্বপ্রেরণাই তখন আমাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। সেদিনের বিপ্লবীরা এইরূপ সর্বাঙ্গীণ মুক্তির কামনাই করত। আমার রাজনৈতিক জীবন এই প্রেরণা থেকেই শুরু।[৬৯]

মানবেন্দ্রনাথ মুক্তির সন্ধানেই বিভিন্ন দেশে ঘুরে সেখানকার সমাজপতি ও রাষ্ট্রনায়কদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান এবং এভাবেই এক পর্যায়ে দীক্ষা নেন মার্কসবাদে, তৎপর হয়ে ওঠেন এ-মতের অনুশীলন ও প্রচারে। মানবেন্দ্রনাথ মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন অনেক আশা-ভরসা নিয়ে, মানবমুক্তির উপায়ানুসন্ধানের আন্তরিক প্রয়াসে। কিন্তু কম্যুনিজম ও মার্কসবাদের খাতায় নাম লিখালেও এই মতবাদ, বিশেষ করে রুশ কম্যুনিস্টদের আধিপত্যমূলক কর্মকাণ্ডকে তিনি কখনও নির্বিচারে গ্রহণ করতে পারেননি। আর তা যে নয়, এ বিষয়টাই স্পষ্ট হয়ে যায় *Politics, Power and Parties* (১৯৬২) নামক তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থের উক্তিতে : "I have never been an orthodox marxist."[৭০] অর্থাৎ আমি কখনো একজন গোঁড়া মার্কসবাদী ছিলাম না। *Scientific Politics* (১৯৪২) গ্রন্থের মুখবন্ধে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে এম.এন. রায় বলেন, "বস্তুগত প্রকৃতি, সামাজিক বিবর্তন, রেনেসাঁসের শিক্ষা, ব্যক্তিমানুষের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভবের সমন্বয়ে এক মতবাদরূপে মার্কসবাদকে আমি দেখতে চেষ্টা করছি। কিন্তু ফলিত কম্যুনিজম[৭১]-এ আমার দেখা মার্কসবাদের অস্তিত্ব অদৃশ্য হয়ে গেছে।"[৭২]

আনুষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ না করেও কেবল নিজের সাধনায় যে একজন মননশীল লেখক ও যুক্তিবাদী দার্শনিক হওয়া যায়, তারই এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থাপন করেছিলেন বরিশালের লামচরি গ্রামের এক গরিব গৃহস্থ আরজ আলী মাতুব্বর। পাঠশালার যৎসামান্য লেখাপড়াকে সম্বল করে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন জগত ও জীবন সম্পর্কে তাঁর অদম্য কৌতূহল এবং সেই সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন এক যুক্তিবাদী জীবনদর্শন। প্রাণঘাতী বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তিনি লড়াই

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধকুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন জগত ও জীবন বিষয়ক দার্শনিক অভিমত।

আধুনিক বাঙালি জীবনে যে নবজাগরণের প্রেরণা এবং উনিশ শতকে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রমুখের চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে যার ব্যাপক চিন্তা, তারই সার্থকরূপ লাভ করেছে মানবেন্দ্রনাথের কর্মধারায়। ১৯৪৭ সালে নব্য মানবতাবাদ-এর ইস্তাহারে মানবেন্দ্রনাথ বলেন, তাঁর এই মতবাদ কোনো অন্ধবিশ্বাস বা গোঁড়ামির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যুক্তি ও নীতি হলো এ মতবাদের ভিত্তি আর বিপর্যস্ত মানুষকে শৃঙ্খলমুক্ত ও স্বাধীন করা এর লক্ষ্য। এ মতবাদে ব্যক্তি মস্তিষ্কই চিন্তার হাতিয়ার আর ব্যক্তিমাত্র এই হাতিয়ারের মালিক। ব্যক্তিই মানুষের মৌলিক স্তর। ব্যক্তি থেকেই প্রগতির যাত্রা শুরু। ব্যক্তি বিকাশ ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের মধ্য দিয়েই সত্যতাকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মানুষ মাত্রেই উচিত প্রত্যেককে তার অন্তর্নিহিত যুক্তিশীলতা সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন করে তোলা এবং এক বিশ্বজনীন মুক্ত সমাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় উদ্বুদ্ধ করা। মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে মানবেন্দ্রনাথের মূল আপত্তি ছিল এই যে, তাঁরা ব্যক্তির অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে সমাজই প্রধান এবং ব্যক্তি হলো সমাজের নিছক একটি অংশ মাত্র। মানবেন্দ্রনাথের মতে, কম্যুনিস্টদের এ ধারণা মার্কসবাদের মূলমর্ম ও খোদ মার্কসের ঘোষণা ও ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী।[৭৩] মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে মানুষমাত্রই অফুরন্ত শক্তি ও সম্ভাবনার অধিকারী। জীবজগতে মানুষের স্থান অনন্য। তাঁর মতে, একজন র‍্যাডিকেল হিউম্যানিস্ট শুধুমাত্র এক বিশেষ জাতি বা শ্রেণীকে নিয়ে ব্যস্ত নয়; তিনি সকল ব্যক্তির স্বাধীনতা অর্জনেও বিশ্বাসী।[৭৪] ব্যক্তির জন্য নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে পরিহার করেন। তিনি মনে করেন, ধর্ম ব্যক্তিকে অতিপ্রাকৃতিক কোনো সত্তার অধীন করে রাখে যা মানবতাবাদের মূলনীতির বিরোধী। একজন নাস্তিক হিসেবে তিনি মনে করতেন যে, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সর্বক্ষমতাবান স্রষ্টা – এ দুয়ের মধ্যে অসমাঞ্জস্যতা বিদ্যমান।[৭৫]

আরজ আলী মাতুব্বরও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে গ্রহণ করতে পারেননি। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও অলৌকিকতার বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছেন তিনি। সমাজের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সচেষ্ট থেকেছেন সত্যানুসন্ধানে। মানবেন্দ্রনাথের মতো তিনিও প্রচলিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে আঘাত করেছেন, চলমান পথকে তিনি প্রায়ই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতেও জীবজগতে মানুষের স্থানই প্রাধান্য পেয়েছে। মানুষমাত্রেই অফুরন্ত শক্তি ও সম্ভাবনার অধিকারী। সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং মানবিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি গতানুগতিক ধর্মীয়-আচারের সমালোচনা করে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদের সমর্থন করেন। তিনি যুক্তির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য,

Dhaka University Institutional Repository

শোষণ ও বঞ্চনার করুণ চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কিছু লোক মহাউল্লাসে অন্ধ ও মূর্খের রক্ত শুষে নিচ্ছে। আরজ আলী প্রতিবাদ ছিল এ সব অক্ষমদের জন্য। তাই বোধকরি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এ বাণী তিনি মরমে উপলব্ধি করেছিলেন:

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্তশুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'এবার ফিরাও মোরে'

রবীন্দ্রনাথের মতো আরজ আলীও মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি অতিপ্রাকৃত উপায়ে কোনো প্রাকৃতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে অপারগ ছিলেন। তিনি এতই বাস্তববাদী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন যে, বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে ভাববাদ ও রহস্যবাদের প্রতি তিনি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। বিজ্ঞান মানুষকে অতীন্দ্রিয় চিন্তার আধিপত্য ও আধ্যাত্মিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে মানুষের কুসংস্কার ও ভ্রান্তিনিরসন করেছে এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের ও সৃজনশীলতার সমুদয় বাধা অপসারিত করেছে। মানবেন্দ্রনাথ ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও উদারপন্থী আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তিনি মার্কসবাদ, উদারপন্থী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে বুর্জোয়া মনোভাব বলে বর্জন করেন। মানবেন্দ্রনাথের মতে নীতিতত্ত্বের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে মার্কসের যথোচিত জ্ঞানের অভাব ছিল। সারা বিশ্বেই নৈতিক ধারা নিম্নখাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তি এই অনভিপ্রেত ও নৈরাশ্যজনক অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছে। বিশ্বের মনীষীরা কামনা করছেন স্থায়ী ও কল্যাণকর পরিবেশ। ভারতে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ আধ্যাত্মিক পথে শুভ শক্তির উত্থান চেয়েছেন। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানের উদগাতা। তিনি আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক পথ পরিহার করার পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি চেয়েছেন মানুষ বিজ্ঞানের আশ্রয়ে যুক্তিমুখী নীতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করুক। আধ্যাত্মিকতাবিহীন এবং স্বভাবগত যুক্তিবোধসাপেক্ষ নীতিতত্ত্বের ওপর মানবেন্দ্রনাথের দর্শন প্রতিষ্ঠিত।[৭৬]

আরজ আলী মাতুব্বর যদিও বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানের উদগাতা নয় তবুও তিনি দর্শন-বিজ্ঞানের বাস্তব বাদী-যুক্তিবাদী ঐতিহ্যেরই সার্থক উত্তরাধিকারী। তিনি দুঃখের সাথে লক্ষ করেন যে, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগেও কুসংস্কার নানাভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে মানুষের জীবনকে বিশেষত অনুন্নত দেশসমূহে। আমাদের দেশেও প্রচলিত রয়েছে নানা রকম কুসংস্কার যার ফলে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতির ধারা। এ কথা অনুধাবন করেই আরজ আলী মাতুব্বর তৎপর হয়েছিলেন ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

পৌত্তলিকসহ বিভিন্ন কুসংস্কারের মূলে আঘাত হানতে, যথার্থ ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তির ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। তাই তিনি বলেন :

> আধুনিক মানুষ চায় কুসংস্কার থেকে মুক্তি, চায় সত্যের সন্ধান। ধর্মের সঙ্গে কমবেশি কুসংস্কার যুক্ত থাকে। আর মানুষ মাত্রই যেহেতু প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কুসংস্কারের সঙ্গে যুক্ত, সুতরাং এমন মানুষ পাওয়া কঠিন যাকে কুসংস্কার স্পর্শ করেনি। যেমন বৈদিক-পারসিক-ইহুদী প্রভৃতি ধর্মে বহু দেব-দেবীর, দৈত্য-দানবের ওপর মানুষের আস্থা ছিল, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এগুলো নিতান্তই কাল্পনিক বলে প্রমানিত হয়েছে।[১৭]

আরজ আলী মাতুব্বরও আধ্যাত্মিবাদ ও অলৌকিকবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায় এ উক্তিতে:

> হিন্দুমতে লক্ষ্মীদেবী সম্পদ বিতরণের মালিক। তাই তাঁহার পূজা করিলে তিনি প্রসন্না হইয়া তাঁহার ভক্তকে বেশি পরমাণ ধন-রত্ন দান করেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া হিন্দুগণ লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে চারিআনা পয়সা খরচ করিয়া লক্ষ্মীদেবীর প্রতিমাকে কিনিতে না পারিয়া কেষ্টসাধু (লেখকের প্রতিবেশী) ছেলেবেলা হইতেই কলাগাছের লক্ষ্মী সাজাইয়া তাঁর পূজা করিতে আরম্ভ করিল, আর তার এখন পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও কলাগাছ ছাড়িয়া প্রতিমা কিনিবার তওফিক হইল না। অথচ আমেরিকার ফোর্ডসাহেব (Henry Ford) লক্ষ্মীপূজা না করিয়াও সারা পৃথিবীর মধ্যে ধনী হইলেন।[১৮]

আরজ আলী মাতুব্বর জগৎ, জীবন, দর্শন, বিজ্ঞান সমাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সবক্ষেত্রেই তিনি কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠে নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ মননশীলতার আরো পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে :

> হিন্দুধর্মের ... অনুষ্ঠান সরস্বতী পূজা। তিনি নাকি মানুষের বিদ্যাদাত্রী দেবী। তাঁহার পূজা করিলে তিনি সদয় হইয়া তাঁহার ভক্তকে অসীম বিদ্যা দান করেন। অথচ দেখা যাইতেছে যে, সাত বৎসর পর্যন্তসরস্বতী দেবীর পূজা দিয়াও গোপাল চাঁদ (লেখকের প্রতিবেশী) বর্ণমালা আয়ত্ত করিতে পারিল না, আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরস্বতী পূজা না দিয়াও কবিসম্রাট হইলেন।[১৯]

মার্কসবাদী ব্যক্তি বিশেষত রুশ কম্যুনিস্টরা ব্যক্তির অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। তাঁরা ব্যক্তিকে সমাজের অংশ হিসেবে এবং পুরোপুরি সমাজনির্ভর হিসেবে দেখেন, এভাবে তারা সমাজের ওপর একচ্ছত্র গুরুত্ব আরোপ করেন। এ কারণে মানবেন্দ্রনাথ মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

মানবেন্দ্রনাথের মতে, কমুনিস্টদের এ-ধারণা মার্কসবাদের মূলমন্ত্র ও খোদ মার্কসের ঘোষণা ও ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী। মার্কস সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, ব্যক্তিমানুষই মানবজাতির উৎস। ব্যক্তির অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারিত করে। মানুষ নিজেই তার জগতের সবকিছু। মানুষ একটি চিন্তাশীল সত্তা, আর সে তার এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে রক্ষা করতে পারে একজন আত্মসচেতন স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে; নিষ্প্রাণ সমাজের ক্রীড়নক বা হাতের পুতুল হিসেবে নয়। ব্যক্তিমাত্রই আত্মসচেতন ও স্বাধীন। কোনো নিষ্প্রাণ অচেতন যন্ত্রের চাকার দাঁতবিশেষ নয়।[৮০]

মানবেন্দ্রনাথের এ-কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় প্রখ্যাত অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্র (১৯০৫ খ্রি.-১৯৮০ খ্রি.)-এর কথায়। মানবেন্দ্রনাথ যেখানে বলেন মানুষ কোনো নিষ্প্রাণ অচেতনযন্ত্রের চাকার দাঁতবিশেষ নয়, বরং পুরোপুরি আত্মসচেতন ও স্বাধীন। সেখানে সার্ত্র 'মানুষ' শব্দটির সঙ্গে যে জিনিষটি বিশেষভাবে যুক্ত করেছেন, তা-হলো তাঁর (ব্যক্তির) অস্তিত্ব। এই অস্তিত্বই ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্বের মূল নির্যাস বা বিশেষ প্রতীকস্বরূপ। ব্যক্তিই নিয়ত তাঁর কর্মপন্থা নির্বাচন করবে এবং বেঁচে থাকার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করবে। ভালো-মন্দ কর্মপন্থা নির্বাচন এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে ব্যক্তি নিজেই। সার্ত্রের মতে স্বাধীন ব্যক্তির সমস্যা এত বেশি থাকে, যাতে পৃথিবীটা তাঁর কাছে একটা মস্তবড় বোঝা বলে মনে হয়। তবে এ বোঝা যত ভারীই হোক না কেন, মানব পরিস্থিতি যতই ভয়ঙ্কর ও বিষাদময় মনে হোক ব্যক্তিকে তা মোকাবিলা করতে হবে সাহসিকতা এবং একাগ্রতার সঙ্গে। কারণ মানুষমাত্রই অফুরন্তশক্তি ও সম্ভাবনার অধিকারী।[৮১]

আরজ আলী মাতুব্বরও – মানবেন্দ্রনাথ রায় ও মার্কসের মতো আত্মসচেতন স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার পথিকৃৎ। মানুষকে মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে এবং প্রথাগত সমাজের বিপরীতে তিনি এক সৃষ্টিশীল ঐতিহ্য। আরজ আলী মাতুব্বর মানুষের অস্তিত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে বিমূর্ত চিন্তাশক্তির উপর আদৌ গুরুত্ব আরোপ করেননি। মানবেন্দ্রনাথ ও সার্ত্রের মতো তিনিও মানুষের অবস্থা, অবস্থান, উদ্দেশ্য ও মনোভাব প্রভৃতি ব্যবহারিক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে আপন অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস ও বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষকে পরিবর্তনশীল জগতের দ্বন্দ্বময় বা অসুন্দর পরিবেশ থেকে মুক্ত করে এক সুন্দর জীবনের সন্ধান দিয়েছেন; যেখানে নিহিত সত্যের সন্ধান এবং যা মানবিক মূল্যবোধের কথা বলে। যে পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণ চিন্তা-জগতের স্থূলতা, জড়তা ও কুসংস্কারকে দূরীভূত করে একটা চিরন্তন জ্ঞানের আলো মানবমনে জ্বেলে দিয়ে মানব দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিমুখী করে তুলতে সাহায্য করে। একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসেবে তিনি বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

> বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে, একই বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচার করে গেছেন মনীষীরা, যাতে সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত, সত্যাসত্য নির্ণয় করা হয় দুরুহ। কিন্তু একই বিষয়ে মতবাদের সংখ্যা যতটাই হোক না কেন, উহার মধ্যে সত্য কিন্তু একটাই। মানুষ চায় সেই "এক" এর সন্ধান। অর্থাৎ 'সত্যের সন্ধান' সেই একের সন্ধান করতে গিয়ে আমার মনে উদয় হচ্ছে কতগুলো প্রশ্ন। কিন্তু তাতে শান্তিপাই নাই। কেননা শান্তি প্রশ্নে থাকে না, থাকে উত্তরে। অর্থাৎ প্রশ্নে থাকে উৎকণ্ঠা, উত্তরে স্বস্তি।[৮২]

দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের রচনা শৈলীর পেছনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর বিস্ময়, সংশয় ও কৌতূহলবোধসহ অনুসন্ধিৎসু ও বিচার বিবেচনার দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর লেখনীতে আছে ভাবাবেগ বহির্ভূত প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত যুক্তিনির্ভর অনুসন্ধিৎসা; রয়েছে সামগ্রিক জগৎ ও জীবনের মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা। তাঁর রচনা সামগ্রী পর্যালোচনা করলে পাওয়া যাবে কল্যাণকামী দর্শনসহ বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক জ্ঞান। যদিও তাঁর লেখনীতে দর্শনের কোনো মৌলিক সূত্র আবিষ্কারের সাহায্য করে না তবুও মানবতাবাদী কল্যাণকামী দর্শনের প্রচুর উপকরণ পাওয়া যাবে।

প্রাচীনকাল থেকে দর্শনে ভাববাদী ও বস্তুবাদী[৮৩] দুটি বিপরীত ধারা বিদ্যমান। মানবেন্দ্রনাথের মতে বস্তুবাদ হলো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ দর্শন। তাঁর মতে বস্তুবাদ যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের সাহায্যে এককভাবেই চলতে পারে। কোনো বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। তিনি বস্তুবাদের উল্লিখিত শ্রেণী দু'টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। নিউটনের ধ্রুপদী Mechanistic[৮৪] প্রত্যয়কে তিনি বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে নাকচ করেছেন। তার মতে জৈবিক বিবর্তনের ধারায় মানুষের যুক্তিবোধ নিয়মনিয়ন্ত্রিত জগতের একটি অংশ। জগতের সব ক্ষেত্রে নিয়মনিয়ন্ত্রণ একটি সাধারণ ব্যাপার। তাই জাগতিক সব কিছুর পেছনে একটি শৃঙ্খলাবোধ আছে। মানুষকে যুক্তিশীল বলার অর্থ হলো মানুষের সব আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়।

সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ভাব ও চিন্তার ভূমিকাকে যথোপোযুক্ত স্থান দেবার জন্য বস্তুবাদকে তিনি নিয়মনিয়ন্ত্রিত জগতের ধারণার সাহায্যে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অতীন্দ্রিয় ভাববাদকে তিনি পরিত্যাগ করেছেন। লোকদার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরও স্পষ্টতই বাস্তব বাদী এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী। একই কারণে তিনি ভাববাদ ও রহস্যবাদের প্রতি অনাস্থাশীল। তাঁর মতে মানুষের জীবনে এমন কোনো বিষয় নেই যে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের অবদান নেই। বিজ্ঞানীদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যের উদ্‌ঘাটন তথা মানবকল্যাণ সাধন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

> বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ এবং যুক্তিবাদেরও। বিজ্ঞান পৃথিবীর বুকে আত্মশক্তি বা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, কাহারো অনুকম্পায় নয়। ... মানবজীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞানের দান অনস্বীকার্য। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন হইতে শুরু করিয়া দেশলাই ও সূচ-সুতা পর্যন্তসবই বিজ্ঞানের দান। বিজ্ঞানের কোন দান গ্রহণ না করিয়া মানুষের এক মুহূর্তও চলে না। মানুষ বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। কিন্তু সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা হাতে ঘড়ি ও চক্ষে চশমা আটিয়া মাইকে বক্তৃতা করেন আর 'বস্তুবাদ' বলিয়া বিজ্ঞানকে ঘৃণা ও 'বস্তুবাদী' বলিয়া বিজ্ঞানীদের অবজ্ঞা করেন। অথচ তাহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ভাববাদীরা বস্তুবাদীদের পোষ্য। বিজ্ঞান মানুষকে পালন করে। ... বর্তমান যুগে বিজ্ঞানবিরোধী কোন শিক্ষাই গ্রহণীয় নয়।[৮৫]

বর্তমান যুগে মানবসমাজের এক বিরাট এলাকা অধিকার করিয়া আছে ধর্মীয় মতবাদ তথা ভাববাদ। কিন্তু উহার সংঘাত চলিতেছে বস্তুবাদের সঙ্গে অহরহ। ভাববাদী তপস্বীগণ যোগাসনে বসিয়া মুদ্রিত নয়নে পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন থাকেন আত্মতৃপ্তির জন্য। "... আর বস্তুবাদী তপস্বী (বিজ্ঞানী) গণ ... ছুটিয়া চলেন আকাশে পাতালে, দেশ-দেশান্তরে, পর্যবেক্ষণ করেন বিশ্বের বৃহত্তম নক্ষত্র-নীহারিকা হইতে ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু পর্যন্তমানবকল্যাণের জন্য। ... 'খাদ্য সমস্যার সমাধান কী?' – এইরূপ প্রশ্ন হইলে ভাববাদীগণ বলেন– 'জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।' কিন্তু বস্তুবাদীরা চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না, চালাইয়া থাকেন 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযান; করেন বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি। রোগাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে ভাববাদীগণ বলেন – 'ঐসব ইচ্ছা মায়ের ইচ্ছা, ইহার প্রতিকারের জন্য তাঁহার কাছে প্রার্থনা করাই উত্তম।' কিন্তু ইহার জন্য বস্তুবাদীগণ করেন নানাবিধ ঔষধ আবিষ্কার, নির্মাণ করেন নানারূপ যন্ত্রপাতি, স্থাপন করেন নানাবিধ চিকিৎসালয়।"[৮৬]

আরজ আলী মাতুব্বর ও মানবেন্দ্রনাথ উভয়েই যুক্তিবান এবং তর্কপ্রিয় ছিলেন। মননশীল, বিজ্ঞান-দর্শনে কৌতূহলী, ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে অনুরাগী, উদার মানবতন্ত্রী এবং প্রগতিতে আস্থাবান ছিলেন এ দুই মহামনীষী। মানুষের ক্রমবর্ধমান অসহায়তা ও নৈরাশ্যজনিত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে উভয় দার্শনিক জীবনব্যাপী প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের এই চিন্তা ও প্রয়াস কখনো ভাববাদী নয়, বস্তুনির্ভর। মানবেন্দ্রনাথ জীবনের প্রায় দু'টি দশক মার্কসীয় আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সংগ্রামে কাটিয়েও যেমন তিনি তার পুনর্মূল্যায়ন করেছেন, অন্যদিকে তেমনি অনুধাবন করেছেন ক্ষমতার প্রভাবমুক্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল্য। তাঁর মতে, মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তার উন্নত ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য। একটি সুন্দর ও সুস্থির জনজীবনের জন্য তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবদানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই যে, তিনি মানুষের জৈববৃত্তি ও

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক শক্তিকে অস্বীকার করেননি।[১৭] বরং মানুষের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছেন। নিঃসন্দেহে মানবেন্দ্রনাথ, রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২ খ্রি. - ১৮৩৩ খ্রি.) ও রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১ খ্রি.-১৯৪১ খ্রি.)-এর যোগ্য উত্তরপুরুষ। পূর্বসূরিদের মানবতাবাদী চিন্তায় যেখানে আধ্যাত্মিকতা বিরাজমান, সেখানে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তায় বস্তুবাদ বিরাজমান। সৌরেন্দ্রমোহ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়:

> রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে মানবতন্ত্রী নবজাগরণের ধারা বয়ে এসেছে তার চরিত্র মূলত আধ্যাত্মিক। পরবর্তীকালে মানবতাবাদকে সর্বাংশে ইহমুখীন এবং নিখাদ বস্তুবাদী ব্যঞ্জনা দিয়েছেন মানবেন্দ্রনাথ। ... রাম-মোহনের আরোহী বিচারপদ্ধতি, যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও বিশ্বজনীনতা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে মানবেন্দ্রনাথের বস্তুবাদী দর্শনে।[১৮]

মানবেন্দ্রনাথ দর্শনের বিশেষত্ব এই যে, কোনো বিশেষ মতবাদে তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি অভিজ্ঞতাসিদ্ধ যুক্তির আলোকে চিন্তার বিবর্তনের ধারায় নিজেকে পুর্নগঠিত করেছেন। সকল প্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয়শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তিই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। মানুষকে তাঁর অন্তর্নিহিত যুক্তিশীলতা সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছেন এবং এক বিশ্বজনীন মুক্ত সমাজে ব্যক্তি নিজের সঙ্গে অন্যের ঐক্য স্থাপন করুক এটাই ছিল তাঁর কাম্য। মানবেন্দ্রনাথ সকল মনুষ্যধর্মের উপর আস্থা রেখেছেন। প্রত্যেকের উৎকর্ষের সম্ভাবনা ও যোগ্যতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

আরজ আলী মাতুব্বর সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত অথচ অমীমাংসিত বিষয়ের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে তা প্রকাশের ভাষা খুঁজেছেন বাস্তব তার নিরিখে, তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এদিক থেকে বিচার করলে আরজ আলী মাতুব্বরকে বস্তুবাদী দার্শনিক না বলে উপায় নেই। আরজ আলী মাতুব্বর মানুষকে ইন্ধন যুগিয়েছেন তাঁর চেতনাশক্তিকে জাগ্রত করতে মুক্তচিন্তনের দিক নির্দেশনায়। যুক্তি দিয়েছেন প্রাকৃতিক ঘটনাবলির গতি প্রকৃতির লক্ষ্যে ব্যক্তির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্যে। তিনি প্রমাণ করেছেন সব অস্তিত্বশীল বস্তুই দর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু নয় বরং মানবজীবনই হল দর্শনের মূল আলোচ্যসূচী। এভাবে আরজ আলী মাতুব্বরের বিভিন্ন রচনাসমগ্রকে পর্যালোচনা করলে পাওয়া যাবে কল্যাণকামী দর্শনসহ তাঁর বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক জ্ঞান। যে কারণে অতি যুক্তিসংঙ্গভাবেই তাকে মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন প্রজ্ঞানুরাগী ও জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয়শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তি কামনা করেছেন। তিনি এক বিশ্বজনীন মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বর যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রগতিশীল দার্শনিক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ মানবপ্রেমিক। তাঁর কাছে মানুষের কল্যাণই মুখ্য। এ সম্পর্কে তিনি 'অনুমান' গ্রন্থে বলেছেন, 'কোনো মানুষের অকল্যাণ আমার কাম্য নয় এবং তা করিও না।'[৮৯] *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থে তিনি বলেছেন :

> মানবতার মাপকাঠিতে মানুষ একে অন্যের ভাই, ভালবাসার পাত্র দয়া-মায়ার যোগ্য, সুখ-দুঃখের ভাগী; এক কথায় একান্তই আপন। কিন্তু ধর্মে বানাইল পর।[৯০]

আরজ আলী মাতুব্বর মানব জীবনের সর্বত্রই বিজ্ঞানের অবদান অবলোকন করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, মানবকল্যাণই হলো বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। মানবতাবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজসহ প্রায় সর্বত্রই সমাদৃত। তাই তিনি অনুধাবন করেন মানবতাবাদ সব ধর্মে শুধু স্বীকৃতই নয়, একান্তপালনীয় বিধান। তাই মানবেন্দ্রনাথের মতো আরজ আলী মাতুব্বরও সকল মনুষ্যধর্মের উপর আস্থা রেখে এক ঐক্য স্থাপনের কথা বলেছেন এভাবে :

> যদিও এ কথা স্বীকৃত হয়ে থাকে যে, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ এমনকি জল, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদিরও এক একটি ধর্ম আছে, তথাচ বিশ্বমানবের ধর্ম বলাম 'মানবধর্ম' বলে একটা আন্তর্জাতিক ধর্মকে স্বীকার করা হয় না। আচার, অনুষ্ঠান, প্রার্থনা পদ্ধতি ইত্যাদি এমন কোনো বিষয় নেই, যাতে সকল ধর্ম এক মত পোষণ করে। কিন্তু মানবতা? মানবতাবর্জিত কোনো ধর্ম পৃথিবীতে নেই। আর্তের সেবা, দুস্থের প্রতি দয়া, অহিংসা, পরোপকার ইত্যাদি সব ধর্মে শুধু স্বীকৃতই নয়, একান্ত পালনীয় বিধান। সুতরাং সব ধর্মের স্বীকৃত যে মতবাদ, অর্থাৎ মানবতাবাদই হওয়া উচিত মানুষের আন্তর্জাতিক ধর্ম বলাম মানবধর্ম।[৯১]

মানবেন্দ্রনাথ রায় স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন ভারতের অগ্রগতির পূর্বশর্ত হলো সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা অনেক হিন্দু নেতাই বলেছেন। মহাত্মা গান্ধী সারাজীবন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত একজন ধর্মান্ধ হিন্দু ঘাতকের হাতে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন। তবে মানবেন্দ্রনাথ রায় গান্ধীজির মতো বিভিন্ন ধর্মের অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামির সহঅবস্থানের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য স্থাপন করা যায় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ পরস্পরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে মুক্তমন নিয়ে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে সমঝোতার ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন দৃঢ় করা সম্ভব।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বরও উপলব্ধি করেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন যুক্তিভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং তা হবে দেশের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও অলৌকিকতার বিরুদ্ধে। আরজ আলী মাতুব্বর যুক্তিবাদী মানুষ। তাঁর *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থের অপর নাম দিয়েছেন যুক্তিবাদ, তাঁর মতে সত্যকে জানতে পারলে আর কোনো প্রশ্ন থাকে না। তাই তিনি বলেছেন:

> কোন বিষয় বা কোন ঘটনা একাধিকরূপে সত্য হইতে পারে না। একটি ঘটনা যখন দুই রকম বর্ণিত হয়, তখন হয়ত উহার কোন একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা অথবা উভয়ই সমরূপ মিথ্যা; উভয়ই যুগপৎ সত্য হইতে পারে না। হয়ত সত্য অজ্ঞতাই থাকিয়া যায়।[৯৩]

এভাবে তিনি সমাজে মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও প্রগতির সপক্ষে যুক্তি দেন। সমাজ থেকে তিনি অতিপ্রাকৃত সত্তার দূরীভূত করার চেষ্টা করেন। তিনি রহস্যবাদ ও ভাববাদকে খণ্ডন করেন এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলেন, উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করা। তবে আরজ আলী মাতুব্বর মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মত রাজনৈতিক চিন্তা করেননি।

মানবেন্দ্রনাথ রায় উপমহাদেশের বুদ্ধিযুক্তির ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে একজন অনন্যসাধারণ মানুষ। তবে রাজনীতিতে তাঁর কখনো কোনো ব্যাক্তিগত প্রত্যাশা ছিল না। ক্ষমতা অধিকারের জন্য তিনি কখনো রাজনীতি করেননি। তিনি বুদ্ধির সাহায্যে যুক্তি এবং বিবেচনার দায়ভাগে রাজনৈতিক সত্যকে নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় তিনি তাঁর সময়ের সকল মানুষের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষণে ছিলেন অকুতোভয় এবং সাম্প্রদায়িক চিন্তামুক্ত মানুষ হিসেবে সকলের কাছে সমভাবে শ্রদ্ধেয়।[৯৪]

আরজ আলী মাতুব্বর কৃষক সমাজের নিজস্ব সৃষ্টি। এটা তার গুণ এবং একই সাথে আছে সীমাবদ্ধতা। মানবেন্দ্রনাথের মতো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত প্রত্যাশা ছিল না। তিনি কোনো রাজনীতি করেননি। তবে মানব মুক্তির জন্য তিনি সমাজতন্ত্রকে বেছে নিয়েছিলেন। গণবিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী সমাজের একজন নন বলে তিনি খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন, গ্রহণ করতে পেরেছিলেন সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে। তাই তিনি বলেন:

> সমাজের (মধ্যকার) ... আর্থিক বৈষম্য দূর করে সমতা আনয়নের মধ্যেই রয়েছে বিশ্বমানবের কল্যাণ নিহিত। আর এই বৈষম্য রোধ ও সমতা আনয়নের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে 'সমাজতন্ত্র'। তাই 'সমাজতন্ত্র' তথা 'সাম্যবাদ' হচ্ছে বিশ্ব মানবের মঙ্গল বিধানের একমাত্র মাধ্যম।[৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বরের পক্ষে এই সিদ্ধান্তের কারণ ছিল প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চা এবং অন্ধত্ব ও কুসংস্কারমুক্ত থাকার স্বাভাবিক পরিণতি। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দর্শনের মূল কথা হলো ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তোলা এক কথায় বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদ। এবং তা সম্ভব ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে যে বাধা থাকে তা অতিক্রমের মাধ্যমে। যেমন মানুষ তাঁর জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করতে পারে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো যা ব্যক্তিত্বের বিকাশের বাধাস্বরূপ- তা অতিক্রম করা সম্ভব, রাষ্টের উপর ব্যক্তির কর্তৃত্ব আরোপ করে। এর পরে মানুষের ভেতরের বাধা– অর্থাৎ মানুষের মনে ভালো-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদি যে দ্বন্দ্ব আছে তা যদি সুসংহত না হয়, সুশৃঙ্খলভাবে না চলে তাহলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তাঁর মানবতাবাদী আন্দোলন, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক। নব্যমানবতাবাদ অনুসারে এক কথায় বলা যায় যে নিজেকে শিক্ষিত, সংস্কৃত, অনুশীলিত বিদগ্ধ ও বিকশিত করে তোলার সাধনা।[৯৬]

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে, ব্যক্তি মানুষই সব কিছুর মানদণ্ড। মুক্তিকামী নীতিনিষ্ঠ মানুষের সমবায় বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের আদর্শই হলো 'নয়া মানবতাবাদ'। নয়া মানবতাবাদ আন্দোলনের লক্ষ্য হলো, ক্ষমতা দখল নয় বরং বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে নতুন সমাজ তৈরি করে নতুন আদর্শবাদী মানুষ তৈরি করা। তাঁর মতে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব না করেও উন্নত ও সকল মানুষের কল্যাণকর মুক্ত মানুষের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে তখনই, যখন জনসাধারণের মধ্যে সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ করবে। এ সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি হবে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে। ব্যক্তিই হবে সমাজের আদর্শ।

আরজ আলী মাতুব্বর কুসংস্কারমুক্ত, বাস্তব বাদী. বিজ্ঞানমনস্ক, প্রগতিশীল দার্শনিক। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো তিনি কুসংস্কার ও অন্ধগোঁড়ামি দূর করার জন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছিলেন, কারণ বিজ্ঞানই দিতে পারে সঠিক ও নির্ভুল পন্থা। বদরুদ্দীন উমরের ভাষায়:

> ... তিনি এমন একজন দার্শনিক যিনি নিজের স্বকীয় প্রতিভা বলে নিজের চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেনই, সেই সঙ্গে তিনি খুব সহজ ও বৈজ্ঞানিকভাবে নিজের চিন্তাধারাকে নিজের রচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করে অন্যদেরকে কুসংস্কারমুক্ত হতে সাহায্য করতেন।[৯৭]

আরজ আলী মাতুব্বর বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে সমাজ গঠনের কথা বলেছেন। তিনিও ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করাকে পছন্দ করেননি বরং ব্যক্তি মর্যাদায় গুরুত্ব দিয়েছেন। বিজ্ঞাননির্ভর সত্যানুসন্ধান হলো একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া যাতে নিরত থাকলে, মন কখনো শূন্যতায় ভোগে না। কারণ বিজ্ঞানের সত্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হতে পারে, কিন্তু একেবারে বাতিল হতে পারে না। নিউটনের জীবনে যেমন গাছ থেকে আপেলের পতন এক নিগূঢ় তত্ত্বের দিগন্ত উন্মোচন করেছিল, কৈশোরের আরজ আলী মাতুব্বরের মায়ের মৃত্যুও একইভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং তীব্র অনুসন্ধিৎসার সূচনা করেছিল। মৃত্যুর শোকাবহ ঘটনা তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য তৈরি করেনি বরং উদগ্র করেছিল আদর্শ জীবন যাপনের বাসনা। যে অন্ধত্ব এবং গোঁড়ামি মৃত্যুকে সম্মান করে না, জীবনকে বলদৃপ্ত হতে দেয় না, তাঁর সঙ্গে তিনি অজ্ঞান অন্ধকারের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই অন্ধত্ব আর গোঁড়ামির অন্ধকার থেকে আলোকিত পথে উত্তরণের জন্য শিক্ষাকে তিনি অপরিহার্য পাথেয় হিসাবে মনে করেছেন। তিনি জগৎ, জীবন, দর্শন, বিজ্ঞান সমাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন, সারাজীবন সত্যানুসন্ধান করেছেন। সত্যানুসন্ধানে পিছপা হননি কখনো। তিনি কোনো আপোসকামিতাকে প্রশ্রয় দেননি। যা বলেছেন, যা ভেবেছেন, যা স্থির করেছেন তা শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, নিজের জীবনে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এভাবে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

মানবেন্দ্রনাথ রায় মার্কসবাদ থেকে নব্য মানবতাবাদে সরে এসেছেন এবং এ ব্যাপারে সূত্র উপস্থাপন করেছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বর অবশ্য সরাসরি নব্য মানবতাবাদ সম্পর্কে কিছু বলেননি। কিন্তু তিনি এক আন্তর্জাতিক মানবতাবাদের কথা বলেছেন। উভয় দার্শনিকই ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ সাধনের কথা বলেন। এম. এন. রায়ের মতে "সমাজের উন্নতি, কল্যাণ ও অগ্রগতি যদি সত্যিকারের হয় তাহলেই তা ব্যক্তির সম্ভোগে লাগে। ... মানবের অগ্রগতির মূল প্রেরণা হলো মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সত্যানুসন্ধিৎসা।"[৯৮] আরজ আলী মাতুব্বর আজীবন সত্যের সন্ধানে লড়াই করেছেন। তাঁদের উভয়ের মতে, "সত্য হচ্ছে, মুক্তির পথে চলার জন্য যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই বিষয়বস্তু।"[৯৯] তাই সত্যের জন্য মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই হবে অনুসিদ্ধান্ত। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে নব্য-মানবতাবাদ গতি বিজ্ঞানের বিষয়। তিনি যেমন রহস্যবাদের উপর প্রশ্ন করেছেন অর্থাৎ সমাজের আদর্শ যদি ব্যক্তি মানুষের কল্যাণসাধন হয় এবং সমাজের উন্নতি বলতে যদি ব্যক্তিসমূহের উন্নতি বুঝায়– তাহলে এই উন্নতির প্রেরণার উৎস হিসাবে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মকেই অভিহিত করেছেন।[১০০] আরজ আলী মাতুব্বরও রহস্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, বিশেষ করে:

> মার মৃত্যুর ঘটনা তার মনে ভয়ানক আলোড়ন তোলে। তিনি হয়ে ওঠেন দ্রোহী, সামাজিক সংস্কার, যুক্তি, বুদ্ধিহীনতার বিরুদ্ধে আপনার চিন্তা-চেতনাকে সংহত করে জিজ্ঞাসা জাল বিস্তার ঘটাতে থাকেন। জিজ্ঞাসায় জর্জরিত করতে থাকেন সমাজে চলমান সনাতনী মূল্যবোধকে। আমৃত্যু এই প্রক্রিয়ায় মগ্ন থেকে মুক্তবুদ্ধি, মুক্তচিন্তা চর্চার এক অনন্য সাধারণ বিরল দিগন্ত উন্মোচন করে গেছেন আরজ আলী মাতুব্বর।[১০১]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে দেখা যায় মানবেন্দ্রনাথ রায় ও আরজ আলী মাতুব্বর উভয়ই ছিলেন বিকশিত ব্যক্তিত্বের মডেল। যুক্তিবাদী চিন্তার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের উন্নততম ফল হচ্ছে তাদের চিন্তাধারা। তাঁরা রেখে গেছেন উন্নত মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথ-নির্দেশ ও আদর্শ। মানব উজ্জীবনের পথিকৃৎ, মানব মুক্তির সাধনায় সমর্পিত প্রাণ, নতুন এক সমাজ বিধান নির্মাতা। এই ভয়ঙ্কর মানুষ দু'টি বিশ শতকের রাজনৈতিক মঞ্চে যে অসাধারণ আত্মপ্রকাশ করেছেন তা অবশ্যই অনন্য।

জৈবিক বিবর্তনের ধারায় মানুষের যুক্তিবোধ নিয়মনিয়ন্ত্রিত জগতের একটি অংশ। জগতের সব ক্ষেত্রে নিয়ম নিয়ন্ত্রণ একটি সাধারণ ব্যাপার। তাই জাগতিক সব কিছুর পিছনে একটা শৃঙ্খলা বোধ আছে। মানুষকে যুক্তিশীল বলার অর্থ হলো মানুষের সব আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়। এ কারণেই দুই দার্শনিক সর্বক্ষেত্রে যুক্তির আশ্রয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করেছেন, কারণ যুক্তির সঙ্গেই নৈতিকতার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। মানবেন্দ্রনাথ রায় সর্বার্থে বস্তুবাদকে একটি দর্শন হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে দর্শন বলতে বস্তুবাদকেই বোঝায় - কারণ দর্শন বিজ্ঞানের নিষ্কর্ষ।[১০২] আরজ আলী মাতুব্বরও প্রকৃতিবাদ বা বস্তুবাদে বিশ্বাসী। তিনি সবকিছু যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। নিজস্ব মতবিরুদ্ধ কোনো ব্যাপারে উত্তেজিত না হয়ে যুক্তি সহকারে অন্যের মত খণ্ডন করতেন এবং অন্যের যুক্তিপূর্ণ মত সহজে গ্রহণ করতেন।

মানবতাবাদের দর্শন অতি প্রাচীন। মানবতাবাদ হলো এমন এক বিশেষ মনোভঙ্গি যাতে সমাজ জীবনের যাবতীয় বিষয়ের বিচার-বিবেচনায় মানুষকেই করা হয় কেন্দ্রবিন্দু; মানুষের শক্তি, সত্তা ও গুণসমূহের প্রাধান্য পায়। এই দুই দার্শনিকের অর্জিত অনন্য অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের চূড়ান্ত পরিণতিই হলো মানবতাবাদ। মানবেন্দ্রনাথ লক্ষ করেন যে, ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে মানুষকে নিয়ে; রচিত হয়েছে উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক, মার্কসবাদী , ফ্যাসিবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ। কিন্তু এ সবেরই ফল ব্যক্তি মানুষের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ তিনি দলমত নির্বিশেষে একমত, এক আদর্শে বিশ্বাসী। তাহলেই বিশ্বের মানুষ এক শক্তি পতাকাতলে থাকতে পারবে। অপরদিকে আরজ আলী মাতুব্বর লক্ষ করেন যে:

> সম্প্রদায় বিশেষে ভুক্ত থাকিয়া মানুষ মানুষকে এত অধিক ঘৃণা করে যে, তদ্রূপ কোন ইতর প্রাণীকেও করে না। হিন্দুদের নিকট গোময় (গোবর) পবিত্র অথচ অহিন্দু মাত্রেই অপবিত্র। পক্ষান্তরে, মুসলমানের নিকট কুকুরের বিষ্ঠা পাক, অথচ অমুসলমান মাত্রেই নাপাক।[১০৩]

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর গভীর উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ করেন, ধর্মের নামে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন জাতি এবং তারা একে অপরের দুশমনস্বরূপ। এভাবে ধর্মের নামে মানুষ মানুষের ব্যক্তি মর্যাদায় আঘাত হানে। এসব দেখে আরজ আলী প্রশ্ন করেন, "এই কি মানুষের ধর্ম? ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা?"[১০৪] এইভাবে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ নিপতিত হলো এক মহাসঙ্কটে। এ সঙ্কটের কারণ বিশ্লেষণ এবং এ থেকে পথ উত্তরণের অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন এ দুই দার্শনিক। তাঁরা প্রমাণ করলেন ব্যক্তির জন্যই সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি। সমাজ বা ধর্মের জন্য ব্যক্তি নয় অর্থাৎ ব্যক্তিই সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। তাঁদের দর্শনে মানুষের লালিত্য প্রাচীন ধ্যানধারণা পরিশোধিত হয়ে মানব সভ্যতার মূল্যবান ভাব ও ভাবনাকে সংশ্লেষণ করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক নতুন মতবাদ গড়ে তোলেন; যাকে মৌলিক মানবতাবাদ হিসেবে অভিহিত করা যায়। অবশ্য মানবেন্দ্রনাথ রায় শুরুতেই বাইশটি সূত্রের[১০৫] মাধ্যমে নব্যমানবতাবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বর অবশ্য কোনো সূত্র আরোপ না করলেও তাঁর চিন্তা চেতনায় নব্য মানবতাবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মানবেন্দ্রনাথ রায় যেমন বলেছিলেন যে, "একজন র‍্যাডিকেল হিউম্যানিস্ট শুধুমাত্র এক বিশেষ জাতি বা শ্রেণীকে নিয়ে ব্যস্ত নয়; সকল ব্যক্তির স্বাধীনতা অর্জনেও বিশ্বাসী।"[১০৬] আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনেও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের এই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আবার মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো তিনিও বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানের উপর সার্বিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তাঁদের উভয়ের দর্শনে প্রোটোগোরাসের উক্তি "মানুষই সব কিছুর মাপকাঠী"– এ কথা প্রতিফলিত। কোনো ঐশী সত্তার স্বীকৃতি নেই। আধ্যাত্মিক মতবাদে মানুষকে বিমূর্ত কল্পনার মহত্ত্ব দান করে। অপরদিকে বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদে প্রাকৃতিক বিবর্তনের অংশ হিসাবে জৈব দৃষ্টিতে মানুষ বিবেচিত হয়েছে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দর্শন সম্পূর্ণরূপে মানুষের জ্ঞান ও গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর দর্শন একদিকে বস্তুবাদী ও অন্যদিকে গতিসম্পন্ন। মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর দর্শনে পার্থক্যের চিহ্ন হিসাবে 'নতুন' (New) কথাটি যুক্ত করেছেন এই বলে যে, তাতে মানুষকে নতুনভাবে দেখা হয়েছে– যে দেখার পিছনে আছে ইতিহাস আছে বিজ্ঞানের মনোভাব।[১০৭] মানবেন্দ্রনাথ মানবতাবাদে সার্বভৌম মানুষের জয়গান গেয়েছেন। মানুষের সেই মৌল সত্তা হরণ করার কোন অধিকার সমাজের নেই। এ হলো সামাজিক ও জৈববিবর্তন সম্পৃক্ত মানবমনের চরমোৎকর্ষের উপাদান।[১০৮] এভাবে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো আরজ আলী মাতুব্বরও দাবি করেছেন বিশ্বভ্রাতৃত্ব। এজন্য আরজ আলীর দর্শন মানবজাতিকে নব্যমানবতাবাদী দর্শনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ নব্যমানবতাবাদের আদর্শ বিশ্বজনীন। নব্য মানবতাবাদ মুক্ত ও মিত্রতাবদ্ধ বৈশ্বিক সংঘের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। আর আরজ আলী মাতুব্বরও সমগ্র বিশ্বকে এক মানবতাবাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ দেখতে চেয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর যদিও নব্যমানবতাবাদের কোনো সূত্র আরোপ করেননি। তবে তিনি যে মুক্তবুদ্ধি ও মিত্রতাবদ্ধ বিশ্বের কথা বলে গেছেন তাতে নব্যমানবতাবাদের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কারণ তিনি নিজেও ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব না করে সমষ্টির, প্রগতির ও প্রাচুর্যের সপক্ষে কথা বলেছেন। মানবেন্দ্রনাথ যেমন, তাঁর (বিভিন্ন সূত্রে) বলেছেন মানুষই সমাজের মূল আদর্শ। ব্যক্তির বিকাশই সমাজ প্রগতির একমাত্র মাপকাঠি। ব্যক্তিমানুষের কল্যাণের মধ্যেই সমষ্টির কল্যাণ নিহিত। আরজ আলী মাতুব্বরও এভাবে ব্যক্তিসত্তার মর্যাদার কথা বলেছেন।

'মানুষ সবকিছুর পরিমাপক' (প্রোটাগোরাস) অথবা 'মানুষই মানবজাতির মূল' এই আপ্তবাক্যকে কেন্দ্র করে আরজ আলী মাতুব্বর ও মানবেন্দ্রনাথ রায় মুক্তবুদ্ধি, নীতিনিষ্ঠ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় মুক্তমানুষের সমবায়ে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সমবায়ী রাষ্ট্ররূপে জগতকে দেখতে চেয়েছেন। চিন্তাশীল মানুষই হচ্ছে এই জগতের স্রষ্টা। স্বাধীনতার বৈপ্লবিক দর্শনের কাজ হচ্ছে এ ঐতিহাসিক সত্যটির গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা। কারণ, মানুষ যদি নিজেদের সৃষ্টি ক্ষমতায় সচেতন হতে পারে, চিন্তাক্ষেত্রে নতুন নতুন অভিযানে অনুপ্রাণিত হয়, নতুন জগত গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয়ের আশা পোষণ করে এবং স্বাধীন মানুষ নিয়ে এক স্বাধীন জগত গড়ে তোলার বিশ্বাসে ক্রমাগত মানুষের সংখ্যা বাড়ে – তা'হলেই তৈরি হবে স্বাধীন সমাজ গঠনের অনুকূল পরিবেশ। একমাত্র ক্ষমতাবান মুক্তবুদ্ধির মানুষের পক্ষে সম্ভব গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে সকলের জন্য স্বাধীনতা আনা।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩. আরজ আলী মাতুব্বর ও কাজী নজরুল ইসলামের মানবতাবাদ

যথার্থ দর্শন হলো প্রত্যক্ষিত কোনো কিছুর যৌক্তিক মূল্যায়ন, কোন কিছুকে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তার গুণাগুণ বিচার বিশ্লেষণ। দর্শন হলো যা বিচার বিশ্লেষণের পর সঠিক, যৌক্তিক ও শ্রদ্ধেয় বলে বিবেচিত হয় তাকে গ্রহণ করা; অপর দিকে যা অন্যায়, অশুভ ও হেয়প্রতিপন্ন হয় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং সেই সঙ্গে তাকে বাতিল করার মানসিকতা থাকতে হবে। ব্যবহারিক অর্থেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানগুরু সক্রেটিস পরিচিতি অর্জন করেছিলেন মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে। অন্যায়ের সাথে আপোস করেননি তিনি কখনো যার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদজ্ঞাপন করেছিলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে ন্যায় অন্যায় সত্য সুন্দরের বাণী প্রচারের কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপিত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল। অতঃপর ন্যায়-সত্য-সুন্দরের সংগ্রামসহ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা প্রত্যাহার করলে, তাকে বড় রকমের পুরস্কারের লোভ দেখানো হলেও তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেননি কখনো, বরং তিনি সজ্ঞানে অকাতরে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। আর এভাবেই আদৌ কোনো গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা না করেই আজীবন তিনি ন্যায় সত্য-সুন্দরের জয়গান করেছেন। ঐতিহাসিক দর্শনের যে মহৎ মানবিক জীবনের ধারা প্রবহমান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সক্রেটিস তাঁর বন্ধু ক্রিটোকে সম্বোধন করে উচ্চারিত এ বাণীর মাধ্যমে : " তুমি যদি সত্যেই মনে কর যে, দর্শন মানুষের অকল্যাণের হেতু, তা হলে এখনই দর্শননের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলো। আর আমার মতো তুমি ও যদি বিশ্বাস করো যে, দর্শনের, মূল লক্ষ্য মানবকল্যাণ, তা হলে অযৌক্তিক কুসংস্কার ছেড়ে দর্শনানুরাগী হও। আমরণ দর্শনের সেবা করে যাও।"[১০৯] জীবনের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক অত্যন্তঘনিষ্ঠ।

আরজ আলী মাতুব্বর ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ খ্রি. - ১৯৭৬ খ্রি.) দু'জনই বাংলাদেশে দার্শনিক হিসেবে সুপরিচিতি। একাডেমিক দার্শনিকদের নামের তালিকায় তাঁদের নাম নেই তবে ব্যাপক অর্থে চিন্তাশীল ব্যক্তিই একজন দার্শনিক। এ অর্থে তাঁদের নাম অবশ্যই দার্শনিকদের অঞ্চলে পরিমণ্ডিত। দর্শনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে মূলত দার্শনিকদের বিভিন্ন মত বাধা অবলম্বনে বহুধাবিভক্ত। তথাপি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, দর্শনের আছে একটি তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক। তাত্ত্বিক দিক নিয়ে বির্তক নানাভাবে বিভক্ত। তাই এ-দুই দার্শনিকের যে, প্রায়োগিক দিক রয়েছে, তার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখে আরজ আলী মাতুব্বর ও জীবনকেন্দ্রিক মানবতাবোধের দার্শনিক নজরুলের ওপর আলোকপাত করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

গতানুগতিক একাডেমিক দিক থেকে নয়, বরং দর্শনের জীবনকেন্দ্রিক ও ব্যঞ্জনার নিরিখেই বিচার করতে হবে আরজ আলী মাতুব্বর ও কাজী নজরুল ইসলামের মানবিক দিককে। দারিদ্র্যের কঠোরতা ও সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা কথা বলেছেন উৎপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামের লক্ষ্যে। সেকালে সক্রেটিস থেকে, শুরু করে একালের রাসেল সার্ত্রের মতো বিশ্বনন্দিত দার্শনিকদের মতোই তাঁরা লিখেছেন, লড়াই করেছেন মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে।

কাজী নজরুল ইসলামের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে। ১৯০৩ সালে গ্রাম্য মক্তবে লেখাপড়া শুরু করে ১৯০৯ সালে দশ বছর বয়সে নিম্নমাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেন। দারিদ্রের চাপে নজরুলকে এক বছর গ্রাম্য মক্তবে শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে হয়। এ ছাড়া অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে তাঁকে নিকটবর্তী গ্রামে মোল্লাগিরি করতে হয়। জীবনের তাগিদে তিনি মসজিদে ইমামতি করতেন এবং হাজী পালোয়ানের মাজার শরীফের খাদেম হিসেবে কাজ করতেন। এ ছাড়া অর্থোপার্জনের জন্য 'লেটো' দলে যোগদান করেন। নজরুলের বাল্যকাল সম্পর্কে আনোয়ারুল ইসলাম বলেন:

> বাড়ীর অবস্থা ভালো ছিল না তাই নজরুল এই সব 'লেটো'র দলে গান নাটক রচনা করে দিয়ে অর্থোপার্জন করতেন। তাঁর বয়স তখন ১২/১৩ বৎসর মাত্র অথচ এ সময়ে রচনা তাঁর এত ভালো লাগল যে তিনি ক্রমে নিসস্যা, চুরুলিয়া এবং রাখাখুড়া এই তিনটি লেটোদলের দলে নাটক রচনার ভার পেলেন। এই সময় তিনি কয়েকটি গ্রামে বড় বড় ঐতিহাসিক নাটক ও 'মেঘনাথ বধ' নামে একটি নাটক রচনা করেন।[১১০]

অপরদিকে আরজ আলী মাতুব্বর বরিশাল শহরের অদূরে লামচরি গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চার বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা গেলে খাজনার দায়ে কৃষিজমিটুকু নিলাম হয়ে যায়। ফলে শরীয়তী শিক্ষাদানের জন্য গ্রামের এক মুন্সি আব্দুল করিমের মক্তবে অবৈতনিকভাবে লেখাপড়া শিখেন। বই-শ্লেট কেনার কোনো সঙ্গতি না থাকায় সেখানে তালপাতা ও কলাপাতায় যথাক্রমে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ এবং বানান ফলা শিক্ষা গ্রহণ করেন। আরজ আলী মাতুব্বরের জন্য মুন্সি আবদুল করিমের মক্তব বন্ধ হয়ে গেলেও খুলে গেল পৃথিবীর পাঠশালা। বিশ্বশ্রুত কথাশিল্পী ম্যাক্সিম গোর্কী সমৃদ্ধ হয়েছিলেন যে পাঠশালায়। এর পর তাঁর বাকি জীবন লেখাপড়া হয়েছে পৃথিবীর পাঠশালায়। বরিশাল শহরে পরিচিতি ছাত্রদের পুরনো বই সংগ্রহ করে তিনি পড়তেন। বাংলা সাহিত্যের আদি উপাদান পুঁথি সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। *জয়গুন, সোনাভান, জঙ্গনামা, মোক্তল হোসেন* ইত্যাদি অনেকগুলি পুঁথি পড়েন তিনি।[১১১] ১৩২১ সালে আরজ আলী মাতুব্বরের

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেলে ১৩২৬ সালে পৈতৃক পেশা কৃষিকাজে নিযুক্ত হন। কৃষিকাজের ফাঁকে তিনি আমিনের কাজ বা ল্যান্ড সার্ভেয়ারের কাজ শেখেন।[১১২] সূক্ষ্মভাবে জমি মাপার কৃতিত্ব বরিশালের মানুষের মুখে মুখে তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং যারা তাঁর বিরোধিতা করেছেন তাঁরাও সঠিক মাপের কাজে মাতুব্বরকে ডেকেছেন। এভাবে আরজ আলী মাতুব্বর ও নজরুলের জীবন কেটেছে অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে।

বাঙালির গতানুগতিক জীবনধারা যতটা না বৈপ্লবিক মনোভাপন্ন তার চেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ। কারণ বাঙালির গতানুগতিক জীবনধারা রচিত এক শান্তসমাহিত প্রাকৃতিক পরিবেশে। বস্তুত নজরুলই বাঙালির গতানুগতিক জড়তা ও আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেলে বাঙালি জাতিকে সচল ও সক্রিয় করে তোলার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। নজরুলের মানসচিন্তা দারিদ্র্যের কঠোরতা, যুদ্ধের হিংস্রতা, বিদেশী শাসনের গ্লানি, বঙ্গভঙ্গ, খেলাফত আন্দোলন প্রভৃতি প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। অন্যায়, অত্যাচার, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কবি ছিলেন সোচ্চার। উৎপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য লিখেছেন ও লড়াই করেছেন। এখানে তাঁর সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে, বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসন শোষণে জর্জরিত একটি প্রাণস্পন্দনহীন জাতিকে তাঁর মোহনিদ্রা থেকে জাগাবার লক্ষ্যেই তিনি জয়গান করলেন, বিদ্রোহ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির। এভাবে বিদ্রোহের চেতনা ও অহমের সাধনার ক্ষেত্রে তিনি যে দৃষ্টান্তস্থাপন করলেন, তাতেই তিনি বাংলা সাহিত্যে হয়ে রইলেন অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ রোমান্টিক কবি প্রবরের আনন্দময় কাব্যধারার সঙ্গে এখানেই পার্থক্য বিদ্রোহী কবি নজরুলের দ্রোহ চেতনার।[১১৩] বস্তুত এই কবিতাটি নজরুলের জীবনও কবি মানসের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি। অনেকটা পারস্যের দার্শনিক আল গাজ্জালী (১০৫৮ খ্রি.-১১১১ খ্রি.) এবং ফরাসি দার্শনিক ভেকার্টের (১৫৯৬ খ্রি.-১৬৫০ খ্রি.) ন্যায় তিনি নতুন সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথমেই গ্রহণ করলেন প্রতিবাদ, সংশয় ও ধ্বংসকে এবং স্বাগত জানালেন সর্বাত্মক বিক্ষোভকে।[১১৪] তাইতো তিনি প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন:

আমি দুর্বার

আমি ভেঙে করি সব চুরমার,

আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,

আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।

বিদ্রোহী, 'অগ্নিবীণা'

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রতিবাদী ও নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমেই কবি বিশ্বের সকল মানব জাতিকে আত্মাশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান। গাজ্জালী ও ডেকার্ট যেমন সংশয় দিয়ে দর্শন শুরু করেছিলেন ঠিক তেমনি নজরুল এই নেতিবাচক ধ্বংসস্তূপের ওপরই গড়ে তুলতে চান তাঁর সৃষ্টির সৌধ। তাই তিনি জোর দেন অহংবোধ ও আত্মনিষ্ঠার ওপর। তাঁর ভাষায়:

> আমার কর্ণধার আমি, আমার পথ দেখাবে আমায় সত্য।...নিজেকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার বলে জানলে নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে।[১১৫]

নজরুল দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন যে, মানুষের নিজের উপর বিশ্বাস আনতে পারলে অর্থাৎ আত্মাশক্তিতে বলীয়ান হতে পারলে সে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম জীব হিসেবে নিজেকে অনুধাবন করতে পারবে। মানুষের অন্তরেই স্রষ্টার অধিষ্ঠান হয়। মানুষকে স্রষ্টার কাছাকাছি যেতে কোনো অনুমতি প্রয়োজন হয় না বরং স্বয়ং স্রষ্টাই এসে ধরা দেন মানুষের কাছে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির এই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে, নজরুল সসীম আমিকে অসীম আমি হিসেবে অবহিত করেন এবং অপার আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন:

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বর আমি চির-দুর্জয়,

বিদ্রোহী, 'অগ্নিবীণা'

নজরুল ইসলাম সসীম ও অসীম, শ্রষ্টা ও সৃষ্টি, খোদা ও বান্দার সম্পর্ক স্থাপন করেন ঠিক এভাবে:

আমার আপনায় চেয়ে আপন যোজন
খুঁজি তারে আমি আপনায়
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াসী বাসনায় –

আপনি-পিয়াসী, 'ছায়ানট'

কাজী নজরুল ইসলাম আত্মসত্তার শক্তি ও বিশ্বাসে যে কত বলীয়ান ছিলেন তা আরো স্পষ্টায়িত হয়েছে এভাবে:

> এখন সোজা এই বুঝেছি যে, আমি যা ভাল বুঝি, যা সত্য বুঝি, শুধু সেইটুকু প্রকাশ করব, বলে বেড়াব, তাতে লোকে নিন্দা যতই করুক, আমি আমার কাছে আর ছোট হয়ে থাকব না, আত্ম-প্রবঞ্চনা করে আর আত্মানির্যাতন ভোগ করব না।[১১৬]

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বরও নজরুলের মতো কুসংস্কারকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। যুক্তির নিরিখে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আলোকে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যুক্তির আলোকে বিশ্বের উৎপীড়িত মানবজাতিকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। অন্যায়, অত্যাচার, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। মায়ের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য মৃত দেহের মুখচ্ছবির প্রতিকৃতি ক্যামেরায় ধারণের বাসনা তাঁকে ধর্মীয় অন্ধত্ব কুসংস্কারের যে অন্ধকার অচলায়তনের মুখোমুখি করে দেয়; তার অভিঘাত ছিল নিষ্করুণ, শোকাবহ এবং বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার মতো। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তিনি দ্রোহী হয়ে উঠলেন। আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠলেন। ছবি তোলার কারণেই যখন উপস্থিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা জানাজা পড়তে অস্বীকার করে প্রস্থান করেন, তখনই উন্মোচিত হয় তাঁর কিশোর মনে ইহকাল এবং পরকাল সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসা। তাঁর মনের বিক্ষুব্ধতার কারণে তিনি আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করেন। ছবি তোলা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গর্হিত কাজ হয়; তা হলে তার জন্য দায়ী তো তিনি, তাঁর মা নন। কিন্তু তবু তাঁর মায়ের এ অবমাননা কেন? তাই মায়ের মরদেহ সামনে রেখেই আত্মসত্ত্বায় উদ্বুদ্ধ বিদ্রোহী আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারকেই দায়ী করেছেন। যুগ যুগ ধরে সমাজের লালিত্য অন্ধবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে বহু যুক্তিহীন সংস্কার সমাজে প্রচলিত আছে। এ অন্ধবিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই উপেক্ষিত হয় মানুষের মানবিক চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আন্তরিক ইচ্ছাসমূহ।

এই ঘটনার পর থেকেই আরজ আলী মাতুব্বরের মনে যে বোধের উন্মোচন ঘটে তা-ই ক্রমশ দৃঢ় থেকে দৃঢ় হতে থাকে। ফলে নিজেকে মনোনিবেশ করেন বুদ্ধিচর্চায়, বিশেষ করে ধর্মের সাথে যুক্ত উদ্ভট ও অলীক উপাদানগুলির মূলোৎপাটন করতে সচেষ্ট থেকেছেন আজীবন। ধর্মের নামে সমাজে প্রচলিত অন্ধ-বিশ্বাস, সংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি এগুলোর বিরুদ্ধে লেখনীর মাধ্যমে যুক্তিসিদ্ধতার পথ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হলেন মানুষকে। প্রতিবাদী মানোভাব প্রকাশের মাধ্যমেই আরজ আলী মাতুব্বর বিশ্বের মানবজাতিকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান। হাসনাত আবুল হাই এর ভাষায়:

> নিউটনের জীবনে যেমন গাছ থেকে আপেলের পতন এক নিগূঢ় তত্ত্বের দিগন্তউন্মোচিত করেছিল, কৈশোরে আরজ আলী মাতুব্বরের মাতার মৃত্যুও একইভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং তীব্র অনুসন্ধিৎসার সূচনা করেছিল। মৃত্যুর শোকাবহ ঘটনা তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করেনি শ্মশান বৈরাগ্য বরং উদগ্র করেছিল আদর্শ জীবন যাপনের বাসনা। যে অন্ধত্ব এবং গোঁড়ামি মৃত্যুকে সম্মান জানায় না, জীবনকে বলদৃপ্ত হতে দেয় না তার সঙ্গে তিনি অজ্ঞান অন্ধকারের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই অন্ধত্ব আর গোঁড়ামির অন্ধকার থেকে আলোকিত পথে উত্তরণের জন্য শিক্ষাকেই তিনি মনে করেছেন অপরিহার্য পাথেয় হিসেবে। আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনে এইভাবে মৃত্যুর শোকাবহ অনুভূতি

Dhaka University Institutional Repository

> কুসংস্কারের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা এবং সেই নর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তির জন্য শিক্ষার আলোক প্রাপ্তির অভীপ্সা এক সরল রেখায় অগ্রসর হয়েছে।[১১৭]

আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন যুক্তিবাদী মানুষ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম *সত্যের সন্ধান*। এর অপর নাম যুক্তিবাদ। তিনি প্রবলভাবে উপলব্ধি করতে চান সত্য কি, জানতে চান সত্যকে, সত্যকে জানতে পারলে আর প্রশ্ন থাকে না। আরজ আলীর মতে, কোনো বিষয় বা কোনো ঘটনা বিভিন্নভাবে সত্য হতে পারে না। কোনো একটি ঘটনা দুইভাবে বর্ণনা করলে তখন বর্ণিত ঘটনায় একটা সত্য এবং অপরটি মিথ্যা প্রমাণিত হতে হবে। অথবা উভয়ই একইভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে। উভয়ই একত্রে কখনো সত্য হতে পারে না – হয়ত সত্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়।[১১৮]

এভাবে আরজ আলী মাতুব্বর সবকিছু নিজের মনের ভেতরে নেড়ে দেখেছেন, উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। যুক্তিছাড়া কোনো কিছুকেই তিনি মেনে নেননি। হাসনাত আবদুল হাই আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে মন্তব্য করেন এভাবেঃ

> বিতর্কিত বিষয় কিংবা সংশয় জাগে এমন বিষয় নিয়ে মনের ভেতর আলোড়ন জাগাতে ভালোবেসেছেন তিনি। তারপর নিজের যুক্তি দিয়ে বক্তব্য তৈরি করে লিখেছেন। তাঁর সব লেখাই এই ভাবে হয়ে উঠেছে মননশীল এবং নৈয়ায়িকের মতো সুশৃঙ্খল। তাঁর চিন্তা চেতনায় আর লেখায় মননশীলতার ছাপ নির্ভুল। খুব সহজে সরল ভঙ্গিতে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার অনুসৃত পদ্ধতি অভিনব।[১১৯]

আরজ আলী মাতুব্বর মনে করেন, আজকের দিনের কল্পনা যা আগামী দিনের বাস্তবতা। কারণ কল্পনা সত্য প্রমাণিত হলে তা যুক্তিসিদ্ধ হবে। এভাবে মননের তীব্র আলোয় উজ্জ্বল করেছেন অস্বচ্ছ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন অনেক বিষয় ও বিশ্বাস। তিনি ছিলেন আত্মশক্তিতে শক্তিমান মনের মানুষ। জীবন, জগৎ ও ধর্মসংক্রান্ত প্রচলিত সব বিশ্বাস ও সংস্কারকে তিনি বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে চেয়েছেন। আত্মবিষয়ক আলোচনায় তিনি যুক্তির মাধ্যমে আত্মা, মন ও প্রাণ এর প্রমাণ করার প্রয়াস পান। ডেকার্ট যেমন সব কিছুকে সন্দেহ কর্তা হিসেবে আত্মার অস্তিত্বেও প্রমাণ করেছেন। আরজ আলীও তেমনি প্রশ্ন দ্বারা 'আমি' বা 'আত্মাসত্তার' অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। যুক্তির আলোকে সব কিছুকে সন্দেহ করা গেলেও সন্দেহ কর্তাকে অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ডেকার্টের আত্মসত্তাবিষয়ক প্রমাণ আরজ আলীর উপলব্ধি করেছিলেন।[১২০]

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন মুক্ত ও নির্মল বিবেকের অধিকারী। সহজ সরল কিন্তু যুক্তিপূর্ণ ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন জগৎ ও জীবন বিষয়ক অভিমত। আত্মসত্তায় বলীয়ান হয়ে তিনি প্রাণ ও মনের অস্তিত্বের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ করেন। তাই তিনি আত্মসত্তাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি বলেন:

> প্রাণকে কোনরূপ প্রত্যক্ষ না করিলেও প্রাণের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ প্রাণ যদিও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে, তবুও ইহার কার্যকলাপ দৈহিক ঘটনারূপে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কার্য থাকিলে তাহার কারণ থাকিতে বাধ্য' – এই স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির বলে আমরা দৈহিক ঘটনাবলির কারণরূপে প্রাণের অস্তিত্বকে অনুমান করিতেছি এবং বিশ্বাস করিতেছি যে, প্রাণ আছে।[১২১]

এখানে আরজ আলী মাতুব্বর যুক্তির মাধ্যমে প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হলে অবশ্যই তাঁর ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ থাকতে হবে। যার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ নেই তার অস্তিত্ব স্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই। এইভাবে আরজ আলী মাতুব্বর অহংবোধ ও আত্মনিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে:

> যে সমস্ত কাহিনীর বিষয়সমূহে ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রমাণ নেই অথবা কার্যকারণ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করার যেখানে কোনো প্রয়াস নাই, এক কথায় যুক্তি যেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, এইরূপ কাহিনীতে বিশ্বাস রাখার নামই অন্ধবিশ্বাস...উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অন্ধবিশ্বাসকে বলা হয় কুসংস্কার।[১২২]

তাঁর মতে মানুষের মধ্যে অহংবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অন্ধবিশ্বাসকে বলা হয় কুসংস্কার। তাঁর মতে মানুষের মধ্যের এ ধরনের অহংবোধের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই গুণটি পরিহার করতে পারলে তৈরি হবে একটি সুশীলসমাজ। তিনি মানুষকে আত্মমর্যাদাবোধে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আরও বলেন যে, খাঁটি বিশ্বাসই হলো জ্ঞান। এবং তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মাধ্যমে। তাঁর মতে আত্মোপলব্ধিসংবলিত প্রত্যক্ষ ও অনুমানহীন বিশ্বাসে জ্ঞানের অভাব বিদ্যমান। তাই তিনি বলেন, যেহেতু বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে আমাদের সন্দেহ থাকা উচিত নয়।[১২৩] এভাবে আরজ আলী মাতুব্বর আত্মচেতনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মানুষকে আত্মোপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান। আরজ আলী মাতুব্বর ও কাজী নজরুল ইসলাম উভয়ই ছিলেন সত্যানুসন্ধানী। অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আত্মসত্তায় সচেতন ও দ্রোহী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিত্ব।

মানুষ কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতির শিকার হলেই তার মনে জন্ম নেয় নতুন চিন্তা, নতুন দর্শন। দার্শনিক ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর আবেগমিশ্রিত যুক্তিসমন্বিত কাব্য রচনায় মানবকল্যাণ ও

Dhaka University Institutional Repository

মানবতাবোধকে তুলে ধরেছেন। চরম অহংবাদীর ন্যায় নজরুল ইসলাম কেবল আত্মসত্তার মহিমা বর্ণনা করেই ক্ষান্তহননি। সমান গুরুত্বের সঙ্গে তিনি মানুষের সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্বের কথাও বলেছেন। চিন্তাশীল মানুষ, বিশেষ করে কবি সাহিত্যিক শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সকলেই একজন দার্শনিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একই ভাবে যুক্তিহলো মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মানুষের মর্যাদা ও ক্রিয়া কর্মে আস্থাশীল হওয়ার হাতিয়ারস্বরূপ। এদিক থেকে বিচার করলে কাজী নজরুল ইসলামকে একজন মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে গ্রহণ করতে কারো দ্বিধা থাকার কথা নয়। নজরুল গবেষক কাজী মোজাম্মেল হোসেনের ভাষায়:

> উনিশ শতকের নবজাগরনের যে প্রধানতম সুর মানবতাবাদে, তা নজরুল ইসলামের মধ্যেই প্রথম মূর্ত হয়ে ধরা দেয়। মানুষের মনুষ্যত্ব ও মহিমায় বিশ্বাসী হওয়ার কারণেই নজরুল ইসলাম ছিলেন মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি ... তিনিই প্রথম বাঙালি সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-নৈরাশ্য, বিদ্রোহ-বিক্ষোভে শরিক হয়ে সমাজকে হৃদয় ব্যথার ক্রন্দন বাক্যে ঠাঁই দিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ধারা পরিবর্তনের গৌরব অর্জনে সমর্থ হন।[১২৪]

স্বদেশ ও স্বজাতির দুঃখ-গ্লানি, পরাজয়-পরাভাবে মর্মবেদনা বোধ করে তা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে কাজী নজরুল ইসলাম উচ্চারণ করেন:

> কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
> বাঙালির খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
>
> (কাণ্ডারী হুঁশিয়ার/'সর্বহারা')

মানবতাবাদী কবি নজরুল ইসলামের কাব্য সহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি যা কিছু দেখেছেন সাধারণ দৃষ্টিতে দেখেননি; প্রজ্ঞা দিয়ে দেখেছেন, দিব্যদৃষ্টি দিয়ে-দেখেছেন। নজরুল তাঁর কাব্য-সাহিত্যে যুগযন্ত্রণার সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়ে দেশ-জাতি ও জনজীবনের আশা-আখাঙ্ক্ষা সম্মুখপানে উদ্দীপিত করেছেন এবং সেই সঙ্গে নিজেকে মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে আঞ্চলিকতার সীমা ডিঙ্গিয়ে আন্তর্জাতিকতার ব্যাপক পরিসরে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজের অবহেলিত নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তির লক্ষ্যে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সৃজনশীল প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে মানবতার জয়গান গেয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন মানবতার সপক্ষে একজন উঁচুদরের দার্শনিক হিসেবে। তিনি মানবসেবা ও কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

> যাহারা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করে সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া তাঁহার মহৎ! ... আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা নুরিল যৌবনের। এই জাতি-ধর্ম-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাহাদের যৌবন, তাহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর, তাহাদিগকে সকল দেশের সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে।[১২৫]

নজরুল কখনো ধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমান এ দুই ধর্মীয় বিধান ও ধর্মপতিদের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে যে অন্যায়, অবিচার দেখা দেয় তিনি তার বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। নজরুল খোদ ধর্মকে কোনো কিছুর জন্যই দায়ী করেননি। দায়ী করেন সেসব ব্যক্তিকে যারা ধর্মকে অসাধু উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং ধর্মের নামে শোষণ ও নির্যাতন করছে অসহায় মানুষকে। তাই নজরুল কখনো মার্কসের মতো ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেননি বরং ধর্মের বিধিবিধান প্রয়োগকারীদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, যাদের জন্য সমাজে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই নজরুলের ভাষায় বলতে হয়, " ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। এই খানেই বুঝা যায় যে, কোনো ধর্ম শুধু কোনো এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাহা বিশ্বের।"[১২৬] ধর্মকে কাজী নজরুল ইসলাম খাঁটি বিশ্বাস দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যে কারণে মানুষের মন অজ্ঞতা, যুক্তিহীনতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ইত্যাদি থেকে মুক্তি পেতে পারে। এভাবে নজরুল, রাসেলের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে নজরুল অবশ্যই একজন সমাজ সংস্কারের রূপকার।

মানবতাবাদী দর্শনে মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য মানবিক ক্ষমতাই যথেষ্ট। মানুষ নিজেই এক বিরাট সম্ভাবনাময় সত্তা। সে নিজেই নিজেই ভাগ্য নিয়ন্ত্রক। মানবতাবাদী দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর মানবসত্তার বাইরে ধর্মের অনুশাসনে, ধর্মের গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারযুক্ত ধর্মের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে নারাজ। জীবের মুক্তি ও শুভের জন্য তিনি অতীন্দ্রিয় সত্তার উপর নির্ভরশীল হতে অনিচ্ছুক, সবার জন্যই তিনি এ কথা রেখে গেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের মতো মানবতাবাদী আরজ আলী মাতুব্বরও তৎকালীন চলমান ধর্মীয় বিধান এবং ধর্মপতিদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ধর্মের নামে ধর্মপতিদের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। তাই কখনো তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা বলেননি বরং ধর্মের বিধিবিধান প্রয়োগকারীদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন; যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে দিনে দিনে সৃষ্টি করেছে অমানবিকতার মাত্রা এবং সমাজকে ফেলছে সংকটের মুখে।

আরজ আলী মাতুব্বর যুক্তি দিয়ে, প্রজ্ঞা দিয়ে ধর্মকে জানতে চেয়েছিলেন, তিনি মনে করেন প্রকৃতভাবে মানুষের মন চায়, ধর্ম তা দিতে পারে না। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো :

Dhaka University Institutional Repository

> ক্ষুধার্ত বলদ যেমন রশি ছিঁড়িয়া অন্যের ক্ষেতের ফসলে উদারপূর্তি করে, মানুষের মনও তেমনি ধর্ম-ক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য ছুটিয়া যায় দর্শনও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।[১২৭]

অর্থাৎ তাঁর মতে ধর্মের অমূর্ত প্রয়াস জ্ঞানপিপাসু লোক গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। যা কিছু মানুষকে পীড়িত করে তার বিলোপ সাধন মানবতাবাদী দর্শনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মানবতাবোধ থেকেই মানবতাবাদী দর্শনের উদ্ভব। মানবতাবাদ এমন একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষের মর্যাদা ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিশেষভাবে আস্থাশীল হয় এবং মানুষের চেয়ে শ্রেয়তর বাহ্যিক কোনো ঐশ্বরিক শক্তিকেও সে বিশ্বাস করতে নারাজ। তাই আরজ আলী মাতুব্বর এর মন্তব্য করেন এভাবে, "কোনো বিষয় বা ঘটনা, না পর্যবেক্ষণ করে বিশ্বাস করা গেলেও, না বুঝে বিশ্বাস করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।"[১২৮]

আরজ আলী মাতুব্বারের মতে ধর্মযাজক যখন দৃঢ়কণ্ঠে সব কিছু না বুঝে, দেখে বিশ্বাস করতে বলেন, তখন মানুষ তা বিশ্বাস না করতে পারলেও পাপের ভয়ে অথবা ধর্মীয় জাতীয়তা রক্ষার ভয়ে আপাতত স্বীকার করে নেয় বা স্বীকার করার ভান করে। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, এভাবে জ্ঞানের অগ্রগতিতে বাধা, মনের অদম্য স্পৃহায় আঘাত, আত্মার অতৃপ্ততা ইত্যাদি কারণে মানুষের মধ্যে ধর্মে শিথিলতা দেখা দেয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের মনের ক্ষুধা অতৃপ্তই থেকে যায়, সৃষ্টি হয় বিচ্ছিন্নতা, ফলে ব্যত্যয় ঘটে মানবতাবোধের। কাজেই আরজ আলী মাতুব্বর মানবতাবোধের সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ধরনের অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকার কথা বলেন। জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। বিশ্বাস ছাড়া জ্ঞান হয় না, কিন্তু জ্ঞান ছাড়া বিশ্বাস হতে পারে। সত্যিকারের বিশ্বাস হতে হবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা প্রত্যক্ষিত তা সর্বদাই বিশ্বাস্য। বিজ্ঞান সর্বদাই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে কোনো সন্দেহ থাকে না। ধর্মকে সন্দেহাতীতরূপে পেতে হলে অন্ধবিশ্বাসের মাধ্যমে সম্ভব নয়, ধর্মকে খাঁটি বিশ্বাস অর্থাৎ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।[১২৯] এভাবে দেখা যাচ্ছে আরজ আলী মাতুব্বর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তত্ত্বের চেয়ে ব্যবহারিক দিক বা অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন যা মানবকল্যাণে অপরিহার্য। মানবতাবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি যা কিছু দেখেছেন সাধারণ দৃষ্টিতে দেখেননি; অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানানুরাগী ও প্রজ্ঞানুরাগী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মানবতাবাদের চিন্তা ও কাজ সর্বদা মানবতার পরিবেশের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাঙালি জনগণের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের ফলে এক সময় বিশাল জনগোষ্ঠীর মাথা ছিল অবনত। মানবতাবাদী দার্শনিক নজরুল তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে অভয়বাণী উচ্চারণ করেছিলেন:

Dhaka University Institutional Repository

বল বীর,
বল উন্নত মর্ম শির।
শির নেহারী' আমারি, নত শির-ওই শিখর হিমাদ্রির!
বিদ্রোহী, 'অগ্নিবীণা'

কবি নজরুল নিঃসন্দেহে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবিশ্বের নিপীড়িত মানব সমাজের কবি। ফলে তাঁর জীবনে চণ্ডীদাসের 'সবার উপর মানুষ সত্য' এ কথাটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর সাহিত্যের স্থায়িত্বকাল ১৯২১ সাল থেকে ১৯১২ সাল মাত্র বাইশ বছর। অতি স্বল্প সময়ে প্রচণ্ড ঝড়ের গতিতে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে যৌক্তিক পদ্ধতি অবলম্বনে মানুষের কথা বলে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সাধন করেছিলেন। বিশ্বের নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যুগে যুগে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে যে যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে কারণেই তিনি বিদ্রোহী হিসেবে মানব – সমাজে চির নমস্য হয়ে আছেন। কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাত থেকে অজ্ঞাত মানুষের মুক্তির জন্য তিনি বিপ্লব করেছেন। তাইতো বলতে হয়:

নিপীড়িত
মানুষের
প্রেমে যিনি
মশগুল!
নজরুল
(তিনি) নজরুল!![১৩০]

পৃথিবীতে যে পর্যন্তকায়েমী স্বার্থবাদী থাকবে সে পর্যন্তঃথাকবে তাঁদের দ্বারা শোষিত ও জর্জরিত মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে থাকবে তাঁদের ছোবল থেকে মুক্তির প্রয়াস – ততদিন সঙ্গতকারণে নজরুল ও আরজ আলীর প্রয়োজন ফুরোবে না। পৃথিবীর কোনো মানুষই প্রতিবাদী বা যুক্তিবাদী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সামাজিক পরিবেশের প্রভাবই তাকে জীবননুখী হতে সহায়তা করে: তার মনে জন্ম নেয় নতুন চিন্তা ও নতুন দর্শন। তেমনি সমাজের অসম্পূর্ণতা ও স্ববিরোধিতাই বাধ্য করেছিল প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসকে যৌক্তিকভাবে মানবিক মূলবোধের বিচার-বিশ্লেষণ করতে। একইভাবে আধুনিক যুগে বিজ্ঞান সংস্কারক ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১ খ্রি.-১৬২৬ খ্রি.) প্রাচীন মতবাদের বিকৃত ধারণার বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তার যৌক্তিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ঠিক তেমনি বর্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২খ্রি. - ১৯৭৯ খ্রি.) বিশ্বমানবতা শান্তিও নিরাপত্তার প্রয়োজনেই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছিলেন। সক্রেটিস, বেকন, রাসেল, নজরুল এবং আরজ আলী মাতুব্বর প্রমুখ দার্শনিকগণ তাঁদের দর্শনের তথ্যকে সমাজ ও জীবনে প্রয়োগ করে মানুষেকে দিতে চেয়েছিলেন যৌক্তিক ও মানবোচিত সম্মান। মানুষের মধ্যে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শসহ যুক্তির আলোকে মানবতাবোধ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা এবং মানবকল্যাণই হল বর্তমান সভ্যতা। বিংশ শতাব্দীতে আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তাধারার প্রতিটি স্তরে রয়েছে মানবতার পরশ। তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে বিশ্বাস ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষকে অসুন্দর পরিবেশ থেকে মুক্ত করে এক সুন্দর জীবনের সন্ধান দিয়েছেন, যেখানে নিহিত থাকবে কেবল সত্যের সন্ধান। মানুষ শিখবে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণ চিন্তা জগতের স্থূলতা, জড়তা দূরীভূত করতে। তাহলে মানুষ অর্জন করতে পারবে চিরন্তন জ্ঞান যা মানব দৃষ্টিভঙ্গিকে যুক্তিমুখী করে তুলতে সাহায্য করবে।

মানবতাবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন যাবতীয় অপশক্তির বিরুদ্ধে, ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে এবং জীর্ণ সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। আর এ বিদ্রোহের জন্য সকলের প্রথম প্রয়োজন নিজেকে চেনা। এর সপক্ষে নজরুলের যুক্তি ছিল:

আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারো কুর্নিশ।

বিদ্রোহী, 'অগ্নিবীণা'

এভাবে কবি শৃঙ্খলপরা 'আমিত্ব'কে মুক্তির পথ দেখানো জন্য বিদ্রোহের যুক্তি দেন। এ ছাড়া তিনি অসত্য, অকল্যাণ, অমঙ্গল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশ মুক্তির জন্য ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী উপস্থাপন করেন। যার পিছনে যুক্তি ছিল মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাসহ মানবকল্যাণমূলক কাজ। সুতরাং অত্যন্তযৌক্তিক কারণে তাঁর বিদ্রোহ ছিল সৃষ্টিশীলতার লক্ষ্যে, যে কারণে তিনি ধ্বংসের মাঝে খুঁজে পান নতুন সৃষ্টির আশ্বাস এবং অসুন্দরের মৃত্যু কামনা করে তিনি বরণ করেন চিরসুন্দরকে; যা স্থান করে নেয় মানবিক মূল্যবোধে। এ প্রসঙ্গে তার উক্তি:

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর/ প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন – জীবন হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় ঘরেও আসছে হেসে –
মধুর হেসে।
ভেঙে আমায় গড়তে জানে সে চির-সুন্দর

প্রলয়োল্লাস, 'অগ্নি বীণা'

কাজী নজরুল ইসলাম নির্যাতিতদের দুঃখবেদনার সমবেদনা জানাতে গিয়ে বিশ্বের দুর্গত জনসাধারণের হয়ে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ব্যক্তি চেতনা জাগানো এবং ব্যক্তি সত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর ব্রত।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলাম মূলত সৃষ্টিশীলতার কর্ণধার। এভাবে তাই তিনি ধ্বংসের মাঝেও খুঁজে পেয়েছেন নতুন সৃষ্টির আশ্বাস; সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতিকেও উপহার দেন সৃষ্টিশীলতার অফুরন্ত উৎস। আবার কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবনও ছিল অত্যন্ত সংগ্রামী। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অন্যায় অবিচার, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে পারেনি। কারণ নজরুলের ছিল অসীম সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং সত্যের প্রতি অবিচলিত আস্থা – যার প্রকাশ দেখতে পাই তাঁর 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে। আর এই জবানবন্দী স্মরণ করিয়ে দেয় সক্রেটিসকে – যা নজরুল জীবনের এক গৌরবোজ্বল ইতিহাস। মানবতাবাদী দার্শনিক নজরুল মানবসেবা ও কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন:

> যাহারা মানবজাতীয় কল্যাণ সাধন করে সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া, তাঁহারা মহৎ! ... আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরীদ যৌবনের। এই জাতি-ধর্ম-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাহাদের যৌবন তাহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর, তাহাদিগকে সকল দেশের সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে।[১৩১]

মানবতাবাদী নজরুলের মানবকল্যাণের সবচেয়ে বড় দিকই হলো– সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, রীতিনীতিসহ নিয়মনীতি ইত্যাদি কোনো কিছুর জন্যই মানুষকে তার স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বকীয়তাবোধের বিসর্জন দেয়ার কথা বলেননি। তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যেই বোঝাতে চেয়েছেন মানুষের জন্য সমাজ, সমাজের জন্য মানুষ নয়। যে কারণে তিনি জীবনভর নিপীড়িত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছেন। মানুষের প্রতি ছিল তার অপরিসীম প্রেম ও শ্রদ্ধা। যার ফলে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তিনি ধর্মের গোঁড়ামি, আভিজাত্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন এবং অন্যকে মুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে, অনৈক্য হলো অনৈতিক ও অমঙ্গলজনক কাজ। প্রমাণ হিসাবে তাই তিনি এ যুক্তি উত্থাপন করেন:

> গাহি সাম্যের গান–
> মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নাহি কিছু মহীয়ান,
> নাই দেশকাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি;
> সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
>
> মানুষ/'সাম্যবাদী'।

দেখা যায় নজরুল ইসলাম কোনো বিশেষ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন না। তাঁর আনুগত্য ছিল মানবধর্মের প্রতি। তাই নজরুল ইসলাম মানুষেরই কবি। মানবপ্রেমই ছিল তাঁর জীবনের দর্শন, স্বামী

Dhaka University Institutional Repository

বিবেকানন্দ যেমন মনেপ্রাণে সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেছেন; সাধারণ মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন এই বলে: "Arise, awake and stop not till the goal is reached."[১৩২] অর্থাৎ ওঠো, জাগো এবং তোমার লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্তথেমে যেয়ো না, তেমনি নজরুলেরও ছিল একই যুক্তি।

যৌক্তিক চিন্তন ও কর্ম সর্বদা মানব ও তাঁর পরিবেশের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে। একসময় কাজী নজরুলের যুগের দেশের জনগোষ্ঠীর মাথা ছিল অবনত। মানবতাবাদী নজরুল তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে যুক্তির আলোকে অভয়বাণী, "উঠ, বল-উন্নত-মমশির" উচ্চারণ করে তাদের জাগ্রত করেছিলেন। একইভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির দুঃখ-গ্লানি, পরাজয়-পরাভবে গভীর মর্মবেদনাবোধ থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে অভিযোগের সুরে উচ্চারণ করেন এ উক্তি:

কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর"

(কাণ্ডারী হুঁশিয়ার/'সর্বহারা')

মূলত নজরুলের কবিতা ও গানের মাধ্যমে সাম্যের আবেদন অনেক বেশি বিস্তৃত ও ব্যাপক হতে পেরেছে। বুদ্ধদেব বসু নজরুল সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন: "আজকাল যে সাম্যের বাণী লোকের মুখে মুখে বুলিতে পরিণত হয়েছে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলই তাঁর প্রথম উদ্যোক্তা।"[১৩৩] অসাম্প্রদায়িকতা, হিন্দু-মুসলমানদের মিলন, সমাজের নিচুতলার মানুষের উত্থান – এসব নজরুল ইসলামের মানবিকতার অংশ হলেও তিনি প্রজ্ঞা দিয়ে লক্ষ করেছেন:

"মানুষ চিরকাল মানুষের উপর যে অত্যাচার করিয়া আসিতেছে তাহা পশুদের পক্ষে অসম্ভব কারণ মানুষ একটি চিন্তাশীল পশু।"[১৩৪]

ফলে কাজী নজরুল ইসলাম আজীবনই লাঞ্ছিত, দলিত মানুষের জাগরণ চেয়েছেন- চেয়েছেন মানব মুক্তি। আর সে কারণেই তিনি পারস্যের ধর্মবেত্তা আল গাজ্জালি (১০৫৮ খ্রি.-১১১১ খ্রি.) এবং ফরাসি দার্শনিক ডেকার্টের (১৫৯৬ খ্রি.-১৬৫০ খ্রি.) মতো নতুন মানবতাবাদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে বিদ্রোহী করে বিদ্রোহী বীরের বেশে উচ্ছারণ করেন:

আমি দুর্বার,
আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার!
... ...
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়মকানুন শৃঙ্খল!

(বিদ্রোহী/'অগ্নি-বীণা')

কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'প্রলয় শিখা', 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা', 'সন্ধ্যা', 'সাম্যবাদী', প্রভৃতি কাব্যের 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ', 'চোর-ডাকাত', 'বারাঙ্গনা', 'মিথ্যাবাদী', 'নারী',

Dhaka University Institutional Repository

'রাজা-প্রজা', 'সাম্য', 'কুলি-মজুর', প্রভৃতি কবিতার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু মানুষ ও তার মনুষ্যত্ব। উল্লেখ্য, নজরুল কাব্যে মানবতাবাদের যে বর্ণিল সামাজিক চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে সেখানেও রয়েছে শ্রেণীনিরপেক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষতাসহ নরনারী নিরপেক্ষ মানবতার জয়গান, 'মানুষ মহিয়ান'। এ সম্পর্কে নজরুলের স্পষ্ট বাণী:

> এসো ভাই হিন্দু! এসো মুসলমান! এসো বৌদ্ধ! এসো ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা ও স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না।[১০৫]

কাজী নজরুল ইসলাম কঠোর দরিদ্রতা, যুদ্ধের হিংস্রতাসহ নানা প্রতিকূলতার-মধ্যেও বিশ্বনন্দিত দার্শনিক সক্রেটিস (খ্রিস্ট পূর্ব ৪৬৯-৩৯৯), রাসেল (১৮৭২ খ্রি.-১৯৭০ খ্রি.) ও সার্ত্রের মতো মানবকল্যাণের লক্ষ্যে লড়াই করেছেন, রচনা করেছেন উৎপীড়িত মানবের মুক্তি সংগ্রামের সহায়ক কাব্য সাহিত্য। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে নজরুল তাঁর ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বিচরণ করলেও ধর্মান্ধতার যূপকাষ্ঠে তিনি তার মানবীয় সত্তাকে বিসর্জন দেননি। তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন।

> ... নিজের ধর্মকে মানিয়া লইয়া সকলকে প্রাণ হইতে দু-বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি অর্জন করিতে হইবে। যিনি সত্যিকারে স্বধর্মে নিষ্ঠ, তাঁহার এই উদার বিশ্বপ্রেম আপন হইতেই আসে। ... হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগণতলের সীমা-হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া – মানব! তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বল দেখি, "আমার মানুষ ধর্ম।"[১০৬]

মানবতাবাদী দর্শনে এর চেয়ে আর বড় প্রমাণ কী হতে পারে। মস্তিকই চিন্তার হাতিয়ার আর ব্যক্তি হলো এ হাতিয়ারের একমাত্র মালিক। ব্যক্তিই হলো মানুষের মৌলিক স্তর। ফলে ব্যক্তি থেকে শুরু হয় প্রগতির যাত্রা। ব্যক্তির বিকাশ ও উৎসর্গ সাধনের মধ্য দিয়েই শিল্প-সাহিত্য তথা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় প্রগতির পথে। একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামও সে কাজটি করেছেন অত্যন্তদৃঢ়তার সাথে।

মানবতাবাদী আরজ আলী মাতুব্বর মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মানুষ যখন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠে তখন সে অনুধাবন করে পরম স্রষ্টার সৃষ্টিতে সে তুচ্ছ নয়, হেয় নয় বরং শ্রষ্টার মহান। আরজ আলী মাতুব্বরের মানবতাবাদ কোনো অন্ধবিশ্বাস বা গোঁড়ামির ওপর ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যুক্তি ও নীতির ওপর ভর করে। আরজ আলী মাতুব্বরের দৃষ্টিতে মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান সবার উপরে; ধর্মশাস্ত্র, মন্দিরের চেয়ে পবিত্র মানুষ। তাঁর মানবধর্ম ছিল মানুষ কেন্দ্র করে, মানুষকে বড় করে এবং অন্যসব মানুষের সঙ্গে সমান করে যে জীবননীতি তাকে বড় করে দেখা। সামাজিক অত্যাচার শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্তি, ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মতো বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিসহ সত্যিকারের ব্যক্তি স্বাধীনতা যে মতবাদের প্রাণ স্বরূপ, সে মতবাদই ছিল আরজ আলী মাতুব্বরের ধর্ম। তিনি জগৎ ব্যাখ্যার মধ্যে জগতের মানবীয় পরিবর্তনে উৎসাহী ছিলেন।

মানবতাবাদের চিন্তা ও কাজ সর্বদা মানব ও তার পরিবেশের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে। সমাজের অবহেলিত মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে মানবতার জয়গান গেয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন মানবতার সপক্ষে একজন উঁচুমানের মানবতাবাদী হিসেবে।

আরজ আলী মাতুব্বর মানব জীবনের সর্বত্রই বিজ্ঞানের অবদান অবলোকন করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, মানবকল্যাণই হলো বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। মানবতাবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজসহ প্রায় সর্বত্রই সমাদৃত। তাই তিনি অনুধাবন করেন :

> মানবতাবর্জিত কোন ধর্ম পৃথিবীতে নেই। আর্তের সেবা, দুঃস্থের প্রতি দয়া, অহিংসা, পরোপকার ইত্যাদি সব ধর্মে শুধু স্বীকৃতই নয়, একান্তপালনীয় বিধান। সুতরাং সব ধর্মের স্বীকৃত যে মতবাদ, অর্থাৎ মানবতাবাদী হওয়া উচিত মানুষের আন্তর্জাতিক ধর্ম বলাম মানব ধর্ম।[১৩৭]

মানবতাবাদী আরজ আলী মনে করেন, ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মই একেশ্বরবাদী, সকল ধর্মই আস্তিক। জগতের সকল মানুষ যদি একেশ্বরবাদী হয়, তবে তাদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্বভাব থাকা উচিত যা মানবতাবাদী দর্শনের মূলমন্ত্র।

আরজ আলী মাতুব্বর ও কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের জীবন ও কর্মসাধনার মাধ্যমে অবহেলিত নারীর সামাজিক মর্যাদা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষার অধিকার নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলে ধরে যুক্তি দেখিয়েছেন। নারীর অধিকার ও মর্যাদা সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে তাঁদের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হবে, অপরদিকে নারীকে পেছনে রেখে সভ্যতা ও প্রগতির শিখরে আরোহণ কোনো জাতির পক্ষে সম্ভব তো নয়ই, বরং অযৌক্তিক ও অসামাজিক। কারণ নারী পুরুষের মৌলিক শক্তি ও গুণাবলি অভিন্ন। ফলে বলা যায় এ দুই দার্শনিক নিঃসন্দেহে সফল মানবতাবাদী দার্শনিক। মানবতাবাদী দর্শন মানুষকে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি ভুলিয়ে দিয়ে এক মানবতার ছায়াতলে এনে একটি সুখী সুন্দর দেশ

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে তোলার চেষ্টা চালায়। অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব এ দুই জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানবজাতিকে এক মহান আদর্শের পতাকাতলে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছেন। নিজেকে জানা এবং নিজের দিকে তাকানোর ব্যাপারটি দার্শনিক সক্রেটিসের জ্ঞানতান্ত্রিক অনুশীলনের মধ্যেও ছিল। আরজ আলী মাতুব্বরের প্রশ্নগুলোও সক্রেটিসের প্রশ্নাবলির মতোই সরল অথচ বিপজ্জনক। সক্রেটিস যাঁদেরকে তাঁর অনুরাগী ও অনুসারী হিসেবে পেয়েছিলেন আরজ আলী নিজে তাদের কারোরই ধারের বা কাছের নন। সক্রেটিসের প্রশ্নে অবশ্যই বৈজ্ঞানিকতা ছিল। কিন্তু জ্ঞানের তুলনায় নৈতিকতাকেই তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। অপরদিকে আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর নিজের মতো করে, যে অঙ্গীকারটি গড়ে তুলেছিলেন সেটি ছিল প্রধানত বৈজ্ঞানিক, নৈতিক নয়। এ পার্থক্যটি মৌলিক। সক্রেটিস মনে করতেন জ্ঞান সত্যকে অসত্য থেকে পার্থক্য[১৩৮] করা শেখায় এবং সত্যকে যে জানে তাঁর পক্ষে অসত্যের দিকে যাওয়া অর্থাৎ অন্যায় কাজ করা সম্ভব নয়।[১৩৯] আরজ আলী মাতুব্বর মনে করতেন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই একমাত্র সঠিক ও নিশ্চিত জ্ঞান; কাজেই নির্ভুল জ্ঞান কখনো অসত্য হতে পারে না। আরজ আলী মাতুব্বর জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কথা বলেছেন।

মানবপ্রেমিক নজরুলকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মেলানো যাবে না, যাবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের সঙ্গে। কেননা তাঁর চরিত্রের মধ্যে এক চলিষ্ণুতা ছিল: কৈশোরে নিবারণচন্দ্র ঘটকের সংস্পর্শে এসে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়েছিলেন – কিন্তু তাদের সঙ্গে ভিড়লেন না; যৌবনে কমরেড মুজাফফর আহমেদের সঙ্গে দিনরাত্রি কাটালেন কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির[১৪০] সদস্যপদ গ্রহণ করলেন না।[১৪১] তিনি কঠিন দরিদ্রতার মধ্যে জীবন কাটিয়েও কখনো হীনম্মন্যতায় ভোগেননি। সমাজের দরিদ্র-নিপীড়িত মানবের প্রতি ছিল তার বিশেষ মমত্ববোধ ও সহানুভূতি। তিনি অসম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। জাতীয়তাবাদী এ সকল চিন্তা চেতনার কারণেই তিনি আজ বাঙালি জাতীয় প্রতিনিধি; আন্তর্জাতিকতাবাদী নজরুল। আরজ আলী মাতুব্বরও সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন। কঠিন দরিদ্রতায় জীবনযাপন করলেও কোনো হীনম্মন্যতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

আরজ আলী মাতুব্বর ও কাজী নজরুল ইসলাম মূলত উভয়ই মুক্তবুদ্ধির লোক ছিলেন; ধর্মীয় আচারে সমালোচনা করে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদের সমর্থন করেন। তাঁরা সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে ছিলেন স্বাধীনচেতা ও মুক্তমনের ব্যক্তিত্ব এবং যুক্তির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনার করুণ চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের উপলব্ধিতে ছিল– কিছু লোক মহা উল্লাসে অন্ধ ও

Dhaka University Institutional Repository

মূর্খও রক্ত শুষে নিচ্ছে, তাই তাদের প্রতিবাদ ছিল এ অক্ষমদের জন্য। তাই কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়।

এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'এবার ফিরাও মোরে'

রবীন্দ্রনাথের মতো এই দুই দার্শনিক মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা অতিপ্রাকৃত উপায়ে কোনো প্রাকৃতিক বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে অপরাগ ছিলেন। তাঁরা এতই বাস্তব বাদী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন যে, বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে ভাববাদ ও রহস্যবাদের প্রতি তাঁরা আস্থা হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন।

আরজ আলী মাতুব্বর ও কাজী নজরুল ইসলাম উভয়ই ছিলেন সব সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির উর্ধ্বে। জাগতিক যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁরা নিরন্তর সাধনায় রত ছিলেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে জানতেন যুক্তির জগতে কোনো গোঁড়ামির স্থান নেই। যুক্তিবাদী মানুষ কখনো অনৈতিক হতে পারে না; যার ফলে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারকল্পে তাঁরা অন্যায় ও অযৌক্তিক কোনো কাজ সমর্থন করেননি। এ দুই দার্শনিক সামাজিক বৈষম্যতাকে কখনো মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি; সামাজিক বৈষম্যতা তাঁদের কাছে অত্যন্ত অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে। সামাজিক বৈষম্যের কারণে একটি সমাজ পঙ্গু ও অকর্মণ্য হয়ে যায় – আর সমাজের অস্বাভাবিক উঁচু-নিচুর কারণেই ও বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এ বৈষম্যের সমাধানকল্পে উভয়েরই লক্ষ্য ছিল শোষণহীন সমাজের। তাঁরা প্রমাণ করে গেছেন একটি সমাজেকে কুসংস্কারমুক্ত ও আলোকিত করার একমাত্র উপায় জ্ঞান। যদি বিশ্বের আপানর জনসাধারণ দার্শনিক যুক্তি দ্বারা ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং তাকে নৈতিক ও নান্দনিকরূপে গ্রহণ করে; তাহলেই মানুষ অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কারন, ভেদবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত হবে। তাই জীবনানন্দ দাশের একটি কথা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: নীতিকে ধর্ম মনে করতে পারলে এবং পৃথিবীকে সেইসঙ্গে মোটামুটি ধার্মিক দেখাতে পারলে তৃপ্তিবোধ করা যায়। এভাবে দর্শন – নান্দনিক এবং একই সঙ্গে সুখনয়। সুখ শান্তিতে বাস করার মধ্যে তৃপ্তি আছে, এই তৃপ্তিটুকু নিয়েই বিশ্বেও প্রতিটি মানুষ বাঁচতে চায়, বাঁচার অধিকার চায়, এ চাওয়ার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই, লুকোচুরি নেই; আছে যৌক্তিক অনুসন্ধান, তাই কাজী নজরুল ইসলাম গেয়েছেন:

Dhaka University Institutional Repository

অসুন্দর মিথ্যাকের হোক পরাজয়
এস এস আনন্দ-সুন্দর, জাগো জ্যোতির্ময়।
দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর, 'সিন্ধু-হিল্লোল'

সামাজিক বাস্তব তার এ দুই দার্শনিককে প্রয়োগবাদী বলে আখ্যায়িত করা যায়। যেমন মানব কল্যাণের জন্য তাঁদের যৌক্তিকনীতি ও পদ্ধতি ছিল–বৈজ্ঞানিক প্রয়োগপদ্ধতি ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার সমর্থনে এই দুই দার্শনিক সর্বদা জ্ঞানানুশীল ও সত্য আবিষ্কারের কথা বলেছেন। তাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ, অন্ধচক্ষুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম, জ্ঞানের জন্য অপ্রতিরোধ্য অনুসন্ধান করে, এ দেশের জনগণের মুক্ত চিন্তার বিকাশে অপরিসীম অবদান রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

১. শামসুন নাহার মাহমুদ, *রোকেয়া জীবনী*, সাহিত্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২০

২. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ১৯০

৩. ঐ, পৃ. ২১২

৪. ঐ, পৃ. ২০৪

৫. ঐ, পৃ. ১৯৬

৬. শামসুন নাহার মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৭. ঐ, পৃ. ৩৭

৮. ঐ, পৃ. ৭০

৯. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'সুবেহ-সাদেক', আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ২৯৯

১০. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া*, আসর, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৩

১১. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), ***আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১,*** পৃ. ২০৯

১২. পাখা, ডায়নামা ও জলঘড়ি তৈরির সংবিবরণের জন্য, আরজ আলী মাতুব্বর, *ভিখারীর আত্মকাহিনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, ***আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র,*** তৃতীয় খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৭৩-৮৫ এবং পৃ. ৯৩-৯৭ দ্রষ্টব্য।

১৩. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২০০

১৪. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, 'অবরোধ- বাসিনী', আবদুল কাদের (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ ৪৮৮-৪৮৯।

১৫. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, 'স্ত্রীজাতির অবনতি' আবদুল কাদির (সম্পাদিত), ***রোকেয়া রচনাবলী***,. পৃ. ২২

১৬. আইয়ুব হোসেন সম্পাদিত, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ২৮২

১৭. ঐ , পৃ. ২৮৩

১৮. ঐ, পৃ. ২৮৩

১৯. ঐ. পৃ. ৫৪-৫৫

২০. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, 'স্ত্রীজাতির অবনতি,' আবদুল কাদের (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ,.২৯

২১. ঐ. পৃ. ৪৪

২২. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ১৯৭

২৩. আল্লামা ইকবাল, খুদী বা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী, তকদীর এ নয়।

২৪. নারী বিদ্বেষী বলতে তিনি 'নারী উন্নয়ন বিদ্বেষী' বোঝাতে চেয়েছেন।

২৫. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন,. 'স্ত্রীজাতির অবনতি', আবদুল কাদের (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ২৯-৩০

২৬. ঐ, পৃ.৩০

২৭. রোকেয়া মনে করেন, 'আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, 'ভরসা কেবল পতিতপাবন' কিন্তু ইহাও স্মারণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বের হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে। ("God helps those that help themselves") । তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না"। উদ্ধৃতি: 'স্ত্রী জাতির অবনতি', আবদুল কাদের (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

২৮. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ১৪৭

২৯. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ১৩৩

৩০. সেলিনা হোসেন, 'সময়ের অগ্রগামী মানুষ', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত) প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৩১. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, 'অর্ধাঙ্গী', আবদুল কাদের (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৪৪

৩২. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'হজের ময়দানে', আবদুল কাদের (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৩০৮

৩৩. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ১০৫

৩৪. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২৯৩

৩৫. ঐ, পৃ. ১২১

৩৬. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'যসদা-পূজা', আবদুল কাদের (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ২৫৭

৩৭. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, 'বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি', আবদুল কাদের (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ২৮৩

৩৮. সৃষ্টির রহস্য গ্রন্থে আরজ আলী মাতুব্বর বলেন, "কোন রকম গোঁড়ামীকে প্রশয় না দিয়া প্রত্যেক ধর্মকে যথাসম্ভব কুসংস্কারমুক্ত করা উচিত। কুসংস্কার ত্যাগ করার অর্থ 'ধর্মকে ত্যাগ করা নহে'। যদি কেহ কুসংস্কার ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন এবং বলিতে চাহেন যে, কুসংস্কার ত্যাগ করিলে ধর্ম থাকবে না, তাহা হইলে মনে আসিতে পারে যে, ধর্ম রাজ্য কি কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নাই? এ প্রসঙ্গে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। আমাদের অভিযান শুধু অসত্য বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। প্রত্যেকটি ধর্ম থাকিবে মিথ্যার আবর্জনা বর্জিত ও পবিত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

৩৯. আইয়ুব হোসেন, 'সত্য সন্ধানী আরজ আলী মাতুব্বর', আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর: শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ১৯৬

৪০. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ৩০৯

৪১. ঐ, পৃ. ১৯৩-১৯৪

৪২. ঐ, পৃ. ২৯৩

৪৩. ঐ, পৃ. ২৯৪

৪৪. ঐ. পৃ. ২৪৩

৪৫. ঐ. পৃ. ২৩১

৪৬. ঐ, পৃ. ২৩৯

৪৭. ঐ, পৃ. ২৬৮

৪৮. ঐ, পৃ. ২৬৮

৪৯. ঐ, পৃ. ২৩৪

৫০. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'চাষার দুক্ষু', আবদুল কাদের (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ২৪৬

৫১. 'সম্পাদকের কথা', আবদুল কাদের (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. [১২]

৫২. ঐ,

৫৩. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, 'পদ্মরাগ', আবদুল কাদের (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৪৫৭

৫৪. আইয়ুব হোসেন সম্পাদিত, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ১৯৮

৫৫. ঐ.

৫৬. 'সম্পাদকের কথা', আবদুল কাদের (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. [১১]

৫৭. আইয়ুব হোসেন সম্পাদিত, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ১২৬

৫৮. ঐ, পৃ. ২৪৭

৫৯. ঐ, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

৬০. ঐ, পৃ. ২৮০

৬১. শামসুন নাহার মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৬২. আইয়ুব হোসেন সম্পাদিত, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২৪০

৬৩. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, 'পদ্মরাগ', আবদুল কাদের (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৪০৩

৬৪. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানব ও বাংলা সাহিত্য*, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা,, ১৯৬৪, পৃ. ৪২২

৬৫. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, 'সুগৃহিণী' আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৫৬

৬৬. আইয়ুব হোসেন সম্পাদিত, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২৩৯

৬৭. ঐ, পৃ. ২৩৯

৬৮. আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশে দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ১১৫

৬৯. স্বদেশরঞ্জন দাস, *মানবেন্দ্রনাথ: জীবন ও দর্শন*, ২য় সংস্করণ, রেনেসাঁস, কলিকাতা ১৯৭০ পৃ. ৪৯২

৭০. ঐ, পৃ. ১৯

৭১. মানবেন্দ্রনাথ মার্কসবাদী চিন্তাবিদ হয়েও মার্কসবাদেই তাঁর চিন্তা সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি দেখেছেন, ফরাসি বিপ্লবের সময় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে মানুষকে নিয়ে। মার্কসবাদ, ফ্যাসিবাদ, গণতন্ত্র, উদারনীতি ইত্যাদি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এই মানুষেরই কল্যাণের জন্য। কিন্তু মানুষের সার্বিক কল্যাণ কেউ দিতে পারেনি এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আরো বেড়েছে। মানবেন্দ্রনাথের মতে এই সব মতবাদের ত্রুটিই মানুষের দুর্দশার জন্য দায়ী। তিনি সিদ্ধান্তে আসলেন, ফ্যাসিবাদ, গণতন্ত্র, উদারনীতিবাদ, মার্কসবাদ ইত্যাদির মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে বলেই মানবকল্যাণ সম্ভব নয়। এই সকল মতবাদের ত্রুটি বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করে তিনি 'নয়া মানবতাবাদ' নামে এক নতুন মতবাদ সূত্রবদ্ধ করেন। এ মতই প্রথম পরিচিত হয়েছিল মৌলিক মানবতাবাদ (Radical Humanism) নামে; তিনি *Radical Humanism- A Manifesto* (১৯৪৭) এবং *Reason, Romanticism* এবং *Revolation* (১৯৫২) নামক দুটি গ্রন্থে, মোট বাইশটি সূত্রে তাঁর এমতবাদ ব্যাখ্যা করেন।

৭২. স্বরাজ সেনগুপ্ত, 'বিপ্লবের দর্শন : মার্কস ও মানবেন্দ্রনাথ' শরীফ হারুন (সম্পাদিত) *বাংলাদেশ দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৯৪

৭৩. আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশে দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ১১৭-১১৮

৭৪. M. N. Roy, *New Hunamism: A mainfesto*, Renaissance Publication. Kolkata. 1947 পৃ. ৩৬

৭৫. ঐ, পৃ. ১৩

৭৬. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *বাঙালীর রাষ্ট্র চিন্তা*, ২য় খন্ড, জি.এ.ই পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২৩৭

৭৭. আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশে দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ১০০

৭৮. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৯৯

৭৯. ঐ পৃ. ১০০

৮০. আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশে দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ১১৮

৮১. ঐ পৃ. ১১৮

৮২. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-৩*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ১২৩

৮৩. ভাববাদী দার্শনিকরা বস্তুর স্বাধীন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। ভাববাদীরা কল্পনাপ্রবণ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধার ধারে না। তাঁদের মতে সবই মননির্ভর। ভাববাদী দার্শনিকরা আধ্যাত্মিক। বস্তুবাদীরা বস্তুর স্বতন্ত্র স্বাধীন নিরপেক্ষ অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এ দর্শনের কথা হলো মানুষই সব কিছুর উর্ধ্বে। বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বস্তুবাদীরা আবার দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর বিশ্লেষণ পদ্ধতি যান্ত্রিক (Mechanical) এবং অপর শ্রেণীর পদ্ধতি দ্বান্দ্বিক (dialectical)। যান্ত্রিক বিশ্লেষণে বিশ্ব জগৎ নির্দিষ্ট নিয়মে সরল কার্যকারণ ধারায় এগিয়ে চলছে বলে মনে করা হয়। বিশ্বজগৎ রহস্যময় ও অজ্ঞাত নয়।

৮৪. নিউটনের Mechanistic প্রত্যয়কে মানবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষপূর্ব (a priore) জ্ঞান পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এ পদ্ধতিতে জগৎ প্রকৃতি যেন পূর্ব নির্ধারিত একটি ঘড়ির মতো। পরিণামবাদী (Teleotogical) নিয়মে সব কিছু ঘটে থাকে। নিউটনের ধারণার সমালোচনা করে তিনি বলেন তাঁর মতে বস্তুজগৎ সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

বৈজ্ঞানিক ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃতি বিজ্ঞান এখন আর অবরোহী (deductive) পদ্ধতিতে না চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আরোহী (inductive) পদ্ধতিতে চলে। প্রকৃতির ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তই হলো নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত জগৎ (Law governed universe) । জগতের বিভিন্ন নিয়ম নিয়ন্ত্রিত অংশের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে। জগতের এই বিশেষণ পরিনামাবাদী নয়। তাঁর নিয়মতান্ত্রিক জগতের ধারণা অনুযায়ী প্রকৃতির অংশ জড় ও জীবনের মধ্যে পার্থক্য নেই। উদ্ধৃতি : সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

৮৫. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত) *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ১*, পৃ. ১৩৫

৮৬. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত) *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ২*, পৃ. ২০০

৮৭. সিদ্দিকা মাহমুদা, 'মানবেন্দ্রনাথ ও সুধীনদ্রনাথ দত্ত', শরীফ হারুন, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে দর্শন : ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯ পৃ. ৪৯২

৮৮. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

৮৯. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত) *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ১*, পৃ. ২২

৯০. ঐ, পৃ. ৫২

৯১. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত) ***আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ২***, পৃ. ২৮৮

৯২. সালাহউদ্দিন আহমেদ : 'মানবেন্দ্রনাথ রায় ও বাঙালী মুসলিম নবজাগরণ', বাসন্তী গুহঠাকুরতা (সম্পাদিত), *শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ: এম এন রায়,* পরিবর্তন প্রকাশনী সংস্থা, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৭

৯৩. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), ***আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ১***, পৃ. ৫০

৯৪. সৈয়দ আলী আহসান, 'এম এন রায় : আমার সাক্ষাৎ', বাসন্তী গুহঠাকুরতা (সম্পাদিত), পৃ. ৫৪-৫৯

৯৫. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ১*, পৃ. ২৮৩

৯৬. আমজাদ হোসেন, *মানবেন্দ্রনাথ রায় জীবন ও রাজনীতি*, বর্তমান সময়, ঢাকা ২০০৫, পৃ. ১০২

৯৭. 'সম্পাদকের কথা', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত

৯৮. আমজাদ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৯৯. ঐ পৃ, ৯৩

১০০. ঐ পৃ. ৯৪

১০১. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ২*, পৃ. ৩৬

১০২. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

১০৩. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ১*, পৃ. ৫২

১০৪. ঐ পৃ. ৫২

১০৫. আমজাদ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

১০৬. M. N. Roy, পৃ. ৩৬

১০৭. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

১০৮. ঐ, পৃ. ২৩৮

১০৯. আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশে দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ.১৩৮

১১০. মোঃ রফিকুল ইসলাম, *নজরুল জীবনী*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২, পৃ. ৯

১১১. আইয়ুব হোসেন, *আরজ আলী মাতুব্বর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.১৭

১১২. ঐ, পৃ. ১৭

১১৩. আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশে দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

১১৪. শুশীল কুমার গুপ্ত, *নজরুল চরিতমানস*, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১২৩

১১৫. কাজী নজরুল ইসলাম , আমার পথ, 'রুদ্র মঙ্গল'

Dhaka University Institutional Repository

১১৬. কাজী নজরুল ইসলাম , ধূমকেতু পথ, 'রুদ্র মঙ্গল'

১১৭. হাসনাত আবদুল হাই, 'আরজ আলী মাতুব্বরকে নিয়ে লেখা', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১

১১৮. আইয়ুব হোসেন সম্পাদিত, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ২৮৮

১১৯. হাসনাত আবদুল হাই, 'আরজ আলী মাতুব্বরকে নিয়ে লেখা, মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

১২০. ফেরদৌসি বেগম, 'যুক্তির আলোকে আরজ আলী মাতুব্বর', ফেরদৌসী বেগম (সম্পাদিত), *জীবন দর্শন*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০৬, পৃ.৮৪

১২১. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৫৪

১২২. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২০

১২৩. ঐ, পৃ. ৫৪

১২৪. কাজী মোজাম্মেল হোসেন, *কাজী নজরুল ইসলাম এবং জীবনানন্দ দাশের কবিতায় রঙের ব্যবহার বৈচিত্র*, বাংলা একাডেমী, ২০০৭, ঢাকা, পৃ. ৭৮-৭৯

১২৫. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ ৮৭-৮৮

১২৬. কাজী নজরুল ইসলাম , ছুঁৎমার্গ, 'যুগবাণী'

১২৭. আইয়ুব হোসেন সম্পাদিত, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৫৪

১২৮. ঐ, পৃ. ৫৩

১২৯. ঐ, পৃ. ৫৩

১৩০. প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, *কাজী নজরুল*, শ্রীমতী সুষমা দেবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, হুগলী, ১৯৭৩, পৃ. ঝ

১৩১. যৌবনের গান; 'অভিভাষণ'

১৩২. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

১৩৩. বুদ্ধদেব বসু, *কবিতা* (ত্রৈমাসিক পত্র) নজরুল সংখ্যা, দশম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক পৌষ ১৩৫১, নজরুল ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত।

১৩৪. কাজী নজরুল ইসলাম , 'লাঞ্ছিত'- প্রবন্ধ

১৩৫. কাজী নজরুল ইসলাম , নবযুগ/ 'যুগবাণী'

১৩৬. কাজী নজরুল ইসলাম , ছুঁৎমার্গ/'যুগবাণী'

১৩৭. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২৮৮

১৩৮. সক্রেটিস তার সময়কালে গোটা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। বিশেষভাবে বিপদগ্রস্ত করেছিলেন তিনি রাজনীতিকদের যাঁরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তরুণদেরকে বিপদগামী করবার। রাষ্ট্র তাকে নিয়ে বিপদে পড়েছে এবং বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য বাধ্য হয়েছে তাকে প্রাণদণ্ড দিতে। আরজ আলী মাতুব্বর অবশ্যই রাষ্ট্রের জন্য তেমন কোনো চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হননি। কিন্তু একজন সরকারি কর্মচারী, ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলবার দুঃসাহস দেখতে পেয়ে আরজ আলীর বিরুদ্ধে, সরকারি মামলা দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ এই যে, আরজ আলী একজন কমিউনিস্ট। অথচ আরজ আলী মোটেই কোনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর ওঠা বসা আলাপ আলোচনা হতো তারা সবাই ছিলেন উদারনৈতিক এবং রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ; কোনো কমিউনিস্ট পার্টি তো নয়ই, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেনি। অথচ তাকে বলা হয়েছে কমিউনিস্ট।

১৩৯. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'আরজ আলী মাতুব্বর:পথের সন্ধানে', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

১৪০. মার্কসবাদ ও রুশ বিপ্লবের প্রতি নজরুল ইসলামের ছিল ভক্তিমিশ্রিত শ্রদ্ধা। ম্যাক্সিম গোর্কির রচনা তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি রাজনৈতিক কোনো তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর সাম্যের বাণী কোনো তত্ত্বের ফল নয়, নেহায়েত মানুষকে ভালোবাসার ফল।

১৪১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, 'মানবপ্রেম : নজরুল সাহিত্যে প্রতিফলিত দৃষ্টিভঙ্গি', শরীফ হারুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ৫৩৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মানবতাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মানবতাবাদ

ভিন্ন ভিন্ন যুগ ও কালে এমন কিছু মহামনীষী জন্মগ্রহণ করেন যাঁদের জীবনবোধের মূলে থাকে মানব বিশ্বাস ও কল্যাণকামিতা। এক গভীর বিশ্বাস থেকে তাঁরা মানুষকে নিগূঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। মানবতার প্রশ্নে তাঁরা থাকেন অবিচল ও নির্দ্বন্দ্ব। কোনো প্রকার আধ্যাত্মিক অথবা ধর্মীয় সংকীর্ণতার দ্বারা সংকুচিত কিংবা কুণ্ঠিত হন না। তাঁদের মানবতাবাদের মূলে থাকে বস্তুজ্ঞান, কর্মশক্তি এবং আত্মশক্তির সমন্বিত রূপ। মানবতার প্রতি মুহূর্তের সংকট-উত্তরণে যাঁরা হন এক জীবন্ময় প্রেরণার উৎস – এমনি দু'জন মানবতাবাদী দার্শনিক হলেন আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০ খ্রি.-১৮৮৬ খ্রি.)।

আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন ঐহিক ভাবধারার মানুষ। তাঁরা উদারপন্থী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালির ঐহিক জীবনচর্চা ও স্বাধীন মনন সাধনায় অপরিসীম অবদান রেখেছিলেন। উভয়ের কাছেই শাস্ত্রীয় বিশ্বাস ও আচার আচরণের পরিবর্তে যুক্তি, বিবেক বুদ্ধির গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মী হয়েও মানবীয় বিবেক ও শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তির মাধ্যমে নিজের অজান্তেই ব্রহ্মসমাজের মূল ভাবাদর্শ থেকে সরে এসেছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বরও মানবীয় বিবেক ও শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তির তাড়নায় ইসলাম ধর্মের মূল আদর্শ ঐতিহ্যকে লালন করতে পারেননি। বাঙালির দর্শনচিন্তা ও মনন সাধনায় উভয় দার্শনিক ছিলেন একই পথের পথিকৃৎ। এ দুই দার্শনিক কেবল মানবিক ধর্মই নয়, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রতিও তাঁদের মনোযোগ ছিল অত্যন্ত প্রকট। তাই দেখা যায়, প্রতীচ্যের নবজাগরণে মানবিক ধর্মের প্রতি উনিশ শতকের অন্যান্য বাঙালির ধ্যানধারণার চেয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তা-চেতনায় যে মৌলিকত্ব ছিল তা'হল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রতি প্রবল আকর্ষণ – যে আকর্ষণ আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তা ও মননশক্তিতে সমভাবে নাড়া দিয়েছিল। এমনিভাবে প্রতীচ্যের নবজাগরণের মানবিকতা ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলার ইতিহাসে সৃষ্টি করেছিলেন এক নতুন ধারা। কুসংস্কারশাসিত ধর্মের অচলায়তন ভেঙ্গে তিনি জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন এক নতুন পথের। আরজ আলী মাতুব্বরও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত অথচ অমীমাংসিত বিষয়ের উপর নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে শান্ত, নম্র ভাষায়–স্বোপার্জিত জ্ঞানে, তা-প্রকাশের ভাষা খুঁজেছেন; তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে অস্পষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা দান করেছেন। যে পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ ঘটেছে অন্য এক ভঙ্গিমার, যা ইন্ধন যুগিয়েছে মানুষকে ভাবাতে, মানুষের চেতনা শক্তিকে জাগ্রত করতে মুক্ত চিন্তনের দিক নির্দেশনায়। স্তব্ধ জড়চিন্তা ও স্থবির বুদ্ধিবৃত্তির বিপক্ষে তিনি উন্মোচন করেছেন আলোকিত পথের।

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয়কুমার দত্ত উভয় দার্শনিকই ইহজাগতিকতা ও মানবতাবাদে বিশ্বাসী এবং সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে বাংলার রেনেসাঁসের মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮২০ সালের ১৫ জুলাই নদীয়া জেলার নবদ্বীপের চুপীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পীতাম্বর দত্ত অতিশয় মহৎ, দয়ালু ও পরোপকারী লোক ছিলেন। সামান্য বাংলা জানা পীতাম্বর দত্ত কলকাতায় খিদিরপুরের আদিগঙ্গার কুলঘাটের একজন ক্যাশিয়ার ও দারোগা ছিলেন।[১] মাতা দয়াময়ীর অনেক আদরের সন্তান অক্ষয় কুমার দত্তের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হওয়ার এবং সবকিছু জানার ব্যাপারে ছিল অদম্য কৌতূহল। অক্ষয়কুমার দত্তের ছিল জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ এবং জগৎ রহস্যের প্রতি কৌতূহল। নিতান্ত বাল্য বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুর নিকট বিঘাকালি অঙ্ক করতে করতে অক্ষয় কুমারের মনে এক অভিনব ও বিস্ময়কর প্রশ্ন উদয় হয়। অক্ষয় কুমার দত্তের উপর যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে একজন গবেষক নবেন্দু সেন লিখেছেন :

> মৃতবৎসা জননী দয়াময়ীর বড় আদরের সন্তান ছিলেন অক্ষয়কুমার। শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির বালক অক্ষয় কুমারের সবকিছু জানবার এক অদম্য কৌতূহল এবং লেখা-পড়া শিখে বড় হবার এক প্রবল আগ্রহ ছিল। সাধারণত বালক বয়সে যখন সকলে খেলাধুলায় সময় কাটাতে ভালোবাসে, তিনি সে সময় পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বেশি। কথিত আছে, কাঠালির অঙ্ক কষতে কষতে তিনি পৃথিবীর আয়তন কত জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতেন বার বার। বিশ্রাম, গুরুজনের নিষেধ কিছুই তাকে তাঁর পড়াশুনায় আগ্রহ থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। চাণক্য শ্লোক 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' শৈশব থেকেই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে।[২]

অক্ষয়কুমার দত্ত সাধারণত যে বয়সটা খেলাধুলা করে কাটানোর সময় সে বয়সেই শান্ত ও গম্ভীর স্বভাবের বালক পড়াশোনা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকলেন। ১৮২৫ সালে চুপীগ্রামের গুরুচরণ সরকারের পাঠশালায় তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। এরপর তিনি গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং প্রবল মেধার অধিকারী হওয়ায় ভাবল প্রমোশন পেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু পিতার আকস্মিক মৃত্যুর কারণে উনিশ বছর বয়সেই বিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে তাকে অর্থ উপার্জনে নামতে হয়। সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২খ্রি.-১৮৫৯খ্রি.) সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৮৩৯ সালে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে গঠিত 'তত্ত্ববোধিনী'[৩] সভার সদস্য হন। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপাত্র রূপে যেমন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আবির্ভাব তেমনি এর কার্যকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন *তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা*। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষি পাঠশালার আদর্শে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতার সিমলা-পল্লী, অধুনা রামদুলাল সরকার স্ট্রীটের দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির বৈঠকখানা ভাড়া করে পাঠশালার কাজ আরম্ভ করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত শুরু থেকেই এর শিক্ষকতার[৪] কাজে ব্রতী হন।তত্ত্ববোধিনী স্কুলে শিক্ষকতা করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল একটি আদর্শ ও কার্যকর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে এ পাঠশালাটি প্রতিষ্ঠা করা। ১৮৫৫ সালে তিনি নরমাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ[৫] গ্রহণ করেন।[৬]

এন্তাজ আলী মাতুব্বর ও রবেজন বিবির পুত্র আরজ আলী মাতুব্বর ছিয়াশি বছরের জীবদ্দশায় সত্তর বছর কাটিয়েছেন সমাজ সেবা আর জ্ঞান সাধনায়। ছোট সন্তান বলে তার মা তাঁকে আদর করে 'কুভি' (বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় ছোটকে 'কুত্তি' বা 'কুভি' সম্বোধন করা হয়) বলে ডাকতেন। তাঁর মা কখনো উপলব্ধি করতে পারেননি এই 'কুভি'ই বড় হয়ে কত বড় হতে পারবেন। মাতুব্বর সাহেব ছোটবেলায় ছবি আঁকা শুরু করলে পাড়াপ্রতিবেশীরা এটাকে গুনাহের কাজ মনে করে মায়ের কাছে বন্ধ করার অনুরোধ করলে মা আফসোস করে বলতেন, "আল্লাহ, তুমি সকলকে দেলা পুত, আর আমায় দেলা ভূত।"[৭] কিন্তু তিনি জানতেন না তাঁর এই সন্তানই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লিখে কুসংস্কারের ভূত তাড়ানোর উদ্যোগ নেবে। আমিনুল ইসলামের ভাষায়, "শত প্রতিবাদ প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে একই নিরাপোষ দুঃসাহসিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন পাড়াগাঁয়ের স্বশিক্ষিত প্রতিবাদী লেখক ও দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর। তিনি আজন্ম লড়াই করেছেন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে।"[৮]

মাত্র চার বছর বয়সে ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে আরজ আলী মাতুব্বর পিতার মৃত্যুর কারণে তাঁর জমি ও বসতঘরটি জমিদার ও মহাজনরা দেনার দায়ে নিলাম করে নিয়ে যায়। ফলে স্বামীহারা, বিত্তহারা ও গৃহহারা মা গ্রামের মানুষের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে কালাতিপাত করতেন অনেক দুঃখের মধ্যে ছোট একটি ঝুপড়ি ঘরে। গ্রামে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় মুন্সি আব্দুল করিমের শরীয়তী শিক্ষা একটি মক্তবে এতিম আরজ আলী মাতুব্বর অবৈতনিকভাবে ভর্তি হয়ে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ এবং বানান-ফলা পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৯] এর পরবর্তীতে তাঁর আত্মীয় প্রদত্ত রামসুন্দর বসাকের বাল্য শিক্ষা নামক বইখানা পড়ে শেষ করেন।

আরজ আলী মাতুব্বর মাত্র ছিয়াশি বছরের জীবনে প্রায় সত্তর বছর জ্ঞান সাধনা করেছেন। নিজের শ্রম, বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে আর্থিক অবস্থার উন্নতি করে জমিদার ও মহাজনদের কাছ থেকে বন্ধককৃত জমিজমা উদ্ধার করেছেন। শান্ত ও নম্র স্বভাবের আরজ আলী নিজের প্রচেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছেন। কৈশোরের যে তিক্ত ঘটনা তাকে সত্যসন্ধ করে তোলে, তা হলো তাঁর মৃত মায়ের ছবি তোলার দায়ে মৃতদেহ কেউই জানাজা পড়ে দাফন করতে রাজি না হলে – শেষে বাড়ির কয়েকজন লোক মিলে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মায়ের সৎকার করেন। আরজ আলীর মাতুব্বর এর ভাষায়, ... "কতিপয় অমুচ্ছলি নিয়ে জানাজা ছাড়াই আমার মাকে সৃষ্টিকর্তার হাতে সোপর্দ করতে হয় কবরে"।[১০] এভাবেই সামাজিক আঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে আরজ আলী মাতুব্বর ধর্ম এবং বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের মূল সত্যকে উদঘাটনে সচেষ্টা হন। কারণ মার মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর মনে ভীষণভাবে আলোড়ণের সৃষ্টি হয়। সামাজিক সংস্কার, যুক্তি ও বুদ্ধিহীনতার বিরুদ্ধে তিনি দ্রোহী হয়ে ওঠেন। আপন চিন্তা-চেতনাকে সংহত করে, আপন মহিমায় আপন মনে জিজ্ঞাসার জাল বিস্তার ঘটাতে থাকেন। জিজ্ঞাসায় জর্জরিত করতে থাকেন সমাজের চলমান সনাতনী মূল্যবোধকে এবং আমৃত্যু এই প্রক্রিয়ায় মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচর্চার উন্মোচনের লক্ষ্যে লড়াই করে যান। আরজ আলী অধ্যয়ন করেছেন ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ। অক্ষয় কুমার দত্তের মতো 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে'- চানক্যের এ শ্লোকটি তাঁকেও হয়তো বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করতে লাগল। সাধারণত যে বয়সটা খেলাধুলা করে কাটানোর কথা সে বয়সটায় আরজ আলী মাতুব্বরও ব্যস্ত থেকেছেন জ্ঞান সাধনায়।

বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি, বি.এম কলেজ লাইব্রেরি ও অন্যান্য বিদ্বৎজনের[১১] পারিবারিক লাইব্রেরিতে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রাপ্ত অধিকাংশ গ্রন্থ অধ্যায়ন করেছেন তিনি। তা ছাড়া ১৯৬১ সালের সাইক্লোনে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের কয়েক হাজার বই ঘরসহ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কীর্তনখোলা নদী, যেখানে বই হারানোর শোক ছিল পুত্রশোকের সমান। আপনার ভেতর জন্ম নেওয়া অফুরন্ত জীবন জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর খুঁজতেন পুস্তকের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারে। এভাবে ১৯১৪ খ্রি. তাঁর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেলেও খুলে গিয়েছিল পৃথিবীর পাঠশালা। বিশ্বশ্রুত কথাশিল্পী ম্যাক্সিম গোর্কী সমৃদ্ধ হয়েছিলেন যে পাঠশালায়– তাঁর বাকি জীবন তিনি লেখাপড়া করেছেন পৃথিবীর পাঠশালায়।[১২]

বাংলা সাহিত্যের আদি উপাদান পুঁথি সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহের কারণে তিনি জয়গুন, সোনাভান, জঙ্গনামা, মোক্তল হোসেন ইত্যাদি পুঁথি সমাপ্ত করেন।[১৩] বস্তুত, স্বতঃস্ফূর্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তিনি জ্ঞান চর্চা করেছেন, ভেবেছেন নিজেকে নিয়ে এবং প্রমাণ করেছেন :

> জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে শুধু আপন বিশ্বাসই নয়, সকল মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সকল ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা দরকার প্রতিটি জ্ঞানপিপাসু মানুষের। শুধু সীমাবদ্ধ পরিমণ্ডলে আবদ্ধ হলে চলে না। সীমানাকে অতিক্রম করে যেতে হবে ক্রমান্বয়ে। এর মধ্যেই ক্রমশ অতিক্রম করা যাবে নিজেকে।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আরজ আলী মাতুব্বরের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেলেও ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে পৈতৃক পেশা কৃষিকাজে নিযুক্ত হয়ে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমিনের কাজ (জমি জরিপকারী বা ল্যান্ড সার্ভেয়ার) শিখে ফেলেন। এবং ১৯২৫ সালে জমি জরিপের কাজকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সৎভাবে এ পেশায় কার্যপরিচালনা করে মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দেন। গাণিতিক ও জ্যামিতিক নিয়মের ওপর তাঁর অসম্ভব দখল থাকায় আমিন পেশায় প্রচুর সাফল্য অর্জন করেন। বিশেষ করে সূক্ষ্ম মাপ ও বণ্টনে তাঁর বিস্ময়কর কাজ সবাইকে আলোড়িত করেছিল। জানা যায়, যারা আরজ আলী মাতুব্বরের বিভিন্ন কাজ বা মতের বিরোধিতা করেছে এবং শত্রু মনে করেছে, তারাও নিজেদের জমিজমার মাপের কাজে মাতুব্বরকে ডাকতেন। উদাহরণস্বরূপ চরমোনাইয়ের পীর এবং তৎকালীন জমিদার হরেন্দ্র বকশীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও এদের দু'জনের সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের আদর্শগত সংগ্রাম ছিল। তথাপি তাঁর সততা ও দক্ষতার কারণে দু'জনেই তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এবং জমি উপহার দিয়েছিলেন।[১৫]

অক্ষয়কুমার দত্ত তীব্র প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলার অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় :

> যিনি বাংলার নৈয়ায়িক প্রতিভা, এবং ১৯শ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদী দার্শনিক মনীষী জেম্‌স মিল, জেরিমি বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল, স্কটল্যান্ডের ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্ট এবং ফরাসী দেশের অগুয়েস্ত কোঁতের যুক্তিজীবী বিশ্ব-দীক্ষাকে বুদ্ধির রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মিলাইয়া দিয়া বাঙালিকে ১৯শ শতাব্দীর উন্মুক্ত রাজপথে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহার বাল্যের প্রতি আমাদের স্বতঃই কৌতূহল সঞ্চারিত হয়। প্রসিদ্ধ নরুকরোটী বিশারদ (ক্রেনলজিস্ট) কালীকুমার দাস যুবক অক্ষয় কুমারের মস্তক বিচার করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, 'I see a crown of intellect over his forhead.'[১৬]

জগৎ ও জীবনজিজ্ঞাসায় সারাজীবন ধরেই অক্ষয়কুমারের জীবনে আলোড়িত হতো। সমগ্র জীবন ধরেই তিনি পড়াশোনা করেছেন এবং লিখেছেন। আরজ আলী মাতুব্বর সাধারণ পরিবেশ থেকে উঠে এসেও চিন্তার জগতে তিনি বিচরণ করতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাই হাসানাত আব্দুল হাইয়ের ভাষায়, "তাঁকে দেখে মনে হয়েছে এমন এক প্রতিভা, যিনি ভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্যদেশে জন্ম নিলে সত্যি সত্যি গ্যালিলিওর মতো খ্যাতমান হতে পারতেন।" *সত্যের সন্ধান* বই সম্পর্কে হাসানাত আব্দুল হাই মন্তব্য করেন:

> বিস্ফোরণের মতো তার চিন্তা ভাবনা উৎসারিত হয়েছে শব্দের মালায়। কেবল অগতানুগতিক, অপ্রচলিতভাবে চিন্তা-ভাবনাই নয়, নৈয়ায়িকের মতো নির্ভুল নির্দেশ করে সাজানো তাঁর যুক্তি আর

Dhaka University Institutional Repository

> বিশ্লেষণের সামনে হতবুদ্ধিকর হতে হয় অসচেতন পাঠককে। পঠনে এমন অভিজ্ঞতার জন্য কেউই প্রস্তুত থাকে না, আর পাঠককে চমকে উঠতে হয় প্রতিপদে। বিস্ময় জাগে কীভাবে একজন স্বশিক্ষিত মানুষ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আর জ্ঞানচর্চায় সুবিধা ছাড়াই এমন বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার অধিকারী হতে পারেন। ... অনুকূল পরিবেশে জীবনযাপন করলে আরজ আলী মাতুব্বর অনায়াসেই হতে পারতেন বিশ্বনন্দিত একজন মনীষী। তবু সান্ত্বনা এই যে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জীবন সংগ্রামের কঠিন ব্রতে এবং পরিবেশের বৈরিতায় তিনি সম্পূর্ণ হারিয়ে যাননি। এই যে হারিয়ে না যাওয়া, প্রতিকূল পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ না করা এবং কুয়ো থেকে বেরিয়ে এসে আকাশকে পরিপূর্ণভাবে দেখার স্পর্ধা–এই হলো আরজ আলী মাতুব্বরের উত্তরাধিকার।[১৭]

আরজ আলী মাতুব্বরও সারাজীবন লেখাপড়া করেছেন, তবে প্রতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুযোগ তাঁর হয়নি। লেখাপড়ায় তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করে গ্রামের একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি তাঁকে সীতারাম বসাকের একখানা আদর্শলিপি বই কিনে দেন। সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল এ বইখানি এবং তা তিনি অতি উৎসাহে আনন্দের সঙ্গে আত্মস্থ করে ফেলেন। প্রবল আগ্রহ নিয়ে তিনি বিনাবেতনে ভর্তি হয়েছিলেন গ্রামের এক মক্তবে। যেখানে শুধুমাত্র দরিদ্র কৃষকের ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করতো। মক্তবে ভর্তির পর কোনোরকম বই কেনার টাকা যোগাড় করলেও মক্তবের বেতন দেওয়ার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। এভাবে অর্থনৈতিক অসাচ্ছল্যের কারণে এক বছরের মাথায় চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় মক্তবটিসহ আরজ আলী মাতুব্বরের লেখাপড়ার পাঠ।

অক্ষয়কুমার দত্ত শৈশব থেকেই বই পাঠ করে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা মিটিয়েছেন। জ্ঞানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং জগৎ-রহস্যেরপ্রতি কৌতূহল সাধারণত মানুষের চিত্তকে দু'দিক থেকে আকর্ষণ করে। নিতান্ত বাল্যবয়সে গ্রাম্য পাঠশালার গুরুর নিকট বিদ্যাকালি অঙ্ক কষতে-কষতে অক্ষয়কুমারের মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তা যেমন ছিল অভিনব, তেমন ছিল বিস্ময়কর :

> বাল্যকালে কলাপাতায় বিদ্যাকালি কষিতে কষিতে তাঁহার মনে হইল, আচ্ছা, পৃথিবীটার কালি কত? ওটা কত বড়? উহার শেষসীমাই বা কোথায়?[১৮]

বিশ্বসীমা সম্বন্ধে এই কৌতূহল, এই জিজ্ঞাসা বাল্যে যাহার সূচনা, জীবনভর ছিল তাঁর সেই জিজ্ঞাসা। জীবনরহস্য সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধিৎসা অক্ষয়কুমার দত্তকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি।

আরজ আলী মাতুব্বরও তাঁর *সত্যের সন্ধ্যান* গ্রন্থের ছয়টি অধ্যায়ে যথাক্রমে আত্মা, ঈশ্বর, পরকাল, ধর্ম, প্রকৃতি ও বিবিধ বিষয়ক– ইত্যাদিতে বিভক্ত করেন এবং তাঁর চিত্তে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তা যেমন ছিল অভিনব, তেমন ছিল বিস্ময়কর। যেমন:

Dhaka University Institutional Repository

> আত্মা অধ্যায়ে – আমি কে? প্রাণ কি অরূপ না স্বরূপ? প্রাণ দেখা যায় কী? অনাচারী আত্মার কি জ্ঞান থাকিবে? ঈশ্বর অধ্যায়ে – আল্লাহর রূপ কী? স্রষ্টা কী সৃষ্ট হইতে ভিন্ন? ঈশ্বর কী স্বেচ্ছাচারী না নিয়মতান্ত্রিক? ঈশ্বর কি দয়াময়? পরকাল অধ্যায় – পাপ পুণ্যের ডায়েরি কেন? গোর আজাব কি ন্যায় সঙ্গত? পরলোকের স্বরূপ কি? স্বর্গ নরক কোথায়? ধর্ম অধ্যায়ে– আল্লাহ মানুষের মন পরিবর্তন না করিয়া হেদায়েতের ঝঞ্ঝাট পোহায় কেন? নাপাক বস্তু কি আল্লাহর কাছেও নাপাক? মেরাজ কী সত্য না স্বপ্ন? কতগুলি খাদ্য হারাম হইল কেন? পাপের কি ওজন আছে ইত্যাদি।[১৯]

উল্লেখ্য, আরজ আলীর প্রশ্নগুলো ছিল নির্বিচারবাদীর বিপরীতে। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রশ্ন ছিল পৃথিবীর তত্ত্ব সম্পর্কীয় জ্ঞান এবং তা নিতান্তই শিশু বয়সের প্রশ্ন। আরজ আলী মাতুব্বর পরিণত বয়সে প্রশ্ন রেখেছিলেন পৃথিবীর মানুষের ধর্মাচারের উপর। তিনি তার প্রশ্নের মাধ্যমে ধর্মকে হেয় করতে চাননি, তবে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রহস্যময় তথা যৌক্তিকহীন বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। উদ্দেশ্যে ছিল মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত করা। তাঁর প্রশ্ন ছিল পার্থিব বিষয় নিয়ে।

অক্ষয়কুমার দত্ত একুশ বছর বয়সে, বেদ ও বেদান্তকে প্রাচীন মনুষ্যজাতির সভ্যতার পরিচায়ক বলে মনে করতেন। তিনি *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় বেদের জ্ঞান কাণ্ড সম্বন্ধেও সংশয় উত্থাপন করেন এবং বেদ-বেদান্তকে 'মনুষ্য বিরচিত গ্রন্থ' বলে প্রচার করতেন। প্রকৃতপক্ষে অক্ষয় কুমারের সম্পাদনায় (১৮৪৩ খ্রি.-১৮৫৫ খ্রি.) *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে বাঙালির চিন্তার রাজ্যে যে বিপ্লব সূচিত করেছিল[২০] তার তুলনা এই যুগে দুর্লভ। ব্রহ্ম সমাজের পত্রিকা হয়েও এই পত্রিকা সমস্ত শিক্ষিত বাঙালির মনোভাবের বাহন হয়েছিল। এ ব্যাপারে সাহিত্যিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত :

> *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা তখন এখনকার মত একটি মাত্র সভার কাগজ হয় নাই, উহা তখন সমস্ত বাংলার ইউরোপীয় ভাব প্রচারের মিশনারি ছিল, উহা ধর্মসমূহ সম্বন্ধে কত যে নতুন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা যাঁহারা *তত্ত্ববোধিনী* আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন। বাঙালী ছেলেদের মধ্যে ইংরেজী ভাব প্রবেশ করান, সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা সাধিত হয়। তিনি বাঙালীর সর্বপ্রথম নীতিশিক্ষক।[২১]

অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর গুরুস্থানীয় জর্জ কুম্ব[২২] (১৭৮৮ খ্রি.-১৮৫৮ খ্রি.) এর *Constitution of Man* এবং *Moral Philosophy* নামক গ্রন্থদ্বয়ের দ্বারা তিনি নিজ ধর্মমত তৈরি করেছিলেন। তিনি মানবপ্রণীত কোনো ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা বিশ্বকেই বিশ্বেশ্বরের স্বরূপ বলে গ্রহণ করতেন। অক্ষয়কুমারকে সংশয়বাদী বা নিরীশ্বরবাদী বলার কোনো কারণ নেই। কারণ তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে কখনই সংশয় প্রকাশ করেন নাই। তাঁর ঈশ্বরবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে:

Dhaka University Institutional Repository

> হে মানব! একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখো, এই বিশ্বরূপ মহোচ্চ মঞ্চ তাঁহার মহিমা কেমন ব্যক্ত করিতেছে। সুস্নিগ্ধ, সুমন্দ মারুত তাঁহার চামর ব্যজন করিতেছে। শিশির-সিক্ত সরস তরুশাখা সকল উষাকালীন সুশীতল সমীরণ দ্বারা মন্দ মন্দ বিচলিত হইয়া শর শর শব্দ করতঃ তাঁহাকে স্তুতি করিতেছে। ... তাঁহার সুকোমল করুণা কমল কেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাঁহার প্রীতির সৌরভ বিশ্বের চতুঃসীমা পর্যন্ত কীদৃশ বিস্তৃত রহিয়াছে।[২৩]

এখানে লক্ষণীয়, অক্ষয়কুমার দত্ত বেদ বেদান্ত নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তীব্রভাবে তর্ক করলেও ঈশ্বরে তিনি কখনও বিশ্বাস হারাননি। অক্ষয়কুমার দত্তের মতে – সবই শাস্ত্র, বিজ্ঞানও শাস্ত্র, গণিতও শাস্ত্র, পুরাতত্ত্বও শাস্ত্র– বিশ্ব সংসারই শাস্ত্র। তিনি কোনো বিশেষ শাস্ত্র মানিতেন না– যে শাস্ত্রে মানুষের গভীরতম, অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণী আবদ্ধ আছে। যে শাস্ত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় এ ধরনের অধ্যাত্ম শাস্ত্রের প্রতি অক্ষয় কুমার দত্তের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু বিশ্ববস্তুর মূলে ঐশ্বরিক সত্তা আছে – সমস্ত বৈচিত্র, বৈশাদৃশ্য ও আপাত-বিরোধে ইত্যাদির যিনি উদ্ভাবক–সে ঈশ্বর সম্পর্কে অক্ষয় কুমারের সংশয় ছিল না। জ্ঞানবাদ তাঁকে নিরীশ্বরবাদ অথবা সংশয়বাদের অতলস্পর্শ গহ্বরে নিক্ষেপ করে নাই।[২৪] বিদ্যাসাগর যেমন পুরোপুরি অগাস্ট কোঁত[২৫]-এর অনুসারী ছিলেন, হিন্দু, ব্রহ্ম ইত্যাদি কোনো ধর্মের প্রতি তাঁহার অন্তরের নিষ্ঠা ছিল না; অক্ষয়কুমার অবশ্য একই আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়েও বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ-জ্যোত-বিজ্ঞান ও গণিতচর্চা করে পার্থিব নিয়মের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যদিও তিনি জর্জ কুম্ব ও কোঁতের তত্ত্বদর্শন জানিতেন তবুও তিনি ঈশ্বরবাদ ত্যাগ করেননি। তিনি অবশ্য ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনার যৌক্তিকতা স্বীকার করেননি।[২৬]

আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়ই ছিলেন মনে-প্রাণে মানবতাবাদী দার্শনিক। তাঁদের আচার-আচরণ, কর্ম, সামাজিক জীবন ধারা, ধ্যান ও মননে ছিলেন অতিশয় জীবনবাদী – যার জয়গান ছিল শুধু মানবিকমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাসহ মানবতার জয়গান করা। যে-কারণে দু'জনেই ধর্মবিশ্বাসের প্রচলিত পথকে শক্ত হাতে নাড়া দিয়েছেন। ধর্মবিশ্বাসকে পরখ করেছেন যুক্তির কষ্টিপাথরে দাঁড় করিয়ে। ধর্মের অর্থ খুঁজেছেন প্রাকৃতিক নীতিমালার অনুসরণে। এভাবে দেখা যায়, অক্ষয় কুমার দত্তের জীব সেবার নামে মানবতার প্রচার ও প্রসারের ধরন একটু ভিন্ন ধরনের।

অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রহ্মধর্মের অনুসারী হয়েও ধর্মকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর নিজস্ব মননে ও ব্রহ্মধর্মকে যুক্তিসিদ্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি শাস্ত্রীয় গোঁড়ামির পরিবর্তে প্রাকৃতিক নীতিমালা অনুসরণ করে যুক্তিবিচারের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবিচল থেকেছেন। ধর্ম সম্পর্কে অক্ষয় কুমার দত্ত অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ, প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় দেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় এভাবে:

Dhaka University Institutional Repository

> অখিল সংসারই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যা-কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গোতম ও কণাদ, এবং বেকন ও কোম্‌ত যেকোন প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও তলবকার, মুষা ও মহম্মদ এবং যীশু ও চৈতন্য পরমার্থ-বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের ব্রহ্মধর্ম্ম।[২৭]

এভাবে তিনি বাঙালির জীবন ও মননে নতুন চিন্তাচেতনার উদ্‌বোধক হয়ে ওঠেন। অক্ষয় কুমার দত্ত বাঙালি জাতির একজন প্রধান নির্মাতা পুরুষ। কারণ মানুষ নিজেই তাঁর নিজের সমাজ ও ভাগ্য নিজে গড়তে পারে– এ ধারণা অন্তত উনিশ শতকের পূর্বে ছিল না। ব্যক্তিগত মুক্তির লক্ষ্যে তখনকার ভারতবর্ষের মানুষ নানারকম পন্থা অবলম্বন করেছে। কেউ সন্ন্যাসব্রত, কেউ যোগসাধনা, কেউবা তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত সেখানে জাতিকে নতুন করে গড়ার লক্ষ্যে নতুন যুগের নতুন চিন্তা করতে শুরু করেন এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের চিন্তাচেতনার মধ্যে অক্ষয় কুমার নিয়ে আসেন এক নতুন বাণী। এভাবে তৎকালীণ ভারতবর্ষবাসীর চিন্তা আর অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তা-চেতনার পার্থক্য উন্মোচিত হয় ব্রহ্ম আন্দোলনের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ বাণীতে:

> আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না, আমি কোথায় আর তিনি কোথায়, আমি খুঁজিতেছি-ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ।[২৮]

অক্ষয়কুমার দত্তের সময় থেকেই আধুনিক ভারতবর্ষে ঈশ্বরের ধারণার পরিবর্তে মানবকেন্দ্রিক চিন্তা চেতনার শুরু হয়। মানুষের ভালো মন্দ নিয়েই তাকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে হয়– অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্ব আছে, তা' তাঁর আপন চেষ্টাতেই করতে হবে এ চেতনাবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় সম্পূর্ণভাবে অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বারা। মানুষই শক্তিসম্পন্ন প্রাণী তিনিই সর্বপ্রথম এ ধ্যানধারণার পরিচয় দেন। উনিশ শতকের পূর্বে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে এ চেতনা ছিল না। অক্ষয়কুমার, ঈশ্বর ভক্তির ভারতবর্ষে প্রথম সেই চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করেন। *বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার* ও *ধর্মনীতি* নামক দু'টি গ্রন্থে অক্ষয় কুমার দত্ত এই চেতনারই প্রতিষ্ঠা করেন। উনিশ শতকে বাঙালির চিন্তায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সাহিত্যে তার প্রথম প্রকাশ অক্ষয় কুমার দত্তের এই বইতে। তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের স্বাধীন স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা করা, যে বুদ্ধির প্রমাণ হলো প্রাকৃতিক নিয়মতত্ত্বে বিশ্বাস অর্জন। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রচেষ্টায় আমাদের মনোজগৎ থেকে সব রকম অস্পষ্ট ধারণা ও অলৌকিক ভাবনাকে দূরীভূত করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা উনিশ শতকের মনীষীদের চিন্তার সাধারণ প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষয়কুমার দত্তের ব্যবহৃত 'মানব প্রকৃতি' শব্দটা নতুন মানবত্ববোধের ইঙ্গিতবহ। অক্ষয়কুমার দত্তের মানবত্ববোধ, যার আভাস চণ্ডিদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই উক্তির মধ্যেও বিদ্যমান। তিনি মানুষের কথাসহ ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক পর্যায়ে বিশদভাবে ব্যক্ত করেছেন। "প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই মানুষের প্রাত্যহিক এবং সামাজিক কর্তব্য করতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা, স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা, শাস্ত্রীয়, মিথ্যা কর্মের অন্ধ অনুষ্ঠানের কথা তিনি বলেননি।"[২৯] অক্ষয় কুমার দত্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইউরোপিয় প্রকৃতিবাদ[৩০] (Naturalism) দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত অজ্ঞেয়বাদী হিসেবে পরিচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে নাস্তিক বলে মনে করতেন।[৩১] অক্ষয়কুমারের উপর গবেষণা করেছেন এমন এক ব্যক্তিত্ব রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমারকে অজ্ঞেয়বাদী বলে অভিহিত করেছেন।[৩২] অক্ষয়কুমারের মতে, এই বিশ্বজগৎ প্রকৃতির নিয়মের অধীন। বিশ্বজগৎ কোনো বিশ্বাতীত ঈশ্বরের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত নয়। তাঁর কাছে প্রকৃতির নিয়মই ঈশ্বরের নিয়ম। প্রার্থনার পরিবর্তে প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করলেই মানুষ সুখী হতে পারে। মানব-কুলের হিত সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা, এই ছিল তাঁর মত। এ সম্পর্কে তিনি মনে করতেন বিজ্ঞানই হলো সব জ্ঞানের আকর। মানুষের সমাজ জীবন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকৃতির নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত। তাই অক্ষয়কুমার প্রকৃতিবাদী চিন্তাকে ব্রহ্ম সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে নিজের আত্মীয়বর্গ, সমাজ ও দেশে তথা সমগ্র মানবকুলের প্রতি কর্তব্য পালন বিধেয় – এই হলো শ্রেষ্ঠ ধর্মের উপাসনা। *বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার*-এর দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন :

> বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য: এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশপূর্বক তৎসমুদয় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম।[৩৩]

আয়জ আলী মাতুব্বর অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি যে-কোনো বিষয়কে প্রাকৃতিক ঘটনাবলির সাহায্যে ব্যাখ্যা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি *অনুমান* গ্রন্থে বলেন:

> দেবতারা ছিলেন সর্ববিদ্যাবিশারদ, সর্বগুণে গুণী, জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত। ভক্তগণ তাঁদের অনুরক্ত হয়েছেন, ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে অর্চনা আরাধনা করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে অসংখ্য পশু বলি করেছেন (কেউ কেউ এখনও করে থাকেন) এবং নরবলিও দেওয়া হয়েছে কোন কোন দেশে। কিন্তু দেবগণের কোন জ্ঞানগুণের অনুশীলন করেন নি কোন ভক্তই। ... তিনি নাকি ছিলেন বজ্রবিদ্যুৎ সৃষ্টির অধিকর্তা। কিন্তু কোন ঋষিই তাঁর কাছে তাঁর উক্ত বিদ্যুৎ সৃষ্টির প্রণালিটা শিক্ষা করেননি বা

Dhaka University Institutional Repository

> করতে পারেননি। বিদ্যুৎ সৃষ্টির প্রণালি আবিষ্কার করেছেন ইটালীয় বিজ্ঞানী গ্যালভনি ও ভল্টা (১৭৬১)। দেবতারা বিমান বিদ্যায় ছিলেন সুনিপুণ। তাঁরা বিমানে (রথে) চড়ে আসতেন স্বর্গ থেকে মর্তে (পৃথিবীতে), ভ্রমণ করতেন যত্রতত্র।...কিন্তু দেবতাদের কাজ থেকে বিমান তৈরির কলা-কৌশল আয়ত্ত করেননি কোনো মুনি-ঋষিই, তা আবিষ্কার করেছেন আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ১৯০৩ সালে।[৩৪]

অক্ষয়কুমার দত্ত আমাদের মানবধর্মের প্রথম প্রবক্তা। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ীই তিনি মানুষের প্রত্যাহিক ও সামাজিক কার্যের কথা বলতেন। তিনি কখনো ঈশ্বরের ইচ্ছা, স্বর্গ লাভের আকাঙ্ক্ষা ও শাস্ত্রীয় মিথ্যা কর্মের জন্য অন্ধ আনুষ্ঠানিকতা স্বীকার করেননি। পৃথিবীর প্রচলিত কোনো ধর্মের প্রতিই তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। তাই ব্রহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেও তিনি প্রার্থনাকে অস্বীকার করেছেন। পরিবর্তন আনেন ব্রহ্মধর্মের প্রার্থনা পদ্ধতিতে। এভাবে ব্রহ্মসমাজে তিনি সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলায় প্রার্থনার প্রবর্তন করেছেন। ব্রহ্মের উপাসনায় পুষ্প, চন্দন, নৈবাদ্যাদি ব্যবহারের তিনি বিরোধী ছিলেন। ব্রহ্মসমাজের সাথে যুক্ত হয়েও তিনি বিজ্ঞান-নির্ভর দৃষ্টিতে সবকিছু দেখতেন।[৩৫] ধর্ম সম্পর্কে অক্ষয় কুমারের প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক মতবাদের জন্য অনেকেই তাঁকে সমালোচনা করেছেন। ব্রহ্ম সমাজের সঙ্গে তার বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে *ইন্ডিয়ান মিরর* পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, ব্রহ্ম সমাজের নেতিবাচক সমালোচনা এবং এর ক্রিয়াকলাপের ধ্বংসাত্মক অংশটি ত্রিশ বছর পূর্বে প্রধানত তাঁর দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে।[৩৬]

পৃথিবীতে প্রচলিত কোনো ধর্মই অক্ষয় কুমার দত্তকে আকর্ষণ করেনি। ধর্মকে তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে একটি সমীকরণের সাহায্যে প্রার্থনার অসারতা প্রমাণ করেন। তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের প্রমাণ রয়েছে তাঁর একটি বিস্ময়কর সমীকরণে। তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালিতে প্রার্থনার শক্তি যে অসার তাহা প্রমাণ করেন এভাবে:

$$\text{পরিশ্রম} = \text{শস্য}$$

$$\text{পরিশ্রম}+\text{প্রার্থনা} = \text{শস্য}$$

$$\text{অতএব প্রার্থনা}=0$$

এভাবে অক্ষয়কুমার দত্ত কৃষক ও শস্যের উপমা দিয়ে বীজগণিতের সরল সমীকরণের সাহায্যে ঈশ্বরের প্রার্থনার অনাবশ্যকতা প্রমাণ করেন এবং ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনার যৌক্তিকতাও অস্বীকার করেন। অক্ষয়কুমার দত্তের মতে, "কৃষিজীবী লোক পরিশ্রম করিয়া শস্য লাভ করে; কিন্তু জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনা দ্বারা কোনো কৃষাণের কস্মিনকালেও শস্য লাভ হয় নাই।"[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে বাঙালি জাতিকে নতুন চিন্তা, চেতনা, নতুন ভাষা, মত ও পথের গৌরবস্পৃহায় সমস্ত দিক থেকে নির্মাণ করার প্রচেষ্টাই ছিল উদগ্র বাসনা। তবে তাঁর দরিদ্র্যতা, পরাধীনতা এবং প্রতিভাই ছিল এর মূল উদ্গাতা। কারণ স্বভাবতই দেখা গেছে পৃথিবীর বড় বড় জ্ঞানী-গুণী কর্মীরা স্বমহিমার আলোকেই বর্তমানকে চিনে নিতে ভুল করেননি। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন:

> অক্ষয় কুমারকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী পুরুষ নিঃসন্দেহে বলা চলে। অপ্রমাণ্য অনুভূতির প্রামাণ্য তিনি স্বীকার করেননি চিন্তার ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত অনুভূতির দোহাই দিয়ে বিচারকে ঠেকিয়ে রাখার যে রেওয়াজ বহুকাল থেকে চলে আসছিল চিন্তার জগতে অক্ষয়কুমার রুখে দাঁড়ালেন তার বিরুদ্ধে। অনুভূতির প্রামাণ্যকে বিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপসারিত করবার তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য আত্মপলব্ধিতে বিশ্বাসবান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয় কুমারের মতবিরোধ ঘটেছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সত্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী অক্ষয় কুমার যুক্তিবাদের পথ থেকে মুহূর্তের জন্য ও সরে যাননি।[৩৮]

আসলে অক্ষয়কুমার দত্তের মতো যুক্তিবাদী ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং তাঁর অণুপ্রেরণায়ই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালির অন্তরে যুক্তিবাদের ও বাস্তবাদের জয় সূচিত হয়ে ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের মতে:

> বস্তুজগতের মূলে আছে তদভাবাত্মক কারণসমূহ; সেই বাস্তব কারণ হইতে বস্তুসত্ত্বার কার্যরূপের অস্তিত্ব স্বীকৃতি হইতেছে। ঈশ্বর প্রার্থনারূপ কোনো নির্বস্তুক কারণ কল্পনার প্রয়োজন নাই। এমন কি তিনি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে প্রার্থনা উঠাইয়া দিবারও প্রস্তাব করিয়াছিলেন।[৩৯]

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রার্থনায় বিশ্বাস করতেন না বলে কলকাতার অনেকেই তার ধর্ম্মকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্ত যে সংশয়বাদী হয়েছিলেন তা তার সমগ্র রচনায় কোনো প্রমাণ নেই। এমনকি *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সময় তিনি যখন বালি গ্রামে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন, তখনো তিনি ঈশ্বর বিশ্বাস ত্যাগ করেননি। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি কারুণিক ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। সুতরাং শেষ বয়সে তিনি নাস্তিক বা সংশয়বাদী হয়েছিলেন-তা মোটেই সত্য নয়। অন্তত তাঁর শেষতম গ্রন্থ থেকে এর সপক্ষে কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় না। তাঁর *বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* -দুই খণ্ড, *ধর্মনীতি*, এবং *চারুপাঠ* তিন খণ্ড, ইত্যাদি গ্রন্থের কোথাও সংশয়বাদের চিহ্ন নেই। তবে তিনি বেদ-বেদান্তকে অভ্রান্ত, অপৌরুষেয় মনে করতেন না। প্রথম জীবনে তিনি হিন্দুর তন্ত্র-পুরাণে আস্থা হারিয়েছিলেন। ভূগোল রচনার জন্য– তিনি পুরাণের তন্ত্রে যেসমস্ত ভৌগোলিক বিবরণ আছে, তা অযথার্থ, মিথ্যা ও কাল্পনিক বলে

Dhaka University Institutional Repository

পরিত্যাগ করেছিলেন। অক্ষয় কুমারের গ্রন্থাদি পাঠে তাঁকে জর্জ কুম্বের অনুরূপ যুক্তিবাদী আস্তিক বলেই মনে হয়।[৪০] অপর দিকে আরজ আলী মাতুব্বরকেও প্রগতিশীল মতবাদের জন্য ধর্মীয় গোঁড়াপন্থীদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। *সত্যের সন্ধান* বই প্রকাশের ক্ষেত্রে পদে পদে বাঁধার সৃষ্টি করেছে একটি মহল। কিন্তু ধর্মের সমালোচক হলেও তিনি যথার্থ ধর্মের বিরোধী ছিলেন কি-না তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তার লড়াই ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, ধর্মের নামে প্রচলিত ধর্মান্ধতা ও ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

লোকদার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী। বৈজ্ঞানিক প্রয়োগপদ্ধতির সমর্থনে আরজ আলী মাতুব্বরের সব কথার মূলে রয়েছে জ্ঞানানুশীলনের ও সত্য আবিষ্কারের দুর্বার প্রেরণা। তিনি প্রকৃতপক্ষে ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ছিলেন। ধর্মের নামে প্রচলিত ধর্মান্ধতা ও ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন স্বোচ্চার। প্রকৃতপক্ষে কুসংস্কার ত্যাগ করার অর্থ ধর্মকে ত্যাগ করা নয়। আরজ আলী মাতুব্বরের নিজের উক্তি থেকে এ কথা আরো স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়:

> প্রকৃতপক্ষে কুসংস্কার ত্যাগ করার অর্থ ধর্মকে ত্যাগ করা নয়। এ প্রসঙ্গে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। আমাদের অভিযান শুধু অসত্য বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। কোন ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, প্রত্যেকটি ধর্ম থাকিবে মিথ্যার আবর্জনাবর্জিত ও পবিত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৪১]

আরজ আলীর মতে প্রত্যক্ষণ, অনুমান ও যুক্তি প্রমাণের উপর যে বিশ্বাস, তাই প্রকৃত জ্ঞান। তাঁর মতে দরিদ্রতা মানুষকে ভালো-মন্দো, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি যে কোনো দিকে সে নিয়ে যেতে পারে। মানুষের জীবনের জন্য এটি এমন একটি দুর্দৈব ঘটনা যা অনেক সময় প্রতিভাবানদের পক্ষেও অতিক্রম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

জীবনের প্রথমভাগে,আরজ আলী মাতুব্বর মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও প্রচলিত ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি গ্রহণ করতে পারেননি। অক্ষয় কুমার দত্তের মতো তিনি ইসলাম ধর্মের রীতিনীতিকে যুক্তিসিদ্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। মায়ের মৃত্যুর অবমাননাকর ঘটনায় তিনি ধর্মীয় অনুশাসন থেকে বেড়িয়ে অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গে অনুপ্রাণিত হন। মায়ের মৃত্যুর স্থবি তোলাকে কেন্দ্র করে ধর্মান্ধ মুসল্লিদের অবমাননাকর ঘটনা আরজ আলী মাতুব্বরের মনে একদিকে যেমন চরম দুঃখের সঞ্চার করে, তেমিন তাঁর চোখের সামনে থেকে দুর হয়ে যায় হাজার বছরের একটা নিষ্কলুষ কালো

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকার। মায়ের মৃত্যুপরবর্তী অবমাননায়ই তাঁর ব্যক্তিত্ব রূপান্তরিত হয় চরম বিদ্রোহে। ক্রমে ক্রমে আরজ আলী তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে হয়ে ওঠেন যুক্তিবাদী। কথা বলেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং বিজ্ঞানের পক্ষে। তাঁর সব চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিজ্ঞান। কঠোর এবং একনিষ্ঠ সাধনার মধ্য দিয়েই তিনি অর্জন করেছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রগতিশীল মতবাদের জন্য কমিউনিস্টের অভিযোগে তাকে কারাগারে পর্যন্ত যেতে হয়েছে; সহ্য করতে হয়েছে ধর্মগোঁড়াপন্থীদের অত্যাচার-নির্যাতন। তাঁকে অনেক বাধার সম্মুখিন হতে হয়েছে *সত্যের সন্ধান* বই প্রকাশে। প্রকৃতপক্ষে আরজ আলীর সমালোচনা ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না; ধর্মের নামে প্রচলিত ধর্মান্ধতা ও ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল। তাঁর অভিযান ছিল শুধু অসত্য বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের মতো আরজ আলী মাতুব্বর ধর্মবিশ্বাসের প্রচলিত পথকে শক্ত হাতে নাড়া দিয়েছেন, ধর্মকে পরখ করেছেন যুক্তির কষ্টিপাথরে। ধর্মের অর্থ খুঁজেছেন প্রাকৃতিক নীতিমালার অনুসরণে। তিনি জানতে চেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববাসীকে জানাতে চেয়েছেন, জীবন কী? জগৎ কী? শান্তি কেন? সৃষ্টি কী? শ্রষ্টা কে? তিনি কেমন? এর উদ্দেশ্য কী? আত্মা কী? চৈতন্য কী? আত্মার অমরত্বের কারণ কী? প্রয়োজন কী? যুক্তি কি?[৪২] ঐসকল প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি অক্ষয় কুমার দত্তের মতো প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র, বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য, গৌতম, ভাস্কর, আর্যভট্ট, বেকন, মুসা, মুহম্মদ, যিশু ও চৈতন্য – যা কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন তাও আমাদের ধর্মশাস্ত্র।

এভাবে তিনি বাঙালির তথা জগৎবাসীর জীবনে ও মননে সৃষ্টি করেছেন নতুন চিন্তা-চেতনার উৎস। মানবজাতিকে সমহিমায় আত্মমর্যাদাপূর্ণ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মুক্তবুদ্ধির লক্ষ্যে- বাঙালি জাতির তিনি ছিলেন একজন শক্তিমান নির্মাতা পুরুষ। মানুষের নিজেকেই তাঁর নিজের সমাজ ও ভাগ্য গড়তে হবে। তৎকালীন বাংলায় এবং বর্তমানে এ ধরনের চিন্তা-চেতনার বড়ই প্রয়োজন ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের মতো আরজ আলী কখনো ঈশ্বরের ইচ্ছা, স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা ও শাস্ত্রীয় মিথ্যা কর্মের জন্য অন্ধ আনুষ্ঠানিকতা স্বীকার করেননি। অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণেই তাঁর মনে ইসলামের অনুশাসনের দীক্ষা গ্রহণ ও আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বর প্রাপ্তি গ্রহণ করতে পারেননি। অন্যদিকে তিনি বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকেই একমাত্র সত্য জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান বিরোধী কোনো শিক্ষাই গ্রহণীয় নয়। তাই অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন সমীকরণের সাহায্যে প্রার্থনার অসারতা প্রমাণ করেন; আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শন বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ ধরনের একটা সমীকরণ খুঁজে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান = সত্য জ্ঞান

বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান+ধর্মাচার = সত্য জ্ঞান

ধর্মাচার = ০

আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শন বিশ্লেষণে দেখা যায় তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক সত্যজ্ঞানের অনুসন্ধান করে ধর্মাচারের অসারতা প্রমাণ করেন। এভাবেই আরজ আলী মাতুব্বর বাঙালি জাতিকে নতুন চিন্তা-চেতনা, মত ও পথ ইত্যাদি সবদিক থেকে নির্মাণ করার এক বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। দরিদ্রতা, পরাধীনতা এবং প্রতিভাই ছিল আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তা-চেতনার মূল্য উদ্‌গাতা। অক্ষয় কুমার দত্তের মতো আরজ আলী মাতুব্বরও ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী পুরুষ। যে অনুভূতি প্রমাণ করা যায় না- তা তিনি কোনো ক্রমেই গ্রহণ করেননি। সমাজে দীর্ঘদিন ধরে বিচারকে ঠেকিয়ে রাখার যে রেওয়াজ বহুকাল চলে আসছিল আরজ আলী মাতুব্বর তারও বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর নিজের লেখাতেই এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়:

> আমার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে দীর্ঘ আঠারো বছর কঠোর সাধনা করে ধর্মীয় কতিপয় অন্ধবিশ্বাসকে দর্শনের উত্তাপে গলিয়ে তা বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢেলে তার একটি তালিকা তৈরি করছিলাম- প্রশ্নের আকারে ১৩৫৭ সালে। এ সময় স্থানীয় গোঁড়া বন্ধুরা আমাকে 'ধর্মবিরোধী' ও নাখোদা' (নাস্তিক) বলে প্রচার করতে থাকে এবং আমার সে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম ছেড়ে শহর পর্যন্ত। লোক পরম্পরায় আমার নামটি শুনতে পেয়ে তৎকালীন বরিশালের ল-ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও তাবলিগ জামাতের আমীর জনাব এফ. কবির সাহেব সদলে আমার সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ন হন।... যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বরিশালে গিয়ে তিনি আমাকে এক ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ করেন 'কম্যুনিষ্ট' আখ্যা দিয়ে।[৪৩]

সে মামলায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরজ আলীর জাবানবন্দির তলবের ফলে উদ্ভব হয় *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। এ পাণ্ডুলিপির বদৌলতে সেবার তিনি লৈহিক নিষ্কৃতি পেলেও তাঁকে মানসিক শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে বহু বছর। এমনকি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তার উপর কিছু বিধিনিষেধও আরোপ করে দেন। যেমন *সত্যের সন্ধান* বইসহ ধর্মীয় সনাতন মতবাদের সমালোচনামূলক অন্য কোনো বই প্রকাশ করা যাবে না এবং সভা-সমিতিতে নিজের মত প্রচার করা যাবে না – অন্যথা তাকে পুনরায় ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হবে। ফলে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবনের অমূল্য ২০টি বছর নষ্ট হয়ে যায়।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালে ২২ বছর পর *সত্যের সন্ধান* বই প্রকাশিত হয়। এরপর *সৃষ্টি রহস্য*, *মুক্তমন*, *স্মরণিকা* ও *অনুমান* প্রভৃতি গ্রন্থ মায়ের মৃত্যুদিনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আরজ আলী নিজের ভাষায়:

> আমার প্রণীত বা সম্পাদিত আলোচ্য যাবতীয় পুস্তক পুস্তিকাই হচ্ছে আমার মায়ের মৃত্যুদিনের বাঞ্ছিত 'দামান্নার' অংশবিশেষ। এ ছাড়া আমার অন্যান্য কৃতকর্মেও রয়েছে ঐ একই প্রেরণা। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'মানবকল্যাণ'।[৪৫]

ফলে দেখা যায় অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন ছিলেন নতুন বাঙালি জাতির একজন প্রধান নির্মাতা পুরুষ; আরজ আলী মাতুব্বরও ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ব্যধিতে ঘুণেধরা বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে এক কালপুরুষ। মানুষ তার নিজের সমাজ ও ভাগ্য নিজে গড়তে পারে এমন ধারণা এই দুই মানবের মহাকালের ব্যক্তির প্রকাশ। উভয় দার্শনিকই মানবকল্যাণের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত মুক্তির নানা ধরনের পন্থায় উদ্বুদ্ধ করেছেন মানবজাতিকে। কেউ সন্ন্যাসব্রত, কেউ যোগসাধনা, কেউবা তন্ত্রমন্ত্র, অন্ধ কুসংস্কার, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় দার্শনিকই নতুন যুগের নতুন চিন্তা নিয়ে এলেন – নতুন করে জাতিটাকে গড়বার লক্ষ্যে। উভয়ই ঈশ্বরের ধারণা থেকে মানবকেন্দ্রিক ধারণার উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় রত ছিলেন।

উনিশ শতকের সমস্ত বাঙালি মনীষীর মুখে যে 'মানবতাবাদ' কথাটি নতুন অর্থ নিয়ে দেখা দেয়, তা আমাদের ঐতিহ্যে ছিল না। ইংরেজি 'হিউম্যানিজম'-এর বাংলা অর্থ হলো এ শব্দটি। কিন্তু মানুষের মধ্যেও আছে শ্রেষ্ঠত্ব যা একান্তই মানুষের ব্যক্তিগত। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা ভালো মন্দ নিয়েই যে তার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, তা তাঁর নিজ চেষ্টাতেই করতে হয়। মানুষের মধ্যে এই চেষ্টা নামক চেতনারই অভাব রয়েছে। এ-দুই দার্শনিকের মধ্যে একই সুর উপলব্ধি করা যায়, যা মানবতাবাদের মহান সৃষ্টির লক্ষ্যে নিতান্তই অপরিহার্য। উভয় দার্শনিকের ব্যবহৃত মানবপ্রকৃতি কথাটা এই নতুন মানবত্ববোধেরই ইঙ্গিত বহন করে। তাঁরা এমন মানুষের কথা বলেছেন যা চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য'– এই উক্তিকেও অতিক্রম করে গেছে। তাঁরা মানুষের কথা বলেই, ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক পর্যায়গুলি বিশদভাবে বলেছেন। প্রাকৃতিক নিয়মের গণ্ডির মধ্যেই যে মানুষের সামাজিক ও প্রাত্যহিক কর্তব্যসাধন করতে হবে, যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বর্গ লাভের আকাঙ্ক্ষা, শাস্ত্রীয় মিথ্যা কর্মের অন্ধ অনুষ্ঠানের কথা তাঁরা বলেন নি। আধুনিক মানবধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্রই তাঁদের দর্শনে পরিস্ফুটিত হয়। রামমোহন রায়ের একটি উক্তি তাঁদের বেলায় প্রণিধানযোগ্য: "কেবলমাত্র শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে কোনো কিছুর সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। বিচার যুক্তিহীন হলে ধর্মহানি

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে।"[৪৬] তাই দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ এই দুই দার্শনিকদের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী পুরুষ বলা চলে। চিন্তার জগতে ও তাঁরা কখনো অপ্রামাণ্য অনুভূতি স্বীকার করেননি। ব্যক্তিগত অনুভূতির দোহাই দিয়ে চিন্তা- জগতের বিচারকে ঠেকিয়ে রাখার যে রেওয়াজ বহুকাল থেকে চলে আসছিল, এ দুই দার্শনিকের অনুভূতি সর্বদাই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার।

সত্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব যুক্তিবাদের পথ থেকে মুহূর্তের জন্যও সরে যাননি। তাঁদের তপস্যা কেবলমাত্র বর্তমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অনাগত যুগের মধ্যেও তার সম্ভাবনা রেখে গেছেন। বাঙালি জাতিকে স্বাধীন চিন্তায় দীক্ষিত করাই ছিল তাঁদের মূলমন্ত্র। তাঁদের চিন্তা, বুদ্ধি হৃদয় সবই ছিল তাঁদের চরিত্রের মতোই সুঠাম ও সুগঠিত।

অক্ষয়কুমারের মতে বিশ্বজগৎ প্রকৃতির নিয়মে চলে। বিশ্বাতীত কোনো ঈশ্বরের নির্দেশে নয়। তাঁর কাছে প্রাকৃতিক নিয়মই ঈশ্বর সৃষ্ট নিয়ম। প্রার্থনার পরিবর্তে প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করতে পারলেই সুখী হওয়া যায়। তাঁর মতে, মানবকুলের হিত-সাধনা করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা। অক্ষয়কুমার দত্ত মনে করতেন বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের জীবন ও সমাজের নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত প্রাকৃতিক নিয়মের প্রয়োজনীয়তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন, অতীন্দ্রিয় সত্তার উপর মোটেই গুরুত্ব দেননি। তিনি প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়মকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই অবলোকন করেছেন এবং তারই প্রেক্ষাপটে তিনি মানুষ ও সমাজকে বিচার করেছেন। এ হিসাবে তাঁকে বস্তুবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত ধর্ম সম্প্রদায়কে ঐতিহাসিক কালক্রমে এবং তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকায় বিচার করে এক গভীর বিজ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।[৪৭] আধুনিককালে এ দেশে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা তিনিই প্রথম করেছেন। তার মতেঃ

> পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে যত দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য ছিল না। আপনাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন তৎকালের লোকের সম্যক বোধগম্য হয় নাই।[৪৮]

প্রাকৃতিক নিয়মে সুখের সন্ধানই হলো যথার্থ এবং স্বতঃসিদ্ধ। মানবজীবনের সাফল্য ও সার্থকতা আসে সুখের মানদণ্ডের মাধ্যমে। হিতবাদীরা[৪৯] সুখকেই সন্দেহাতীতভাবে সকলের কাছে মূল্যবান মনে করেন এবং তারই ভিত্তিতে মনুষ্য জীবনকে বিচার করেছেন। বেনথামের হিতবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তায় অক্ষয়কুমার বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের হিতবাদী চিন্তা ঐ সময়ে বাংলাদেশে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে হিতবাদী চিন্তার প্রভাব সম্পর্কে লেখক কেশবচন্দ্র সেন[৩০] মন্তব্য করেন: The politics of the age is Benthamism, its ethics Utilitarianism, its religion Rationalism, its philosophy Positivism."[৩১] বেনথামের হিতবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তা অক্ষয়কুমার দত্তকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। এর পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপরও হিতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। অক্ষয়কুমার ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ই হিতবাদী চিন্তা ধারার বিকাশ সাধন করেন। তবে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য ছিল। অক্ষয়কুমার হিতবাদকে দেখতেন ব্যক্তিমানুষের বিকাশের দিক থেকে। আর বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের সমষ্টিগত উন্নতির দিক থেকে হিতবাদকে দেখতেন। অক্ষয়কুমারের মতে, প্রাকৃতিক নিয়মে সুখ অর্জন সম্ভব। তিনি সুখ অর্জনকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। জড় জগতের রূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে ভৌতিক পর্যায়ে। মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর প্রক্রিয়ার দৈহিক নিয়মের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় শারীরিক পর্যায়ে। জৈব চেতনার বিশ্লেষণ এবং মানুষ ও পশুর ভিন্ন স্তরে নিহিত চেতনার কথা আলোচিত হয়েছে মানসিক পর্যায়ে। বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের জৈব প্রবণতাকে অক্ষয় কুমার বুদ্ধি, ধর্ম ও নিকৃষ্ট বৃত্তিতে বিন্যাস করেছেন। তাঁর এই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে অতীন্দ্রিয় চেতনার কোনো অস্তিত্ব নেই। মানবিক প্রবণতা প্রসঙ্গে তিনি অর্জনস্পৃহা, লোকানুরাগ, সাবধানতা ইত্যাদির সঙ্গে ভক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু সে ভক্তি ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষের প্রতি প্রদর্শন করতে হবে। অক্ষয় কুমার দত্ত প্রকৃতিকে বিজ্ঞান[৩২] নির্ভর দৃষ্টিতে দেখে কিভাবে সেই জ্ঞান থেকে সুখ অর্জন করা যায় এবং দেহ-মনের শক্তি বিকাশের মাধ্যমে সঠিক, সৎ ও শুভপথে চলা যায় তার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

লক্ষণীয়– অক্ষয়কুমার দত্ত এবং আরজ আলী মাতুব্বর উভয়ই হিতবাদী চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেন। সুখকে তাঁরা সর্বজনীন সুখ হিসেবেই দেখেছেন। তাঁদের দু'জনের দৃষ্টিকোণে পার্থক্য ছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত সুখকে দেখেছেন ব্যক্তিমানুষের বিকাশের দিক থেকে, আর আরজ আলী মাতুব্বর সমষ্টিগত দিক থেকে।

আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর 'সুখী ও দুঃখী' কবিতায় উল্লেখ করেন। এভাবে:

অজ্ঞতার অন্ধকার হৃদাগার যার
করে গ্রাস-শান্তিহ্রাস, মহাত্রাস তার।
(তার) নাহি শান্তি, নাহি ক্লান্তি, মহাভ্রান্তি ঘটে।
(সে) নহে সুখী, ম্লানমুখী, চিরদুঃখী বটে।
জ্ঞানীজন অনুক্ষণ হৃষ্টমন রয়,
(সে) নহে দুঃখী, হাস্য সুখী-চিরসুখী হয়।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর এভাবে সকল মানবজাতির সুখ কামনা করেছিলেন এবং সুখ ও শান্তির জন্য জ্ঞান অর্জনের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যে কারণে তিনি হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সব জাতিকে এক সুখময় শান্তির পতাকাতলে দেখতে চেয়েছিলেন। এ কারণে তাঁকে সমষ্টিগত মানুষের উন্নতিকল্পে হিতবাদী বলা যায়।

অক্ষয়কুমার ও আরজ আলী মাতুব্বর নির্বিচারে কোনো কিছু গ্রহণ করতেন না। তাঁদের কাছে প্রকৃতিই হলো যথার্থ জ্ঞান ও ধর্মের উৎস। তাঁদের মতে প্রকৃতির যথার্থ জ্ঞান থেকে মানুষ সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে বা জ্ঞানতত্ত্বে উপনীত হতে পারে। সেদিক থেকে ধর্ম, ন্যায়পরায়ণতা, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি প্রভৃতি প্রকৃতির পর্যায়ভুক্ত। আরজ আলী যা কিছু বিশ্বাস করতেন সব কিছুই প্রাকৃতিক নিয়মের উপর আস্থা রেখে বিশ্বাস করতেন। তাই আরজ আলীকে উদ্দেশ্য করে সমুদ্র গুপ্তের লেখা আরজ 'আলী মাতুব্বরকে নিবেদিত' কবিতায় বেরিয়ে আসে এ বাণী:

> যা সম্ভব ছিলো, তাই ঘটেছে
> নোনা ভেজা হাওয়ায় জ্বলতে জ্বলতে চোখ
> দেখার ভিতরে খুব অভ্যন্তরে ঘটনার সত্য দেখেছে
> ... ...
> জ্ঞানের আমিষ ঘ্রাণে চোখ খুলতেই আমরা দেখি
> আমাদের চিন্তার ঘাসে লেগে আছে
> নবসত্য জোয়ারের তরতাজা দাগ[৩৯]

অক্ষয় কুমার দত্ত প্রথম জীবনে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকে গদ্য রচনা আরম্ভ করেন। আরজ আলী মাতুব্বর অবশ্য জগৎ, জীবন সংক্রান্ত প্রশ্ন রেখে দর্শন চর্চার পাশাপাশি কিছু কবিতাও রচনা করেন। মোহাম্মদ আলীর ভাষায়:

> দার্শনিক ও বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও আরজ আলীর কবিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি কবিতাকে কেবল ভালবাসেননি, তিনি নিজেও লিখেছেন অসংখ্য কবিতা, যদিও মনে 'সীজের ফুল' কথাটি তিনি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। সেউজ একটি গাছ বিশেষ, যে গাছে কোনো ফুল হয় না। তিনি নিজের কবিতাকেও এ রকম অর্থে ব্যবহার করেছেন, যেন এসব কবিতা কোনো কবিতাই নয়। কিন্তু তিনি নিজে স্বীকৃতি না দিলেও সীজের ফুলের অনেক কবিতাই কবিতা হয়ে উঠেছে।[৪০]

অক্ষয় কুমার দত্ত *বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (১ম-১৮৫১, ২য়-১৮৫৩) 'বাহ্যবস্তু'র দুই খণ্ড রচনা করে সর্বপ্রথম গ্রন্থকার ও চিন্তাশীল লেখকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। বাহ্যবস্তু দুই খণ্ডে প্রকাশিত হবার পর তাঁর চিন্তা ও খ্যাতির প্রসার ঘটে। স্কটল্যান্ডের নরকরোটি বিশারদ জর্জ কুম্ব এর

Dhaka University Institutional Repository

The Constitution of Man গ্রন্থ অবলম্বনে অক্ষয় কুমারের বাহ্যবস্তু রচিত হয়। এ গ্রন্থে তিনিই সর্বপ্রথম বাহ্যবস্তুর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং জগৎসত্তার অন্তরালে ভগবৎ সত্তা অপেক্ষা একটা কার্যকারণ শৃঙ্খলাযুক্ত বস্তুসত্তা বিরাজ করছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।[৫৬] আরজ আলী মাতুব্বরও তাঁর *সত্যের সন্ধানে*, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে রহস্যময় জগতের পরিবর্তে বাস্তব জগতের দ্বার উন্মোচন করেন। অক্ষয়কুমার বাহ্যবস্তুর দ্বিতীয় খণ্ডে মদ্যপানের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি দিয়েছিলেন। কারণ মদ্যপান সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আরজ আলী মাতুব্বরও সমাজের সার্বিক কল্যাণার্থে সুদ দেয়া-নেয়া ও সুরাপান ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।[৫৭]

অক্ষয়কুমার দত্ত মানবকল্যাণকে সামনে রেখেই ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধি সম্পর্কের কথা বলেন। তাঁর ধর্ম সমীক্ষায় যেমন মানুষের সার্বিক কল্যাণই গুরুত্ব পায়, সমাজ ভাবনায় ও তাঁর মানব সমীক্ষাই স্থান পায়। তাঁর সমাজ ভাবনা ছিল মানুষকেন্দ্রিক। সমাজ ভাবনায় যে সমাজে মানুষের বাস, মানুষের দৈনন্দিন কর্ম এবং যে সমাজ ছাড়া মানুষ একদণ্ড বাঁচতে পারে না, সে সমাজ তাঁর কাম্য। সমাজের উৎপত্তির ব্যাপারে তাঁর মধ্যে গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এরিস্টটলের মতো তিনিও মনে করেন যুক্তি অথবা কোনো চুক্তি সমাজ সৃষ্টির কারণ নয়– সহজাত প্রবৃত্তির বশেই সমাজের উৎপত্তি।[৫৮] চুক্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে সমকালীন ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতামতে প্রভাবান্বিত হয়ে অক্ষর কুমার দত্ত মৌমাছির উদাহরণ দিয়ে এ বিষয় বলেছেন:

> পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য করা মধুপক্ষিকার স্বভাব। যদি এক একটি মধুমক্ষিকা এক একটি প্রশস্ত পুষ্পোদ্যানে স্থাপিত হয়, সুতরাং পরস্পর সাক্ষাৎকার ও একত্রে সহবাস করিতে না পারে, তাহা হইলে অপর্যাপ্ত আহার্য-দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ শক্তি সহকারে সমবেত যত্ন দ্বারা যেরূপ সুখ সম্ভোগ ও কার্য সম্পাদন করিবার সামর্থ্য আছে, তাহা সাধন করিতে না পাড়িয়া অবশ্যই অসুখে কালযাপন করিবে তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্যের বিষয়ও অবিকল সেইরূপ। ... সমাজবদ্ধ হইয়া গ্রাম ও নগর মধ্যে একত্র বাস করাই মানুষের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, সংসারশ্রম পরিত্যাগপূর্বক স্বতন্ত্র অবস্থিতি করা কোনো মতেই উচিত নহে।[৫৯]

অক্ষয়কুমার দত্তের মতে মানুষ তাঁর প্রয়োজনে সমাজ গঠন করে এবং তা হয় তার স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবৃতিবশত। তাঁর মতে ঈশ্বর স্নেহ, দয়ামায়া, ভালোবাসা প্রভৃতি কতকগুলি সহজাত গুণে মানুষকে যেমন মহিমা দান করেছেন, তেমনি ঐসব বৃত্তিগুলির স্ফুরণার্থে সমাজ গঠনের প্রবৃত্তি সহজাতভাবে মানুষকে দান করেছেন। এ বিষয়টি তিনি আরও সুস্পষ্ট করেছেন নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে:

Dhaka University Institutional Repository

> মনুষ্যদিগের পরস্পর সাপেক্ষতা বিস্তরসুখের মূল। গৃহনির্ম্মাণ, শস্য উৎপাদন, নৌকা গঠন, বস্ত্রবয়ণ ইত্যাদি যাবতীয় সুখ সন্ধান ব্যাপার লোকের সমবেত চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহা এক ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তদ্ভিন্ন সমাজবদ্ধ হইয়া বসতি করাতে আমাদের অনেকানেক মনোবৃত্তি সম্যক চরিতার্থ হইয়া অশেষ সুখ সঞ্চার করেন ... যিনি আমাদিগকে এই সুখকারী বৃত্তি প্রদান করিতেছেন, আমাদিগের গৃহস্থ ও জনসমাজস্থ হওয়া যে তাহার নিতান্ত অভিপ্রেত তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্যের এই বৃত্তি থাকাতে স্বভাবতই অন্য সংসর্গে প্রবৃত্তি হয়। [৬০]

অক্ষয়কুমারের মতে, মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির বশেই সমাজ গঠন করে এবং প্রাকৃতিক বিধানেই সমাজ গঠিত হয়। তাঁর মতে মানুষ প্রাণীসদৃশ্য সমাজের অংশ, তাই ব্যক্তি মানুষের মঙ্গল সমগ্র সামাজিক মঙ্গলেরই নামান্তর। যদিও তিনি বেনথামের মতানুযায়ী মানুষের অহংপ্রবৃত্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন তবুও তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, সমাজের সুষম বিকাশের মধ্যেই ব্যক্তিমানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল কামনা করেন। সে কারণে তিনি মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন অহংভাব সঞ্চারিত করেছেন, তেমনি আবার মানুষের মনে এ বোধও দিয়েছেন যে, অপরের স্বার্থ রক্ষার মধ্যে দিয়েই নিজ স্বার্থ রক্ষা সম্ভব। তাঁর মতে সামাজিক সকল বিধিব্যবস্থার লক্ষ্য হলো সর্বাত্মক কল্যাণ সাধন। আরজ আলী মাতুব্বরও অত্যন্ত সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অক্ষয় কুমার দত্তের মতো তিনিও মধুমক্ষিকার সমাজ জীবনের উদাহরণ দেন। তাঁর ভাষায়:

> 'সমাজ' মানুষ জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও সামাজিকতা দৃষ্টি হয়। সমাজ জীবনের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে – সহ-অবস্থান, 'সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি। এ সমস্ত গুণ পশু, পাখী, মৎস্য ইত্যাদি কোনো কোনো ইতর জীবের মধ্যেও দেখা যায় এবং কোনো কোনো কীট পতঙ্গের মধ্যেও বিরল নয়। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকাও সমাজজীবন যাপন করে থাকে। এমনকি অনেক জাতের জীবাণুও সমাজজীবন যাপন করে । ... বলা যায় যে, মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও সামাজিকতা আছে। কিন্তু ওদের সংস্কৃতি নেই। ওদের সে সামাজিকতা একই ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছে আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত। আসল পার্থক্য হলো – মানুষ সংস্কৃতিবান, ইতর প্রাণী তা নয়। [৬১]

অক্ষয়কুমারের মতো আরজ আলীও মানুষের সামাজিক প্রয়োজনীয়তার কথা লক্ষ করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন সঙ্ঘবদ্ধতা ও সহ-অবস্থান মানুষের অন্যতম সামাজিক গুণ। আরজ আলী মাতুব্বর সমাজ সম্পর্কে আরো বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

> ... মানুষ যখন 'পশু' আখ্যাটা দূর করে 'মানুষ' আখ্যা পেয়েছিল – আহার, বিহার অনেক বিষয় তখনো তারা ছিল যতকটা পশুর মতোই। অতঃপর ধাপে ধাপে মানুষের সমাজ ও সভ্যতা হয়ে চলেছে উর্ধগামী।[৬২]

তিনিও অক্ষয়কুমার দত্তের মতো মানুষের সুখের জন্য, আগুন আবিষ্কার কৃষি ও পশুপালন, ধাতু ও গৃহ, তাঁত মাল বহনে পশু ও চাকা আবিষ্কার, নৌকা ও পাল, লেখার জন্য কাগজ আবিষ্কার ইত্যাদি - মানব সভ্যতার সীমাহীন বিস্তৃতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন আদিম যুগের অসভ্য ও অর্ধসভ্য মানুষ উপরোক্ত স্তরগুলো অতিক্রম করে যখন সভ্যতার সীমানায় পৌঁছেছেন, তখন থেকে মানুষের ন্যায় ও অন্যায় কাজের বিচার বিশ্লেষণ শুরু হয়। তার মতে:

> মানব সভ্যতা ও সমাজ উন্নয়নের একটি মস্তবড় ধাপ হচ্ছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। এর পূর্বে মানব সমাজে ন্যায়-নীতি যে ছিলো না, তা নয়। তবে তা ছিলো ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা স্বেচ্ছাধীন। সৎ ও অসৎ কাজের ব্যাপক ও পাকাপোক্ত ভাগাভাগি সুদৃঢ় হয় ধর্ম ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে। আদিম যুগের সেই পুরোহিততন্ত্রের আমল থেকে শুরু করে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে ধর্ম ও রাষ্ট্রের কঠিন শাসন। এবং মানুষ এখন পৌঁছে গেছে সভ্যতা ও সমাজ উন্নয়নের চরম শিখরে। কিন্তু বিশ্ব-মানব সমাজে আজও কি পরিপূর্ণ ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?[৬৩]

এখানে লক্ষণীয় আরজ আলী মাতুব্বর মানব সমাজের সৃষ্টি, সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা, সামাজিকতা, সভ্যতা, সভ্যতার ক্রমবিকাশ থেকে শুরু করে মানব সমাজের ধর্ম, রাষ্ট্র, ন্যায়-নীতি ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেছেন, ফলে এ ব্যাপারে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের সাদৃশ্য রয়েছে।

অক্ষয়কুমার দত্তের এবং আরজ আলী মাতুব্বর ধ্যান-ধারণায় শিক্ষাই হলো মানবজাতির উন্নয়নের একমাত্র সোপান। উভয়ের মতেই শিক্ষাব্যতীত কোনো মানুষই নিজেকে জানতে পারে না। অক্ষয় কুমার দত্তের *ধর্মনীতি* পুস্তকে গণশিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন বেশি। উক্ত পুস্তকে মানুষের 'শিক্ষা ব্যবস্থা' সম্পর্কে যে আদর্শের কথা বলেছেন তা আজকের বৈজ্ঞানিকযুগেও প্রযোজ্য। শিক্ষকতা অক্ষয়কুমারের একসময় উপজীবিকা ছিল। অক্ষয় কুমার দত্তের মতে শিক্ষা হলো একটি দেশের সার্বিক উন্নতির প্রথম ধাপ। রাষ্ট্রের আদর্শ উদ্দেশ্যে ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার সঙ্গে তিনি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে:

> তাঁহাদের রাজ্যের সর্বস্থানে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা যেমন বিধেয়, অপর সাধারণ সকল প্রজাকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম বিষয়ে শিক্ষাদানের বিধান করাও সেইরূপ কর্তব্য।[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করলে আইন-শৃঙ্খলা দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের এক বিস্তারিত পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সঙ্গতি বজায় রাখার মতো শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন। অক্ষয়কুমারের রচনায় এদেশে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চিন্তাবোধ সর্বপ্রথম দেখা যায়:

> নগরে নগরে ও গ্রামে পুস্তকালয় ও পাঠাগার সংস্থাপন করাও কর্তব্য। আবশ্যকমত সমুদয় পুস্তক সংগ্রহ করা প্রায় কাহারও পক্ষে সাধ্য নহে। অতএব, সাধারণ পুস্তকালয় ও তৎসংক্রান্ত সাধারণ পাঠাগার নিতান্তই আবশ্যক। তাহা হইলে, লোকে তথা হইতে গমন করিয়া তথা হইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া পাঠ-জনিত পবিত্র আমোদে আমোদিত হইতে পারে।[৬৫]

জনশিক্ষা সম্প্রসারণে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগিতা প্রসঙ্গে তিনি স্কুল কলেজের শিক্ষার গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার উপর সমাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাঠাভ্যাস সৃষ্টি ও বৃদ্ধির চিন্তা ও তাঁর আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য রামমোহন রায়ও[৬৬] শিক্ষার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। অক্ষয় কুমার দত্ত শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মকে উপলব্ধি করার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, সমাজ থেকে অন্ধকার দূরীভূত করা এবং সমাজকে আলোকিত করার লক্ষ্যে জ্ঞান অপরিহার্য। এভাবে অক্ষয় কুমার দত্তের লড়াই ছিল একটা নতুন সত্য ও মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াই। জীবন-চর্যার সঙ্গে তার চিন্তার গভীর সামঞ্জস্য সত্য হলেও বিস্ময়কর। আরজ আলী মাতুব্বর শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন সর্বাধিক। আরজ আলী মাতুব্বর শৈশব থেকে শত অভাব-অনটনের মধ্যেও লেখাপড়া শেখার প্রবল আগ্রহের কারণে বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে বই এনে লেখাপড়া করতেন এবং গ্রামের সাধারণ মানুষকে লেখাপড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি নিজ গ্রামে একটি পাঠশালা ও একটি লাইব্রেরি স্থাপন করেন। আর্থিক অনটনে গ্রামের অন্য কারো যেন শিক্ষা গ্রহণে ব্যাহত না হয় তা ছিল তার ব্রত। এ সম্পর্কে আরজ আলীর উপলব্ধি:

> দারিদ্র নিবন্ধন কোনো স্কুল-কলেজে গিয়ে পয়সা দিয়ে বিদ্যা কিনতে পারিনি আমি দেশের অন্যসব ছাত্র-ছাত্রীদের মতো। তাই কোনো স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা আমার শিক্ষাপীঠ নয়। আমার শিক্ষাপীঠ হলো 'লাইব্রেরী' আশৈশব আমি লাইব্রেরীকে ভালোবেসে এসেছি এবং এখনো ভালবাসি। লাইব্রেরীই আমার তীর্থ স্থান। আমার মতে মন্দির, মসজিদ, গীর্জা থেকে লাইব্রেরীকেই বহুগুণ শ্রেষ্ঠ। তাই আমি যখন কোনোরূপ একটি জনকল্যাণমূলক কাজ করবার জন্য মনস্থির করেছি, তখন আমার সেই লাইব্রেরী প্রীতিই জাগিয়ে তুলেছে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। আর তারই ফলশ্রুতি আমার এ ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটি। যেহেতু আমি লাইব্রেরী কাছে ঋণী। আমি লাইব্রেরী ভক্ত।[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী তাই কোনো জনকল্যাণমূলক কাজ করতে গিয়ে লাইব্রেরি স্থাপনের উপর বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। অক্ষয় কুমারের মতো তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন একটি দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য শিক্ষাই হলো প্রথম এবং প্রধান স্তর। তিনি প্রমাণ করে গেছেন, একটি সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত ও আলোকিত করার একমাত্র উপায় জ্ঞান। এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তিনি নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'আরজ মন্‌জিল' পাবলিক লাইব্রেরি। তাঁর ইচ্ছা গ্রামের সাধারণ মানুষ এসে এখানে পড়াশোনা করবে। লাইব্রেরি সম্পর্কে আরজ আলীর উক্তি:

> তাঁর এই পাঠাগারটি হবে আলোকস্তম্ভ – এর আলো সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। কোন দেশকালের ভেদ তিনি মানেন না। মানুষ মানুষ হিসাবেই স্বীকৃতি পাবে। মানুষকে মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার, মানুষ হিসাবে সেবা করার মানসিকতা আসবে জ্ঞানের মধ্য দিয়েই। শুধু অন্তহীন জ্ঞানই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে চরম অজ্ঞানতা থেকে।[৬৮]

দীর্ঘকাল বিভিন্ন লাইব্রেরির সংস্পর্শে থেকে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছে যে, লাইব্রেরি অমানুষকে মানুষ বলতে পারে, পারে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে দূর করতে। এভাবে দুই দার্শনিকই জনশিক্ষা সম্প্রসারণে গ্রন্থাগারের উপযোগিতার প্রসঙ্গে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ শিক্ষার সঙ্গে জড়িত আছে ভবিষ্যৎ ও কর্মজীবনের সঙ্গতি। এ সঙ্গতি বজায় রাখার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের অবস্থানকে অপরিহার্য বলে জ্ঞান করেছেন এ দার্শনিকদ্বয়।

মানবভাবনা অর্থাৎ মানুষের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কিভাবে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধণ করা যায়, তার উপায় নির্দেশ করাই হলো এ দুই দার্শনিকের মূল লক্ষ্য। এ ছাড়া নৈতিক চিন্তা ধারাও মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার আর একটি উপায়। আধুনিক গবেষকদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যেভাবেই হোক, বাঙালির চিন্তাধারায় নীতিচর্চায় এত প্রাধান্যের কারণ হচ্ছে প্রধানত সমকালীন ধর্মবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া। সমকালীন ধর্ম পরিস্থিতিই বাঙালিকে নীতিচর্চায় আগ্রহী করে তুলেছে।[৬৯] আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ১৮৫১ খ্রি.-১৮৫৯ খ্রি. এই সময়ের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের নীতিবিষয়ক রচনা[৭০] প্রকাশিত হয়।

আরজ আলী মাতুব্বরও নীতিবোধের তাগিদেই সনাতনী ধর্মের রীতিনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন যেমন করে সনাতন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন অক্ষয় কুমার দত্ত। ধর্মবোধকে কেন্দ্র করে ধর্মের ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যেই উনিশ শতকের নীতিবোধ গড়ে উঠেছে। ধর্মবোধ যদি যৌক্তিকভাবে স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে তাহলে সে চিন্তাশক্তি হবে সহজ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন। যার ফলে মানুষ নিজে কুসংস্কারমুক্ত হওয়ার পথ খুঁজে পাবে, বেরিয়ে আসতে পারবে নীতিজ্ঞানবিবর্জিত

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকারের বলয় থেকে। অক্ষয়কুমার দত্ত আরজ আলী মাতুব্বর উভয়ই সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তৎকালীন দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশের অচলায়তনে নারী পুরুষের যে সাম্যের, যে সমাধিকারের কথা নির্দ্বিধায় তুলে ধরেছেন, তা নীতিগতভাবেই তাঁদের মানবপ্রেমের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনেরই বহিঃপ্রকাশ। অক্ষয়কুমার দত্ত নারীর সপক্ষে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সাহায্য ছাড়াই নারী-পুরুষের সমাধিকারের সম্পূর্ণ যুক্তি তুলে ধরেছেন এভাবে:

> স্ত্রী বিয়োগ হইলে, পুরুষেরা পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়া যদি পাপগ্রস্ত না-হয়, তবে স্বামীর মৃত্যু হইলে, স্ত্রীরা পুনর্ব্বার অন্য পতির পাণিগ্রহণ করিলে কি নিমিত্ত অধর্ম্মদোষে দূষিত হইবে, তাহা কোনক্রমে নির্দ্ধারণ করা যায় না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই স্বভাব এ বিষয়তুল্য বলিয়া গণ্য করিতে হয়। ঐ উভয় জাতিরই কাম আছে, ইহাতে একজাতিই বা পুনর্ব্বার উদ্বাহবন্ধনে কি নিমিত্ত অধিকারী হইল, এবং অন্য জাতিই বা কি নিমিত্ত সে বিষয়ে বঞ্চিত রহিল, তাহা কোনমতেই অনুভূত হয় না।[৭১]

অক্ষয় কুমার দত্ত এ বক্তব্যে নারী-পুরুষে সমানাধিকারের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো ধর্মীয় আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর এ বুদ্ধিবাদী চিন্তাপ্রসূত ধারণা থেকে তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে বেদের অপৌরুষেয়তা অস্বীকার করেন। বেদ ব্রাহ্মধর্মের অভ্রান্ত যুক্তি নয়। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নন, ফলে ঈশ্বরের প্রার্থনার প্রয়োজন নেই বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন। এভাবে উদার মানবতাবাদী, বুদ্ধিনিষ্ঠ যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার রক্ষণশীল সনাতনী হিন্দুধর্মের আঘাত হানেন। পরিণামে রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু কর্তৃক তাঁকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অক্ষয় কুমার তাঁর মতামত স্বাধীনভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর জীবনী পর্যালোচনা থেকে জানা যায়, ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* গ্রন্থের প্রথম ভাগ এবং ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একই গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম তাঁর নীতিবিষয়ক রচনা প্রকাশ করেন। অক্ষয়কুমারের মতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য করাই ধর্ম এবং তাহা না করাই অধর্ম। তাঁর মতে জ্ঞানের পরিধির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম, নৈতিকতা ও অধ্যাত্মচিন্তারও পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পরিবর্তনকে তিনি বাস্তবসম্মত বলে অভিহিত করেন এভাবে:

> সমুদয় ধর্মই আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্মপ্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্যের অন্যান্য বিষয়ও যেমন ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়াছে, ধর্ম্মও সেই রূপ ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া আসিয়াছে। বনস্থলের পর্ণকুটির এবং নগর মধ্যস্থিত পরম শোভাকর রাজপ্রাসাদ উভয়ই মনুষ্য কর্তৃক নির্মিত। পূর্বকালের ভ্রান্তি-

Dhaka University Institutional Repository

> সম্বল ফলিত জ্যোতিষ, এবং অধুনাতন তত্ত্বপরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ উভয়ই মানুষ কর্তৃক প্রণীত। ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতদিগের মনঃকল্পিত ভূগোলবৃত্তান্ত এবং অধুনাতন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রস্তুত প্রত্যক্ষমূলক ভূগোলবিদ্যা উভয়ই মনুষ্য কর্তৃক উদ্ভাবিত। সেইরূপ বৈদিক সংহিতা প্রোক্ত চন্দ্র-সূর্যাদি জড়বস্তুর আরাধনা এবং উপনিষদুল্লিখিত নিরাকার, নির্বিকার, জ্ঞানময় পরামেশ্বরের আরাধনা, এই উভয়ই মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত। মানবজাতি প্রথমে সকল বিষয়েই ভ্রান্ত ছিলেন; শিক্ষা লাভাদি দ্বারা তাহার মানসিক প্রকৃতি উত্তরোত্তর যেমন মর্জিত হইয়াছে, সেই সঙ্গে বিদ্যা, ধর্ম, গৃহধর্ম এবং সামাজিক ধর্ম প্রভৃতি সমুদয় ব্যাপারই উত্তরোত্তর উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া আসিয়াছে।[৭২]

অক্ষয়কুমার দত্ত স্পষ্টত উপলব্ধি করেছিলেন এ বিশ্বে যা কিছু পরিবর্তিত ও পরিশোধিত সবকিছুর মূলেই মানববুদ্ধি। মানববুদ্ধির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর ক্রমবিকাশ খুবই স্বাভাবিক এবং বাস্তব। মূলত ধর্মবোধ থেকেই নীতিবোধের উৎপত্তি। তাই অক্ষয়কুমারের ধর্মবোধ নীতিনির্ভর এবং ধর্মের প্রকৃত আচরণ মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত।[৭৩] সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই তিনি নীতি জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।[৭৪] এভাবে মানুষের কল্যাণার্থে তিনি সদা জাগ্রত ছিলেন, যা আরজ আলী মাতুব্বরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আরজ আলী মাতুব্বরও প্রমাণ করেছেন, সমুদয় ধর্ম আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্মপ্রবৃত্তি হতে উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর ভাষায়:

> আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানিতে পাইতেছি যে, বিশ্বমানবের সহজাত বৃত্তি বা 'স্বভাবধর্ম' একটি। এ সংসারে সকলেই চায় সুখে বাঁচিয়া থাকিতে, আহার-বিহার ও বংশরক্ষা করিতে, সন্তান সন্ততির ভিতর দিয়া অমর হইতে। মানুষের স্বভাবধর্ম মহব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সংসারে সৃষ্টি হইল কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সমাজ, নীতি এবং রাষ্ট্র; গড়িয়া উঠিল জ্ঞান বিজ্ঞানময় এই দুনিয়া। মানুষ যেখানে যে কাজেই লিপ্ত থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, সে তাহার 'স্বভাবধর্ম' তথা 'স্বধর্ম' পালনে ব্রতী। এই মহব্রত উদ্‌যাপনে কাহারো কোন প্ররোচনা নাই এবং এই ধর্ম পালনে মানুষের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই।[৭৫]

আরজ আলী মাতুব্বর *সত্যের সন্ধান* বইয়ের উপনাম দিয়েছেন *যুক্তিবাদ* এ প্রসঙ্গে টমাস পেইন (১৭৩৭ খ্রি.-১৮০৯ খ্রি.) রচিত *The Age of Reason* এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ্বনাগরিক টমাস পেইন কোনো রকম কলাকৌশল, ছল-চাতুরি বা ছদ্মাবরণের আশ্রয় না নিয়ে সহজ সরল ভাষায় খোলামনে, মোক্ষপ্রাপ্তি বা পরিত্রাণের খ্রিস্টীয় পরিকল্পনা ও খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলকে প্রচণ্ড আক্রমণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়ার উপযোগী করে গ্রন্থটি রচনা করেন। পেইনের মতো তিনি স্বধর্মের সমালোচক। খ্রিস্টীয় ধর্ম কাহিনী সম্পর্কে পেইন বলেন :

> Though it is not direct article of the Christian system that this world that we inhabit is the whole of the habitable creation, yet it is so worked up there with, from what is called the Mosaic account of creation, the story of Eve and the apple, and the counterpart of the story, the death of the Son of God, that to believe otherwise, that is, to believe that God created a plurality of worlds, at least as numerous as what we call stars, renders the Christian systems of faith at once little and ridiculous, and scatters it in the mind like feathers in the air. The two beliefs can not be held toghether in the same mind and he who thinks that he believe both has thought but little of either[৭৬]

আরজ আলী মাতুব্বরও সত্যের সন্ধান গ্রন্থের 'মূলকথায়' বলেছেন, কোনো বিষয় বা কোনো ঘটনা একাধিকরূপে সত্য হতে পারে না। একটি ঘটনা যখন দুই রকম বর্ণিত হয়, তখন হয়ত উহার কোনো একটি সত্য অপরটি মিথ্যা অথবা সমরূপ মিথ্যা; উভয়েই যুগপৎ সত্য হতে পারে না– হয়ত সত্য অজ্ঞাত থেকে যায়। এক ব্যক্তি যাকে 'সোনা' বলে, অপর ব্যক্তি হয়ত তাকে 'পিতল' বলল। এ ক্ষেত্রে বস্তুটি কি দুইরূপে সত্য হবে?[৭৭] আবার বাইবেলের গল্প, কাহিনী ইত্যাদি কোনোক্রমেই ঈশ্বরের কথা হতে পারে না। পেইনের মতে :

> When we contemplate the immensity of that Being who directs and governs the incomprehensible WHOLE, of which the utmost keen of human sight can discover but a part, we ought to feel shame at calling such paltry stories the word of God.[৭৮]

আরজ আলী মাতুব্বরও পেইনের সাথে একমত পোষণ করে বলেন ধর্মগ্রন্থগুলো মানুষের রচিত অথচ ঈশ্বরের নামে প্রচারিত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : সাধারণত, আমরা যাহাকে ধর্ম বলি তাহা হলো মানুষের কল্পিত ধর্ম। যুগে যুগে মহাজ্ঞানীগণ এই বিশ্ব সংসারের স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। 'স্রষ্টার প্রতি মানুষের কি কোনো কর্তব্য নেই? নিশ্চয়ই আছে' এইরূপ চিন্তা করে তাঁরা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তা নির্ধারণ করেছিলেন। অধিকন্তু

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের সমাজ ও কর্মজীবনের গতিপথও নির্ণয় করেছিলেন মহাজ্ঞানীগণ। এইরূপে কল্পিত ধর্মের আবির্ভাব হলো।[৭৯]

এভাবে আরজ আলীর মতে মানুষই সব কাজের মূল উৎস মানুষ। কেবলমাত্র মানুষই মানব সমাজ তথা পৃথিবীর সব কিছুর উত্তরোত্তর কল্যাণ সাধন করেছে। আরজ আলীর মতে মানববুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবোধ, সমাজবোধ সবকিছুই পরিবর্তীত ও পরিশোধিত হচ্ছে। নীতিকে পরিশোধিত করতে হয়েছে যুক্তির অপরিহার্যতা। তাই ধর্মকে আরজ আলী মাতুব্বর যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যুক্তিবাদী মানুষ কখনো অনৈতিক হতে পারেন না। ফলে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারকল্পে তিনি অন্যায় ও অযৌক্তিক কোনো কাজও সমর্থন করতে পারেন না। আরজ আলী মাতুব্বর পৌরাণিকে উল্লিখিত নারীদের অবমাননাকর ঘটনা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

যৌক্তিক মনোবলে বলীয়ান হয়েই আরজ আলী কোনো ভয়ভীতি বা প্রলোভনের কাছে দমবার পাত্র ছিলেন না। বরং যুক্তি দ্বারা তাঁকে কেউ পরাজিত করুক সেটাই ছিল তাঁর কাম্য। এজন্য যুক্তিবাদী আরজ আলী রামায়ণের উল্লিখিত স্বেচ্ছায় সীতাদেবীর ভূগর্ভে প্রবেশের কথাটি মানতে রাজি হননি। তাঁর বিশ্বাস, নারী হত্যার অপবাদ লুকানোর উদ্দেশ্যে এবং ঘটনাটি বাহিরে প্রকাশ পাবার ভয়ে শ্মশানে দাহ করা হয়নি। সীতার শবদেহ, হয়তো লুকিয়ে প্রোথিত করা হয়েছিল মাটির গর্তে, পুরীর মধ্যেই। আর তা-ই প্রচারিত হয়েছে 'স্বেচ্ছায় সীতা দেবীর ভূগর্ভে প্রবেশ' করেছেন।[৮০] সমাজে প্রবহমান এই পৌরাণিক ধর্মবোধ আরজ আলী মাতুব্বর মেনে নিতে পারেননি, ধর্মবিশ্বাসের সাথে যে অলীক কল্পকাহিনী বা কাল্পনিক চরিত্রযুক্ত হয়ে আছে তার অসারত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে হিল্লা প্রথার মাধ্যমে গ্রহণ করা যুক্তিবাদী আরজ আলী মাতুব্বর নীতিগতভাবে মেনে নিতে পারেননি। হিল্লা বিয়ে সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন, পুনঃগ্রহণযোগ্য নির্দোষ স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে 'হিল্লা' প্রথার নিয়মে স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় নির্দোষ স্ত্রীকেই। অপরাধী স্বামীর অর্থদণ্ড বা বেত্রাঘাত বা পুনরায় পাপকাজ করার শপথ পর্যন্ত নেয়ার বিধান নেই। বরং আছে নিস্পাপ স্ত্রীর ইজ্জতহানির ব্যবস্থা। এভাবে একের পাপে অন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। হিল্লা বিয়েতে যে বৈষম্যতা আরজ আলী মাতুব্বর প্রত্যক্ষ করে ভীষণভাবে ব্যথিত হয়েছেন। মূলত তিনি প্রকৃত অপরাধীর অপরাধের বিধান চেয়েছেন। এভাবে তিনি তালাক প্রথার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে বিয়েতে নারী পুরুষ উভয়ের সম্মতি প্রয়োজন। একটি সামাজিক বিধিবিধান কীভাবে নারীদের মর্যাদার হানি করে, তিনি সে বিষয় অত্যন্ত গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেছেন এবং ব্যথিত হয়েছেন। তিনি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছেন যে, এদেশের নারীজাতি সমাজের পুরুষ কর্তৃক শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বরের কাছে সমাজের এ ধরনের কার্যকলাপ অনৈতিক ও অযৌক্তিক মনে হওয়ায় তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যমে সমাজকে সংস্কারমুক্ত করার আহবান জানান। অক্ষয়কুমার দত্তের মতো আরজ আলী ধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন না। ধর্মীয় বিধান ও ধর্মপতিদের মাধ্যমে সমাজে যে অন্যায়-অবিচার দেখা যায় তারই বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তাঁর মতে, খোদ ধর্ম কোনো কিছুর জন্য দায়ী নয়– দায়ী হলো সেসব ব্যক্তি যারা ধর্মকে অসাধু উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং ধর্মের নামে শোষণ ও নির্যাতন করছে অসহায় মানুষকে। আরজ আলী মাতুব্বর কখনো মার্কসের মতো ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা বলেননি; বরং বিধিবিধান প্রয়োগকারীদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, যাদের জন্য সমাজে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। এভাবে তিনি রাসেলের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন। নারী নির্যাতনের বিষয়টি তাঁর কাছে জীবনের মৌল সত্যের বিপরীত কাজ বলে মনে হয়েছে।

এভাবে নিরবচ্ছিন্ন ন্যায়-নীতির লক্ষ্যে আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন এক অতন্দ্র প্রহরী। অত্যন্ত সৎ, বিনয়ী ও সহজ জীবনের অধিকারী সাদামাটা আটপৌরে জীবনযাপন করতেন তিনি। সততার ঘাটতি ছিল না তাঁর জীবনের কোনো পর্যায়ে। তার মতের সাথে দ্বিমত পোষণকারী[৮১] ব্যক্তিও তাঁর সততায় মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁর সত্যবাদিতায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। নীতিবোধের সাথে বাস্তব জীবনযাপনের এ এক অন্যন্য সাধারণ সম্মিলন।

আরজ আলী মাতুব্বর নিরামিশভোজী ছিলেন।[৮২] আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়ের চরিত্রে বেশ কিছু মিল ছিল যেমন নম্রতা, সহৃদয়তা, মাতৃভক্তি, অধ্যায়নশীলতা, সুরসিকতা, বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানব প্রকৃতি সম্পর্ক, নিরামিশ ভোজী[৮৩], ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয় কুমার দত্ত প্রথম জীবনে Deist বা প্রত্যাদেশে অবিশ্বাসী ঈশ্বরবাদী ছিলেন, শেষ জীবনে সংশয়বাদী হন। শতাব্দীর ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেও এ দুই দার্শনিকের চরিত্রে ছিল অভূতপূর্ব যোগাযোগ। সরলতা, ন্যায়পরায়ণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, গাম্ভীর্য, সৎ সাহস, প্রশান্তভাব, পরিচিত অপরিচিত সাধারণ ব্যক্তির প্রতি সদয় ব্যবহার, সত্যপ্রিয়তা, যুক্তিবাদিতা, অধর্মের প্রতি বিদ্বেষ, মানবধর্মের প্রতি প্রেম, জন্মভূমির উপর অনন্যসাধারণ অকপট প্রীতি ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলি মানবসমাজে তাদেরকে চির অক্ষয়, চির অম্লান করে রেখেছিল।

আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয় কুমার দত্ত শতাব্দীর ব্যবধানে থেকেও তাঁদের সময়কার বাঙালির অন্তর্লোকে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছিলেন। যদিও বাংলাদেশে এবং বাঙালির অন্তর্লোকে এ দুই দার্শনিকের সুগভীর প্রভাব এবং তাঁদের চিন্তা ও মননের বিচিত্র সমৃদ্ধি সম্পর্কে তেমন কোনো অনুসন্ধান হয় নাই। তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার অতিস্বল্পভাবে বুদ্ধি, মানবপ্রেম ও বৈজ্ঞানিক

Dhaka University Institutional Repository

চেতনার উন্মোধন লক্ষ্য করা যায়। বাঙালি জাতি তাতে বিস্মিত হয়েছেন কিন্তু তেমন একটা অনুপ্রাণিত হননি। কারণ বুদ্ধির সহিত মনের সমানুপাতিক হারে মিল না হলে অন্তত বাঙালি জাতি তা গ্রহণ করতে চায় না। এ দুই দার্শনিক বুদ্ধির আলোকে বাঙালির অন্তরে বহু শতাব্দীর লালিত জড়তাগ্রন্থিকে ছিন্নভিন্ন করতে চেয়েছিলেন। সাধারণ বাঙালি এই সমাজ বিপ্লবীদের দূর থেকে সম্মান করেছেন, কখনো বা অবজ্ঞা করেছেন, আবার বুদ্ধির নিরন্তর সত্যকে লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু তবুও তাঁদের সুমহান বাণী সাধারণ মানুষ তাঁদের অন্তরে কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে ঠাঁই দিতে পারেননি।

আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয়কুমার দত্ত সমাজের বাঙালির আজন্ম লালিত সংস্কারের বজ্রাঘাত করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সামাজিক নিগ্রহও সহ্য করতে হয়েছিল। লোকাচারের পরম শত্রু এদেরকে একশ্রেণীর বাঙালি অন্তরে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা জড়তাগ্রস্ত বাঙালির চিত্তে উজ্জ্বল সূর্য কিরণের মতো তীব্র বুদ্ধিবাদী চেতনাকে জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছিলেন। মুক্তবুদ্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আত্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব, বুদ্ধির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা আবিষ্কার এবং বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা দ্বারা জগৎ ও জীবনকে বিচার করা। আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙালি জাতিকে এক নব্য বুদ্ধিতন্ত্রে দীক্ষা দিতে চেয়ে ছিলেন। তাঁরা উভয়েই ধর্মীয় শাস্ত্রনিষ্ঠাকে স্বীকার না করে যুক্তিপন্থাকে মূল আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, চিন্তা ও কর্মের একমাত্র নিয়ামক হলো যুক্তিবাদ এবং সেই অনুসারে জীবনের প্রতিটি প্রতীতিকে বিচারে আগ্রহী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে যুক্তিবাদের মূল সূত্রই হলো যুক্তিসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় যা একটি আদর্শ জীবন তৈরি হতে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করা উভয় দার্শনিকেরই ছিল জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ এবং জগৎ রহস্যের প্রতি কৌতূহল।

এই দুই দার্শনিকের জীবন শুরু হয়েছিল ধর্মে সমাজের অনুগত সমর্থক হিসেবে। কিন্তু পরবর্তীতে দু'জনের চিন্তাধারাই অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। বেকনের ধারণা নিয়ে অক্ষয়কুমার বলেছিলেন: "জগতের নিয়ম জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, তাহা লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই দুঃখ আছে। আলোচনা করো, বিচার করো, সিদ্ধান্ত করো, তবে এ বাক্যে অবশ্যই বিশ্বাস হইবে। তখন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে পরমেশ্বরপ্রণীত ধর্ম-শাস্ত্র স্বরূপ জানিয়া তাহার নিয়ম প্রতিপালনে অবশ্যই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিবে।"[৮৪] সম্ভবত আরজ আলী মাতুব্বরও অক্ষয়কুমারলব্ধ বেকনের ধারণা দ্বারা অনুপ্রানিত হয়েছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বরও অক্ষয় কুমার দত্তের যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের ধর্মচিন্তার ক্রমঅভিব্যক্তিতে তাঁদেরকে সরাসরি প্রকৃতিবাদী ও নিরীশ্বরবাদী বলা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিজ চেষ্টায় জ্ঞান লাভ করতে পারে, স্বইচ্ছায় মানুষ যে কত বড় হতে পারে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ হচ্ছে উপমহাদেশের এ দুই দার্শনিক। তাঁরা উভয়ই যুক্তিবাদী, সংস্কারমুক্ত, বিজ্ঞানপ্রেমী, সত্য অনুসন্ধানী এবং মানবতাবাদী। যাঁদের প্রয়োজনীয়তা সর্বযুগে, সর্বদেশে কোনোদিনই ফুরাবে না এবং যাঁদের সহনশীলতাবোধ সম্পর্কিত দর্শন ক্ষণে ক্ষণে উদ্বুদ্ধ করবে এ ক্ষণজন্মা মনীষীদ্বয়ের।

তদুপরি বর্তমান বিশ্বেও যেসমস্ত পরিবারের সন্তানরা অভাব অনটনে কালাতিপাত করছে তাঁরা হয়তো এ দুই ব্যক্তিত্বের বাল্য জীবনের দিকে আলোকপাত করলে আশ্বস্ত হতে পারবে এবং সে সঙ্গে পাবে প্রবল অনুপ্রেরণা যা তাঁদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সহায়ক হবে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অক্ষয়কুমার দত্ত সাহিত্য সাধক চরিতমালা-১২*, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯৪২, পৃ. ৬

২. নবেন্দু সেন, *গদ্যশিল্পী অক্ষয় কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ২

৩. ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতিথিতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বরঞ্জিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানোন্নতি সাধন, তথ্যানুসন্ধান, শাস্ত্রালোচনা, রাম মোহন রায়ের গবেষণার তথ্যের উপর নির্ভর করে হিন্দু এবং ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি সাধন। এ ছাড়া বিদ্যালয় তৈরির মাধ্যমে অশিক্ষিতদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা। অল্পকিছু দিন পরে ৩ কার্ত্তিক সভার নাম তত্ত্বরঞ্জিনী পরিবর্তিত হয়ে 'তত্ত্ববোধিনী' হয়। ১৭৬১ শতকের ১৮ অগ্রহায়ণ তারিখে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সভ্য হলে তাঁর সাথে অক্ষয়বাবু সভা দেখতে যান এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে পরিচিত হন। পরে ১৭৬১ শকের ১১ পৌষ ঈশ্বর গুপ্তের প্রস্তাবে তিনি এই সভার সভ্য মনোনীত হন।

৪. ১৭৬২ শকের ১লা আষাঢ় শনিবার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হলে অক্ষয়কুমার দত্ত ৮ টাকা বেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ৪ঠা শ্রাবণ থেকে বেতন ১০ টাকা হয়। তারপর ১৪ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষক হন। পাঠশালায় পাঠ্য পুস্তকাবলি সভা কর্তৃক প্রকাশিত হতো। অক্ষয়কুমার দত্ত বর্ণমালা, ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। সভা পাঠশালার নিমিত্ত পদার্থবিদ্যা ও ভূগোল প্রকাশ করেন। ইনি ইতিপূর্বে একখানি ভূগোল প্রস্তুত করেন। কিন্তু অর্থাভাবে বহুদিন মুদ্রিত করতে অসমর্থ থাকেন, পরে সভার সাহায্যে পাঠশালার নিমিত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৫. অক্ষয়কুমার দত্তকে উক্ত পদের জন্য সুপারিশ করে বিদ্যাসাগর বাংলা সরকারকে জানান, He is one of the very few of the best writers in Bengali.

৬. অসিত কুমার ভট্টাচার্য, *অক্ষয়কুমার দত্ত এবং উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম ও সমাজ চিন্তা*, কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৯৪

৭. কাজী নুরুল ইসলাম, 'আরজ আলী মাতুব্বর: জীবন ও দর্শন', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত),প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫

৮. আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশে দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ১৮০

৯. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২৭৬

১০. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ১৯১

১১. বরিশাল খ্রিস্টান মিশনারিদের ব্যপটিস্ট মিশন লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান স্কটল্যান্ডবাসী মি. মরিচ প্রায় ছয় বছর তাকে অনেক বিদেশী বই দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

১২. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর*, পৃ. ১৭

১৩. ঐ পৃ. ১৭

১৪. ঐ পৃ. ৪৭

১৫. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১, পৃ. ৩৮

১৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয় ঘোষণা', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বিজ্ঞান বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, রেনেসাঁস, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

১৭. হাসান্নাত আবদুল হাই, 'কেন আয়জ আলী?' আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আয়জ আলী মাতুব্বর: শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ৫৮

১৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

১৯. আইয়ুব হোসেন, 'অবলীলায় অনুসরণীয় প্রতিকৃতি', আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আয়জ আলী মাতুব্বর: শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ১৬৪-৬৫

২০. মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, *শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয় কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত*, সাধারণ ব্রহ্ম সমাজ, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃ. ১৫৪

২১. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

২২. জর্জ কুম্ব প্রসিদ্ধ নরকরোটী বিশারদ স্কটল্যান্ডের অধিবাসী। অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিগত জীবনে ও চিন্তা ধারা যিনি সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি জাতিতে স্কচ – সুবিখ্যাত জর্জ কুম্ব। তিনি ইউরোপে ফ্রেনলজি বা নরকরোটি বিদ্যার জন্মদাতা বলে পরিচিত হলেও দর্শন, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রভৃতি নিয়ে নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি শুধু *Constitution of Man* এবং *Moral Philosophy*-র অনুবাদ করেননি, কুম্বের তত্ত্ববাদও তাঁহাকে বিশ্বজগতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন, অক্ষয়কুমারের ঈশ্বরবাদও প্রায় অনুরূপ।

২৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

২৪. ঐ, পৃ. ১৫৭

২৫. আগাষ্ট কোতে (August Comte) এর প্রবর্তিত দর্শন প্রত্যক্ষবাদ। এ দর্শনে তিনি সর্বপ্রকার অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সত্তাকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ বিষয়সমূহে স্বীকৃতি দান করেছেন। তার মতে বিশ্বমানবই একমাত্র উপাস্য দেবতা।

২৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

২৭. *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা, বৈশাখ, ১৭৭৭ সকাব্দ, ১৪১ সংখ্যা, পৃ. ১৮

২৮. মোঃ সাইফুল ইসলাম (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ ও অক্ষয় কুমার দত্ত*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৫, ভূমিকা, পৃ. ৮

২৯. ঐ, ভূমিকা

৩০. ডিমোক্রিটাস, লুক্রেটিয়াস, স্পিনোজা প্রমুখ দার্শনিক প্রকৃতিবাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করলেও তাঁদের মতবাদের মধ্যে ঐক্য আছে। প্রকৃতিবাদীদের মতে, বিশ্ব হলো সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মের অধীন। বস্তুজগত কোন অতীন্দ্রিয় বা অতি প্রাকৃত সত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। বস্তুময় বিশ্বপ্রকৃতির গতিপথের বিশেষ নিয়মের অধীন। সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয়ের অধীন এ জগতকে একটি বাঁধাধরা নিয়মকে মেনে চলতে হয়। পরিবর্তনের মধ্যে স্থায়িত্ব, বহু বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য এবং বহুমুখী ও বিস্ময়কর প্রকৃতির ভিতর বুদ্ধির গোচরাধীন দৃঢ় এক বস্তুসত্তা বিরাজমান। সেই সত্তার পিছনে কোনো অলৌকিক বা ঐশী শক্তির অভিপ্রায় নেই।

৩১. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদিত), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৬২ পৃ. ৪১২

৩২. রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৬৮

৩৩. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-১*, পৃ. ১৬৩-১৬৪

৩৫. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *বাঙ্গালির রাষ্ট্রচিন্তা*, ১ম খণ্ড, জি,এ, ই পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৪৫-৪৬

৩৬. রাজকুমার চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স, কলকাতা, ১৩৩২, পৃ. ১

৩৭. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১

৩৮. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদিত), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, অক্ষয়কুমার দত্ত*, ২০০৫,পৃ. ৯

৩৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৪০. ঐ, পৃ. ১৫৮

৪১. আমিনুল ইসলাম, 'আরজ আলী মাতুব্বর', আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ৭৭

৪২. মাসুদ কামাল, 'অন্ধকারের বিরুদ্ধে এক অনন্য সংগ্রাম', আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ১৬৮

৪৩. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর, রচনা-১*, পৃ-১৯১

৪৪. ঐ, পৃ. ১৯১

৪৫. ঐ, পৃ. ১৯২

৪৬. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ অক্ষয় কুমার দত্ত*, ভূমিকা

৪৭. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, ভূমিকা, 'ত'

৪৮. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, 'অক্ষয়কুমার দত্তের রাষ্ট্রচিন্তা' মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, পৃ. ২০৫

৪৯. জেরেমী বেনথাম, জন স্টুয়ার্ট মিল ও হেনরি সিজউইক দ্বারা প্রবর্তিত নৈতিকতায় মানদণ্ড সম্পর্কিত মতবাদ। এ মতবাদ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ কামনা করার কথা বলে।

৫০. ব্রহ্মভাবাদর্শের মানুষ, বাঙালি মানবতাবাদী দার্শনিক।

৫১. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৫২. এখানে পাশ্চাত্য হিতবাদী চিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের সঙ্গে অক্ষয় কুমা দত্তের বেশ মিল আছে। অক্ষয় কুমার ও বঙ্কিম চন্দ্র উভয়ই হিতবাদী চিন্তাধারায় বিকাশসাধন করেন। দেহমনের শক্তির বিকাশের কথা বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দু, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই উপলব্ধি করেছেন। তবে তাঁদের সকলের লক্ষ্য ছিল ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল সমাজ আর অক্ষয় কুমারের লক্ষ্য ছিল মানুষ। তবে অক্ষয় কুমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও জীবন দর্শনকে বিশ্লেষণ করেননি। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসারী জীবন ও সমাজের সুসামঞ্জস্য বিধি ব্যবস্থা চেয়েছিলেন। তার এই বিজ্ঞাননির্ভর মানবতন্ত্রী মনোভাব উত্তরসূরিদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ ও আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে লক্ষ করা যায়।

৫৩. আরজ আলী মাতুব্বর, 'সুখী ও দুঃখী', আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত) *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২৩৭

৫৪. সমুদ্র গুপ্ত, 'আরজ আলী মাতুব্বরকে নিবেদিত' আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর, শতবর্ষে ফিরে দেখা*, প্রাগুক্ত পৃ. ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. সম্পাদকের কথা, মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত) প্রাগুক্ত,

৫৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

৫৭. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-২*, পৃ. ২৯৩

৫৮. অক্ষয় কুমার দত্ত, *ধর্মনীতি*, প্রথম ভাগ ৭ম মুদ্রণ, ৫ম পরিচ্ছেদ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৮৫৬, পৃ. ৩৯

৫৯. ঐ, পৃ. ২০৭

৬০. অক্ষয়কুমার দত্ত, *বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* ২য় খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৮৫২, পৃ. ২৮-২৯

৬১. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-১*, পৃ. ২৭৮

৬২. ঐ, পৃ. ২৭৯

৬৩. ঐ, পৃ. ২৭৯

৬৪. অক্ষয় কুমার দত্ত, *ধর্মনীতি* প্রথম ভাগ, পৃ.১৬৭

৬৫. ঐ, পৃ. ১৬৭

৬৬. সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায় ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষার প্রসারকামী ছিলেন। পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমার মাতৃভাষায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। তার মতে একটা বিদেশী ভাষা প্রথমত আয়ত্ব করা শক্ত। তার উপর সাধারণ গরিবলোকের পক্ষে সীমিত সময়ে আরেকটি ভাষায় শেখা অসম্ভব ও অকার্যকর। তিনি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুফল সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে পৌছতে পারে।

৬৭. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-১*, পৃ. ২০৪

৬৮. ঐ, পৃ. ২০৯

৬৯. নীতিবিশারদ গোলক নাথ শর্মার হিতোপদেশ (১৮০১) প্রথম বাংলা গদ্য রচিত নীতিবিষয়ক গ্রন্থ। অক্ষয়কুমার দত্তের নীতিবিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সনে। গোলক নাথের হিতোপদেশ, সম্পর্কে রেভারেন্ড লঙ্ লিখেছেন, "Next of the Bible this work has been translated into the greatest number of language ... and at the best 20,00,000 copies have been printed in Bengali.

৭০. অক্ষয়কুমার দত্তের নীতি বিষয়ক গ্রন্থগুলি হচ্ছে ১. *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার*, প্রথম ভাগ(১৮৫১) ২. *বাহ্যবস্তুর সহিত মানপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার*, দ্বিতীয় ভাগ, (১৮৫২), ৩. *ধর্মোন্নতি সংসাধনবিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৫), ৪. *ধর্মনীতি* (১৮৫৬), ৫. *চারুপাঠ*, প্রথম ভাগ (১৮৫৩), ৬. *চারুপাঠ*, দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৪), ৭. *চারুপাঠ*, তৃতীয় ভাগ (১৮৫৯)।

৭১. বিনয় ঘোষ, (সম্পাদিত ও সংকলিত), *সাময়িকপত্রে বাঙলার সমাজ চিত্র*, দ্বিতীয়া খণ্ড, প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ১৫৪-৫৫

৭২. *অক্ষয় কুমার দত্ত, ধর্মোন্নতি, সংসাধন বিষয়ক পুস্তক*, কলিকাতা, ১৮৮৫, পৃ. ২-৩

৭৩. নবেন্দু সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৭৪. ঐ, পৃ. ৯১

৭৫. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর, রচনা-১*, পৃ. ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

৭৬. শফিকুর রহমান, 'বিদ্রোহী আরজ আলী' আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর শত বর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ১২৮

৭৭. ঐ, পৃ. ১২৮

৭৮. ঐ, পৃ. ১২৮

৭৯. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-১*, পৃ. ১৪৭

৮০. ঐ, পৃ. ১৩৩

৮১. আমিন পেশায় নিয়োজিত থাকাকালে তাঁর দর্শনের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী চরমোনাই পীর সাহেব জমি জিরেত সূক্ষ্মভাবে মাপার ব্যাপারে তাঁকেই উপযুক্ত মনে করেছিলেন। সূক্ষ্ম মাপের কৃতিত্বে তাঁর যশ এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করেছেন তাঁরাও জমি মাপের কাজের ভার তাঁর উপরই ন্যস্ত করতেন। কর্ম জীবনে এমনি ছিল তার সততা ও দক্ষতা, যে কারণে জমিদার হরেন্দ্র বক্শীর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন জমি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আয় একমাত্র তাঁর বাড়ি থেকে বরিশাল শহরে (দূরত্ব ১১ কিলোমিটার) নৌকায় যাতায়ত ভরায় মাঝির পয়সা বাকি পড়ায় বাড়ি ফিরে পড়াশোনায় মগ্ন থাকার কারণে হঠাৎ রাত দুটোর সময় মাঝির পাওনার কথা মনে পড়ল। সেই মুহূর্তে তিনি তার নাতিকে (ফরিদ) ঘুম থেকে উঠিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেলেন তিন কিলোমিটার দূরবর্তী মাঝির বাড়িতে পয়সা দেওয়ার জন্য এবং ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন।

৮২. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর, রচনা-১*, পৃ. ৩৮

৮৩. যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলা সাহিত্য', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, (সম্পাদিত), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, পৃ. ৯৬

৮৪. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, 'বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্ত', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, (সম্পাদিত), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আরজ আলী মাতুব্বর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদ

যুগে যুগে সমাজের দুর্দিনে সমাজের অস্থিরতা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, তখনই আবির্ভাব ঘটে মহামনীষীদের। কালের ব্যবধানে থেকেও এমন দুই ব্যক্তিত্ব হলেন আরজ আলী মাতুব্বর আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যাঁরা অভিন্ন বিশ্বাস আর দ্বিধাহীন প্রত্যয়ে মানবতার পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। যুক্তিনির্ভর মুক্তবুদ্ধির মাধ্যমে মানবতাকে সমাজের বিশাল ভূবনের বিভিন্ন আঙ্গিকে নিয়ে এসেছেন বিপুলভাবে। দর্শন মুক্তবুদ্ধির আলোকে অনুভব, বিশ্বাস ও ধারণাকে বিশ্লেষণ করার কথাই বলে। জীবনকে দর্শন থেকে বাদ দেয়া যায় না। এক কথায়, সার্থক দর্শনের অপর নাম জীবনদর্শন। সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই জীবননুখী অর্থ ও ব্যঞ্জনার নিরিখেই বিচার করতে হবে আরজ আলী মাতুব্বর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০খ্রি.-১৮৯১খ্রি.) এর মানবতাবাদকে। সমাজের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন তাঁরা। কোনো সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতা স্পর্শ করতে পারেনি এ দার্শনিকদ্বয়কে। সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে এ দুই ব্যক্তিত্ব স্মরণীয় হয়ে আছেন মানুষকে তার যথাযথ মর্যাদাবোধে উন্নত করার অগ্রদূত বা মুক্তিদাতা হিসেবে।

বরিশাল শহরের অদূরে লামচরি গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম। চার বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা গেলে খাজনার দায়ে কৃষি জমিটুকু নিলাম করিয়ে নেন লাখুটিয়ার তৎকালীন জমিদার। গ্রামে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় শরীয়তী শিক্ষাদানের জন্য এক মুন্সি সাহেবের মক্তবে এতিম ছেলে হিসেবে কিছুদিন অবৈতনিকভাবে লেখাপড়া করেন। বেতন অনাদায় হেতু মক্তবটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর আনুষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। সেখানে তিনি তালপাতায় ও কলাপাতায় যথাক্রমে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ এবং বানান-ফলা শিক্ষা গ্রহণ করেন। বই-স্লেট কেনার সংগতি ছিল না।[১] পড়ালেখায় অতি আগ্রহ দেখে, আরজ আলী মাতুব্বরের এক আত্মীয়ের দেয়া দু'আনা দামের সীতানাথ বসাকের একখানা আদর্শলিপিই ছিল তাঁর বাল্যশিক্ষা জীবনের প্রথম অবলম্বন। তাঁর ভাষায়: "সেদিন ছিল আমার জীবনের সর্ব প্রথম বই হাতে ছোঁয়ার দিন। তাই আনন্দে আমার মনটা ফেটে যাচ্ছিল– সে বইখানা ছিল আমার ক্ষুধার্ত মনের খাদ্য।"[২] ব্যক্তিগতভাবে লেখাপড়ার জন্য বরিশাল বি.এম. কলেজ থেকে পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ করে লেখাপড়া করেন। অভাব অনটনের জন্য তিনি কোন শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি। তিনি বলেন:

> দরিদ্রতার কারণে তিনি কোন স্কুলে-কলেজে পড়াশোনা করতে পারেন নাই দেশের অন্যসব ছাত্র-ছাত্রীদের মতো। তাই তার একমাত্র শিক্ষাপীঠ ছিল 'লাইব্রেরী'।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে মানবতাবাদী ও আধুনিক চিন্তাধারার অন্যতম ধারক ও বাহক বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পাঁচ বছর বয়সেই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামক একজন শিক্ষকের অধীনে গ্রাম্য পাঠশালাতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তিন বছর বয়সের মধ্যে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পাঠশালার অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। লেখাপড়ার প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের আগ্রহ ও মেধার পরিচয় পেয়ে তাঁর বাবা তাঁকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে কলকাতার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। কলকাতায় তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং এখানে তাঁকে বিশেষ অসচ্ছলতা ও নিদারুণ কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করে পড়াশোনা চালাতে হয়। চার সদস্যের এ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রকে বাজার করা, উনুন ধরানো, বাটনা বাটা, বাসন মাজা থেকে শুরু করে দু'বেলা রান্না করতে হতো। সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে নিজে খেতেন। কাজের ফাঁকে স্কুলে যাওয়ার পথে তিনি তাঁর প্রতিদিনকার পড়াশোনা তৈরি করতেন। কখনো কখনো মধ্যরাত থেকে সারারাত জেগে পড়াশোনা করতেন। এহেন কষ্টের মধ্য দিয়েই তিনি পড়াশোনা চালিয়েছেন। এভাবে অত্যধিক পরিশ্রম করার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ প্রসঙ্গে ফুলরেণু গুহ[৪] লিখেছেন:

> কয়েক মাস পরেই খুব শক্ত একটা অসুখ হওয়ায় তাঁকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। অসুখটা সারবার পর তাঁকে পুরোদস্তুর একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করার কথা তাঁর পিতা খুব গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। এজন্য এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছিল যা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বছর দশকেরও বেশি হল হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছে, এবং ইংরেজী শিক্ষা ক্রমশই বেশি করে জনপ্রিয় হয়ে চলেছে। অন্যদিকে আবার পুরানো রীতির মোহ কাটাতে না পেরে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি অল্পদিন হল সংস্কৃত বিদ্যার নানা শাখায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেছেন। সমাজের প্রগতিবাদী মানুষদের অনুমোদিত প্রাতীচ্য শিক্ষা লাভ তাঁর লক্ষ্য হবে, না প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী সংস্কৃত শিক্ষার পথে তিনি যাবেন?[৫]

এ নিয়ে তাঁর বাবা ঠাকুরদাস চিন্তিত হয়ে পড়লে, ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃদেবীর মাতুল রামমোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্য মধুসূদন বাচস্পতি মধ্যস্থতা করে তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে পরামর্শ দেন। বাচস্পতির মতে এখানে তিনি যে তাঁর বাবার ইচ্ছানুযায়ী সংস্কৃত শিক্ষারই কেবল সুযোগ পাবেন; শুধু তা-ই নয়, কলেজের পাঠ্যসূচির সহায়ক ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার সুবিধাও তাঁর থাকবে।[৬] এভাবে বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য দর্শন চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

কালের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেও এ দুই দার্শনিকের শিক্ষাজীবন ছিল প্রতিবন্ধকতামূলক বিশেষ করে আর্থিক অভাব অনটনের ক্ষেত্রে। তবুও শিক্ষার্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং জীবনদর্শন চর্চায় কেউ

Dhaka University Institutional Repository

থেমে থাকেননি। আরজ আলী মাতুব্বর দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সমকালীন মানবতাবাদী চিন্তাধারায় এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। আরজ আলী মাতুব্বর এতই দরিদ্র ছিলেন যে, কোনো স্কুল কলেজে বিশেষ পাঠ করেননি। স্বকীয় অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় *সত্যের সন্ধান* আর *সৃষ্টির রহস্য* নিয়ে গবেষণা করে চরম ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মতো তিনি তাঁর জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার সাথে জড়িত ছিলেন।

আরজ আলী মাতুব্বর আজীবন জ্ঞান সাধনা করেছেন মানব কল্যাণের লক্ষ্যে। সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করার লক্ষ্যে সমাজসংস্কারক হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। তৎকালীন সমাজের অচলায়তন অবস্থা আরজ আলীকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। জেমস মিল এবং অগাস্ট কোঁতের মতো আরজ আলীর দর্শনেও দৃষ্টবাদের[৭] প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি বারবার প্রশ্ন করেছেন – এ প্রশ্ন কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাছে নয় – বরং সমগ্র জ্ঞান জগতের কাছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন:

> (১) আমি কে? (২) প্রাণ কি? (৩) প্রাণের সঙ্গে শরীরের ও মনের সম্বন্ধ কি? (৪) মন ও প্রাণ কি এক? (৫) আত্মা কিভাবে কখন দেহে প্রবেশ করে? (৬) বিভিন্ন জীবনের আত্মা কি বিভিন্নরূপ? (৭) 'আমি' কি মরিব? --- (৮) অশরীরী আত্মা কি জ্ঞানবিশিষ্ট?[৮]

এভাবে মানুষ নিয়ে ভাবনা চিন্তাই ছিল আরজ আলীর দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। দেখা যায় আরজ আলীও প্রচলিত ঈশ্বরতত্ত্ব বা অধ্যাত্মবাদী কল্পলোকের আলোচনার পরিবর্তে মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক আলোচনাই ছিল তাঁর দর্শনের মূলমন্ত্র। আর এ জন্যই তিনি সত্যকে জানার জন্য প্রশ্ন করেন নানা কৌশলে। কারণ তাঁর মতে, সত্যকে জানতে পারলে আর কোনো কিছু জানার প্রয়োজন হয় না।[৯]

এ জাতীয় বাস্তব ভাবনা চিন্তার আড়ালে হারিয়ে যায় অধ্যাত্মবাদী ভাবনাগুলি। ফলশ্রুতিতে এ জাতীয় দর্শন আখ্যায়িত হয় নাস্তিকতাবাদী হিসেবে। মানুষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত নিয়েই এভাবে আরজ আলী মাতুব্বরের যাবতীয় সংস্কার ছিল তাঁর কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। তিনি কখনও সাম্প্রদায়িকতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেননি বরং বিদ্যাসাগরের মতো তিনি ছিলেন উদার এবং মনুষ্যত্বের মহান আদর্শের প্রতি তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন।

অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাধারণ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও স্বীয় প্রতিভা এবং কর্মগুণে মহান পণ্ডিত ও বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁর ধীশক্তি, মেধা ও প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ শিক্ষকমণ্ডলী তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। কর্মজীবনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি শিক্ষার সাথে জড়িত ছিলেন। বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। সামাজিক কল্যাণে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে

Dhaka University Institutional Repository

শাস্ত্রীয় বিশ্বাস ও আচার আচরণের পরিবর্তে মানবীয় বিবেক ও বুদ্ধিই ছিল অবলম্বন। অর্থাৎ তাঁর চিন্তা-চেতনায়, কর্ম ও রচনায় ঐহিক জীবনবাদ উপস্থিত থাকতে দেখা যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ইয়ংবেঙ্গল[১০] এর প্রভাবে তিনি ঐহিক জীবনবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিলেন বলে আধুনিক পণ্ডিতদের অভিমত। দেখা যায় এই দুই দার্শনিক সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। তাঁরা ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন। মনুষ্যত্বের মহান আদর্শের প্রতি তাঁরা জীবনকে উৎসর্গ করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে তৎকালীন সমাজ ছিল ধর্মান্ধতাচ্ছন্ন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দেশাচারের দাস, ক্লেদাক্ত, নিথর এবং গতিশক্তিহীনতায় ভরপুর। এ নিথর পঙ্গু সমাজকে তিনি পশ্চিমা আধুনিক মানসিকতায় গতির সঞ্চার করে উজ্জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে তিনি সংস্কৃত কলেজ সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি দার্শনিকতত্ত্ব হিসেবে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনকে ভ্রান্ত বলে গণ্য করেন।[১১] কিন্তু তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এগুলি সংস্কৃত কলেজে পড়াতে হতো। এগুলির পঠন-পাঠনের মাধ্যমে ছাত্রদের দেশ-কাল-জীবন সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি হয়, তা থেকে তাদের বিমুক্ত করার জন্য তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের ন্যায়শাস্ত্র[১২] (১৮৪৩খ্রি.) পঠন-পাঠন অপরিহার্য বলে মনে করেন। কারণ মিলের দর্শন তাদের মনকে পরিশুদ্ধ করার এবং সত্যনিষ্ঠ ও যুক্তিবাদী রাখায় সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করেন।[১৩]

বিদ্যাসাগর স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন ধর্মীয় ধ্যানধারণায় ছাত্ররা শিক্ষিত হলে, তারা বাস্তব জীবন থেকে অনেক দূরে সরে যাবে। তিনি উপলব্ধি করেন যে ধর্মীয় শাস্ত্রের মাধ্যমে ছাত্ররা ভ্রান্ত পথে চলবে। ছাত্রদের মন যাতে বিশুদ্ধ, সত্যনিষ্ঠ ও যুক্তিবাদী হতে পারে এ লক্ষ্যে তিনি মিলের ন্যায়শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন ইহজাগতিক সুপণ্ডিত দার্শনিক। স্মৃতি, বেদান্ত, ন্যায়শাস্ত্র ও হিন্দু দর্শনে সুপণ্ডিত হয়েও তিনি হিন্দুর ষড়দর্শনকে[১৪] গ্রহণ করেননি। কারণ, তাঁর মতে, এ দর্শন অতিশয় তত্ত্বাশ্রিত জীবনের বাস্তব প্রয়োজনাদির ব্যাপারেও অতিমাত্রায় উদাসীন।[১৫]

আরজ আলী মাতুব্বরও অত্যন্ত বাস্তববাদী। তাঁর মতে, স্বভাবতই মানুষ কামনা করে সত্যকে, মিথ্যাকে নয়। তাই আবহমানকাল থেকেই মানুষ সত্যের সন্ধান করে চলেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি জ্ঞানানুশীলনের বিভিন্ন বিভাগ চায় মিথ্যাকে পরিহার করে সত্যকে তুলে ধরতে। কিন্তু আরজ আলী মাতুব্বরের ধর্মজগতে প্রকৃত সত্যকে খুঁজতে গিয়ে তৌরিত, জব্বুর, ইঞ্জিল, কোরআন, বেদ-পুরাণ, জেন্দাবেস্তা ইত্যাদি গ্রন্থসমূহের প্রমাণিত সত্যসমূহ খুঁজে বের করতে চেয়েছেন। কারণ, তাঁর মতে, কোনো দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক বা নৈয়ায়িক সজ্ঞানে তাঁদের গ্রন্থের মিথ্যার সন্নিবেশ করেন না।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা সংস্কারক ও সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর তাঁর সংবেদনশীল চিত্ত ও জীবনবোধকে আশ্রয় করে তৎকালীন সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সংস্কার আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের অনুসৃত নীতির লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য বিচার-বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন পাশ্চাত্যের আধুনিক দর্শনের বিশেষত্ব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। যেমন জেরিমী বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২), জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬), জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) এর হিতবাদী[১৭] দর্শন এবং অগাস্ট কোঁতে (১৭৯৮-১৮৫৭) এর দৃষ্টবাদী প্রভাব লক্ষ করা যায়। হিতবাদী দর্শন এবং দৃষ্টবাদী দার্শনিক ধারার মূল আলোচ্য বিষয়ই আবর্তিত হয় মানুষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ নিয়ে। প্রচলিত ঈশ্বরতত্ত্ব বা অধ্যাত্মবাদী কল্পলোকের আলোচনার পরিবর্তে মানুষ ও তার পারিপার্শিক আলোচনাই এ জাতীয় দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষ কি, তার স্বরূপ কি, জগতে তার স্থান কি, তথা মানুষ ও তার সমাজই এ জাতীয় দর্শনের মৌল আলোচ্য বিষয়। মানুষকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তাই এসব দর্শনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।[১৮] আর এ জাতীয় বাস্তব ভাবনা-চিন্তার অতল আঁধারে অধ্যাত্মবাদীভাব প্রকল্প হারিয়ে যায় নির্দ্বিধায়। তাই প্রচলিত ভাববিলাসী দার্শনিকদের দৃষ্টিতে এ জাতীয় দর্শন আখ্যায়িত হয় নাস্তিকবাদী ও অজ্ঞেয়বাদী হিসেবে। হিতবাদী ও দৃষ্টবাদী দর্শনের সাক্ষাৎ প্রভাবে বিদ্যাসাগরের যাবতীয় সংস্কার কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল মানুষ ও তাঁর সমাজ। তাঁর সমস্ত সমাজকর্মের চিন্তা-ভাবনা ছিলো মানুষকে নিয়ে; মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনই ছিলো তার সমাজকর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই তিনি তাঁর সংবেদনশীল চিত্ত ও জীবনবোধকে আশ্রয় করে তৎকালীন মানুষ ও সমাজকে অবলোকন করেছেন। জন্মগতভাবে তিনি যদিও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ, কিন্তু হিন্দুত্বের দিকে নয়, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নয়; উদার অপার মনুষ্যত্বের মহান আদর্শের প্রতি তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন।[১৯]

বিদ্যাসাগর হিতবাদী দর্শন দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। হিতবাদী আন্দোলনের আদর্শ হলো, শাস্ত্রীয় কুসংস্কার অনাচার ও অবাঞ্ছিত দেশাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করা এবং সেই সঙ্গে সামাজিক নিপীড়ন ও সাধারণ মানুষকে সমাজের উচ্চশ্রেণীর অত্যাচার নির্যাতনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। হিতবাদী দর্শনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে মুক্ত ব্যক্তিসত্তায় উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবন জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করে জীবনচর্চায় মানুষকে অন্বিত করা যাতে মানুষের সামাজিক এবং জাগতিক সম্পর্ক ত্বরান্বিত হয়। হিতবাদী দর্শনের লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষ যাতে মানুষকে নিয়ে ভাবতে পারে। মানুষকে চিনতে পারে, জানতে পারে, সমাজে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে পারে– এ ব্যাপারে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং আদর্শ রূপায়ণ করতে হলে দরকার সর্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করা।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে উপলব্ধি করা যায় মানবস্বীকৃতিকে যা হিতবাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য। সমাজে মানুষের স্থান এবং মানুষকে মানবিক মর্যাদাবোধে প্রতিষ্ঠিত করতে আরজ আলী ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিশেষ করে শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় কুসংস্কার, অনাচার, সমাজের সাধারণ মানুষকে যেভাবে নির্যাতন করত তাতে আরজ আলী মাতুব্বর ভীষণভাবে পীড়িত হতেন। আরজ আলী মাতুব্বর ধর্ম, দর্শন ও সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে জ্ঞানচর্চা করেছেন প্রচুর। তিনি জীবনের মৌলিক বিষয়গুলোকে বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন – যা মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। আরজ আলীর মননচর্চা অনন্য, অসাধারণ; তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে উত্থাপিত জিজ্ঞাসা সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। মানুষ ও অন্যান্য জীব, সৃষ্টি, সভ্যতার ক্রমবিকাশ, সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, ধর্মীয় ও অন্যান্য মতবাদ, মানবের বংশ পরম্পরা ইত্যাদি নিয়ে তিনি যুক্তিতর্কের অবতারনা করেছেন। জীব, জগৎ ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে নানামুখী প্রশ্নের আলোচনা করেছেন। তাঁর *সৃষ্টি রহস্য* গ্রন্থে তীক্ষ্ণ বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। এ গ্রন্থে আদিম মানবদের সৃষ্টিতত্ত্ব, বিজ্ঞান মতে সৃষ্টিতত্ত্ব সূর্য, বংশগতি, সভ্যতার বিকাশ, সভ্যতা বিকাশের কতিপয় ধাপ ও প্রলয়ের পুনঃসৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছেন। এভাবে দেখা যায় জীব জগৎ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষাপটে অন্ধবিশ্বাস, যুক্তি বিবর্জিত কুসংস্কারকে তিনি নাকচ করে দিয়েছেন। আর বিভিন্ন বিষয় যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের ভিত্তিতে। উদ্দেশ্য ছিল সমাজের মানুষকে কুসংস্কারের মোহ থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিসত্তায় উদ্বুদ্ধ করে মানবিক মর্যাদাবোধে ত্বরান্বিত করা মানুষ যাতে নিজেকে চিনতে পারে; সমাজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এ ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দেওয়া – যা হিতবাদী দর্শনের মূলমন্ত্র। তাই আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তা ও দর্শন সম্পর্কে আহম্মেদ শরীফ মন্তব্য করেন:

> এ ধরণের চিন্তা চর্চার সার্থকতা রয়েছে এই উত্তেজনা অনুভবের মধ্যেই। এতে জীবনের ও জীবনানুভূতির দিগন্ত বিস্তৃত হয়, জগৎ মধুরতর ও সুন্দরতর হয়ে প্রতিভাত হয়। আর তারও ফলে মাটি ও মানুষ প্রিয় ও পৃথিবী আপন হয়ে, পরিজন হয়ে, আনন্দিত জীবনের সাথী হয়ে ওঠে।[১১]

মানুষকে মুক্ত ব্যক্তি সত্তায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শন প্রেরণা হিসেবে কাজ করতে পারে। এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মন্তব্য করেন এভাবে:

> মাতুব্বর সাহেব ধর্মের জাগতিক বা স্থানকালে অধিষ্ঠিত দিকের প্রত্যয়গুলো সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন তুলেছেন। আমাদের মনে হয় প্রশ্নগুলো সঙ্গত। কারণ এগুলোকে তর্কের অতীত বলে গ্রহণ করে

Dhaka University Institutional Repository

> অন্ধবিশ্বাস পোষণ করা থেকে ওদের সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা গ্রহণ করতে হলে এসব প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক।[২২]

মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক চিন্তাধারায় সঙ্গে তাঁর ধর্মমতও জড়িত। প্রচলিত অর্থে তিনি একজন চিন্তাবিদরূপে পরিচিত। তাঁর চিন্তাধারায় ধর্ম ভাবনা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ ধর্ম সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "ধর্ম যে কি তাহা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও প্রয়োজন নাই।"[২৩]

স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অত্যন্ত বাস্তববাদী। বাস্তববাদীদের মতোই তিনি ঈশ্বর সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে মানবজ্ঞানের অতীত বলে মনে করেছেন। আর এ সম্পর্কিত আলোচনা পর্যালোচনাকে তিনি অপ্রয়োজনীয় বলে নিন্দা করেছেন। ঈশ্বরের করুণা, দয়া প্রভৃতিতেও তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন। যারা ঈশ্বরকে করুণাময়, প্রেমময় ও দয়াময় বলে মনে করেন, তাদের বক্তব্যে তিনি কটাক্ষ করেছেন। এ ধরনের কটাক্ষের কথা সাহিত্যিক অমলকুমার রায়ের লেখায় দেখা যায়। যেমন ঈশ্বরের করুণার উপর কটাক্ষ করে বিদ্যাসাগর নাকি বলতেন:

> ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে কত লোক কষ্ট পাইল, কত লোক মরিল, ঈশ্বর কি দেখিলেন না? ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে স্যার জন লরেন্স (Sir John Lawrence) নামক জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ঝড়ে ডুবিল, বহু পুরীতীর্থযাত্রী প্রাণ হারাইল; বিদ্যাসাগর অশ্রুনয়নে বলিলেন, 'দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর! দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ'? বিদ্যাসাগর ভাবিতেন যখন মানব জীবনে দানবশক্তির একচ্ছত্রাধিপত্য, তখন পূজার অবকাশ কোথায়? শিক্ষক মহেন্দ্রগুপ্তকে একদিন স্পষ্টই বলিলেন, 'জগদীশ খাঁর হুকুমে এক লক্ষ বন্দিকে কাটিয়া ফেলা হইল, এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঈশ্বর দেখিয়াও নিবারণ করিলেন না; সুতরাং ঈশ্বরকে ডাকার প্রয়োজন কি?' বিদ্যাসাগরের উইলে মানবসেবার জন্য টাকার বরাদ্দ আছে, কিন্তু দেবসেবার জন্য বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের জন্য কিছুই নেই।[২৪]

ধর্ম বিষয়ে বিদ্যাসাগরের অনুরূপ কটাক্ষের কথা আরজ আলী মাতুব্বরও তাঁর *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন আমাদের দেশে এ যাবতকাল যত বড় দুর্যোগে মানুষ পড়েছে তার সবগুলোকেই এর কারণ হিসেবে 'আল্লাহর গজব'কে উল্লেখ করেছেন। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় কিংবা ১৯৯১ সালের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে লক্ষাধিক মানুষ যখন নিহত হয়েছিলেন তখন এ ধরনের কথা বলা হয়েছিল। কেবলমাত্র দু'একটা পাকা ঘর ও পাকা মসজিদ ছাড়া কোনো অক্ষত ঘর ছিল না। যুক্তিসঙ্গত কারণেই পাকাগুলি টিকেছিল এবং কাঁচাগুলি ধসে পড়েছিল। যারা এসব কিছুকে আল্লাহর গজব বলেছিলেন তাঁদের বক্তব্য ছিল – 'এগুলো হলো পাপের ফল'। কিন্তু পাপ কি তাদেরই বেশি যাদের ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় থাকতে হয় এবং যাদের আশ্রয় খুবই ভঙ্গুর? যারা টেকসই বাড়িতে বসবাস

Dhaka University Institutional Repository

করে এবং নিরাপদ জায়গায় থাকে হায়ান পয়সায়, তাঁদের পাপের গজব হয় কোথায়? এ বিষয়গুলি নিয়েই তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন।[২৫]

আরজ আলী মাতুব্বর মানুষ ভেদে ঈশ্বরের দয়ার তারতম্য লক্ষ্য করে আরোও উল্লেখ করেন:

> মানুষ ঈশ্বরের সেরা সৃষ্ট জীব। তাই মানুষের উপর তাঁহার দয়া-মায়াও বেশী। কিন্তু মানুষ ভেদে তাঁহার দয়ার তারতম্য কেন? ঈশ্বর দয়া করিয়া সকল মানুষকেই প্রাণদান করিয়াছেন এবং দান করিয়াছেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি সমান মাপে। অথচ মানুষের জীবিকা নির্বাহের কোন ব্যাপারেই ঈশ্বরের দয়ার সমবন্টন নাই কেন? কেহ সুরম্য হর্মে বাস করে সাততলায় এবং কেহবা করে গাছতলায়। কেহ পঞ্চামৃত (দুগ্ধ-দধি-ঘৃত-মধু-চিনি) আহার করে এবং কেহবা ভাল-ভাতে শুধু লবণ ও লঙ্কাপোড়া পায় না কেন?. ... আর 'ভাগ্য' বলিয়া কিছু আছে কি-না। থাকিলে কাহারও ভাগ্যে চিরশান্তি নাই কেন? ভাগ্যের নিয়ন্তাকে? কাহারও জীবন রক্ষা করা দয়ার কাজ বটে, কিন্তু কাহাকেও বধ করা দয়ার কাজ নহে। বরং উহা দয়াহীনতার পরিচয়। জগতে জীবের বিশেষত মানুষের জন্মসংখ্যা যত, মৃত্যু সংখ্যা তত। সুতরাং জন্ম ও মৃত্যুর ব্যাপারে ঈশ্বর যেই পরিমাণ সদয়, সেই পরিমাণ নির্দয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের সদয়তা ও নির্দয়তার পরিমাণ এক্ষেত্রে সমান।[২৬]

আরজ আলী মাতুব্বর ঈশ্বরের করুণার উপর কটাক্ষ করে বলতেন, ঈশ্বর 'দয়া' (একটি মহৎ গুণ) নামক গুণে পূর্ণ বলে তাঁর নাম 'দয়াময়'। জীবজগতে যখন কোনো সবল প্রাণী দুর্বল প্রাণীকে ভক্ষণ করে, তখন ঈশ্বর খাদকের কাছে 'দয়াময়' কিন্তু খাদ্য প্রাণীর কাছে 'দয়াময় নয়'। বিদ্যাসাগরের মতো ঈশ্বরের প্রতি আরজ আলীরও প্রতিবাদ এভাবে, ঈশ্বর এক জীবকে অন্য জীবের খাদ্য নির্বাচন না করিয়া নির্জীব পদার্থ অর্থাৎ সোনা, রুপা, লোহা, তামা, মাটি, পাথর ইত্যাদি নির্বাচন করতে পারলেন না কেন? না পারিলে কেঁচোর খাদ্য মাটি হলো কিভাবে![২৭] আবার মন্তব্য করেন:

> ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবেরা সকলেই তাঁর দয়ার সমানাংশ প্রাপ্তির দাবীদার। কিন্তু তাহা পাইতেছে কি? খাদ্য সম্বন্ধে বলা যায় যে, ঈশ্বর মানুষের জন্য চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ইত্যাদি অসংখ্য রকম খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং পশু পাখিদের জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন ঘাস-খিচালী-পোকা-মাকড় আর কুকুরের জন্য বিষ্ঠা। ইহাকে ঈশ্বরের দয়ার সম বন্টন বলা যায় কি?[২৮]

প্রচলিত অর্থে ধর্মে আরজ আলী মাতুব্বরের আস্থা ছিল না। তিনি সরদার ফজলুল করিমের সঙ্গে স্পষ্টতই বলেছেন, 'মানবতাকেই' একটা ধর্ম মনে করি। মানবতাই একটা ধর্ম। আমি এটাই পালন করি এবং অন্যকে পালন করতে পরামর্শ দেই। ধর্মীয় যতরকম আচার আচরণ রয়েছে, ঘাত-

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিঘাতে এগুলি যে আস্তে আস্তে কমছে, বিলীন হচ্ছে তা আমি লক্ষ্য করছি। মানবতার দিকে লোক অগ্রসর হচ্ছে এবং সংখ্যায় বাড়ছে।[২৯]

আরজ আলী মাতুব্বর আরও বলেছেন:

> পবিত্র বাইবেল পাঠে বোঝা যায় যে, 'জাভে' নামক ঈশ্বরটি ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি মহাদেশ ও চীন, জাপান, ভারত বাংলাদেশ ইত্যাদির অধিবাসীদের জন্য কোনো মাথাব্যথা নেই, তিনি যেন শুধু ইহুদী জাতি তথা বনি -ইস্রায়েলদের সমাজ ও ঘর সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তিনি যেনো শুধু ইহুদী জাতির ঈশ্বর, অন্য কারো নয়।[৩০]

আরজ আলী মাতুব্বরের এই লেখার কয়েক দশক আগে এ রকম প্রশ্ন বেগম রোকেয়াও তুলেছিলেন। রোকেয়া ধর্ম গ্রন্থের অবতরণের স্থান এবং তাঁর পুরুষ কেন্দ্রিকতা দুই নিয়েই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। রোকেয়া 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধে বলেন– 'এই ধর্ম গ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুরুষ মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান, কোনো স্ত্রী মুনি বিধানে হয়তো তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন।'[৩১] তিনি স্পষ্ট ভাষায় আরও উল্লেখ করেন – 'পুরুষ রচিত কাহিনী ও নির্দেশ সমন্বয়ে ধর্ম গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে।'[৩২]

আরজ আলী মাতুব্বর আরও বলেন, "আদিম মানবের ঈশ্বরকল্পনা ছিল না, কল্পনা ছিল দেবতার। যে তাপ ও আলো দান করে, সে একজন দেবতা; যে খাদ্য দান করে, সে একজন দেবতা; যে বৃষ্টি দান করে, সে একজন দেবতা; এইরূপ- ঝঞ্ঝার দেবতা, বজ্রের দেবতা, মৃত্যুর দেবতা ইত্যাদি অজস্র দেবতা।...পরমেশ্বর বা একেশ্বর কল্পনার পূর্বে যাঁহারা ছিলেন দেবতা একেশ্বর কল্পনার পরে তাহারাই বনিয়াছেন স্বর্গীয় দূত। প্রাচীন মানবের এই স্বর্গদূত পরিকল্পনাটি পরে স্থান পাইয়াছে কতগুলি ধর্মে।"[৩৩] এভাবে আরজ আলী মাতুব্বর প্রমাণ করেন ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা যে ধরনের ধারণায় অভ্যস্ত ঈশ্বর সে রূপে পৌঁছেছেন বহু হাজার বছরে ধর্ম সম্পর্কিত বিশ্বাসে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। একক ঈশ্বরের উদ্ভব খণ্ড খণ্ড দেবতাদের উদ্ভবের অনেক পরের ঘটনা। মানুষের সনাতন জীবন দর্শন আরজ আলী মাতুব্বরকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। পারলৌকিক চিন্তা তাকে কখনও আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বাস্তবতা ও জীবনবাদী চিন্তা তাঁকে অতীন্দ্রিয় সত্তার অনুসন্ধান থেকে বিরত রেখে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পৃথিবীর সন্ধানে ব্যাপৃত রেখেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতীচ্য দর্শনের প্রতি অনুরাগী হলেও তিনি তীব্রভাবে প্রতীচ্যের ভাববিলাসী মতের বিরোধী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আত্মগত ভাববাদী (Subjective Idealist) দার্শনিক বিশপ

Dhaka University Institutional Repository

বার্কলির দর্শন সম্পর্কে তিনি বিরুদ্ধ মত পোষণ করেছেন। তিনি ভারতীয় শাস্ত্র ও ভাববাদী দর্শনের প্রভাব খণ্ডন করতে গিয়ে প্রতীচ্যের ভাববাদী দর্শনকে মোটেই গুরুত্ব দেননি। আর এ কারণেই তিনি ভারতীয় সাংখ্য ও বেদান্তের প্রতিবেধকরূপে জর্জ বার্কলির *Inquiry*- র পরিবর্তে J.S. Mill এর ন্যায় শাস্ত্র (Logic) এবং ডেভিড হিউমের *A Treatise of Human Nature* কে যথার্থ বলে মনে করেন।[৩৪]

কিন্তু তা সত্ত্বেও কতকগুলি কারণে তাকে কেউ কেউ নাস্তিকবাদী আখ্যা দিতে নারাজ। যেমন তিনি চিঠি পত্রের শিরোনামে শ্রী-শ্রী দুর্গা শরণং', 'শ্রী-শ্রী হরি শরনং' প্রভৃতি লিখতেন এবং আচারে - আচরণে, রীতিতে-নিয়মে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতোই চলতেন। এ ছাড়া তিনি আজীবন ব্রাহ্মণের বর্ণচিহ্ন উপবীত, নিজ দেহে ধারণ করতেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধশান্তি প্রভৃতি ক্রিয়া তিনি যথানিয়মে পালন করতেন। এ কারণে অনেকে তাঁকে আস্তিক বলে ধারণা করতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁকে 'আস্তিক' বলা যায় না। সাহিত্যিক বদরুদ্দীন উমর বিদ্যাসাগরের লোকাচার প্রথার অনুসরণের মূল্যায়ণ করে বিদ্যাসাগরকে 'নাস্তিক' বলেই অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে যে সমস্ত লোকাচারকে বিদ্যাসাগর তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রতিবন্ধক মনে করতেন, সেগুলির বিরুদ্ধে দাড়াঁতেন। কিন্তু সমস্ত লোকাচার 'মান্য' করলে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধককতা সৃষ্টি হতো না, সেই সমস্ত লোকাচার ও প্রচলিত নিয়মগুলিকে তিনি শ্রদ্ধার সাথে মানলেও নিতান্তই যান্ত্রিকভাবে 'মান্য' করতেন। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আস্তিকতা বা জাতিভেদে বিশ্বাস কোনোটিই বিন্দুমাত্র প্রমাণ করেনা। কারণ একদিকে যেমন তিনি কোনোদিন লোকাচারের দাসত্ব করেননি, অন্যদিকে তেমনি দেশাচার ও প্রচলিত সামাজিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণারও কোনো প্রয়োজনবোধ করেননি। এ বিষয় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অতিশয় বাস্তববাদী।[৩৫] এভাবে দেখা যায় যে, লোকাচার তাঁর কাছে ছিল নিতান্তই বাহ্য, এই বাহ্যিক আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তাঁকে আস্তিক বলে আখ্যায়িত করা মোটেই সমীচীন হবে না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জীবনে একটি বারের জন্যেও প্রকাশ্যে ধর্মবিষয়ে আলোচনা করেননি। বিদ্যাসাগর এ যুগের অন্যতম বিপ্লবী দার্শনিক কার্লমার্ক্সের সমসাময়িক কালে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মানুষকে ধর্মের মোহমুক্ত করা যায় না। তাঁর চিন্তাধারা ছিল ইহজাগতিক ও মানবকেন্দ্রিক। এমনকি বালকদের বোধশক্তির বিকাশের জন্য তিনি 'বোধোদয়' লিখেছিলেন, তাতেও প্রথম দিকে কয়েক সংস্করণের মধ্যে ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো আলোচনাই করেননি। পরে অবশ্য ঈশ্বর প্রসঙ্গ যোগ করেন, কিন্তু সে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ–যা বালকদের

Dhaka University Institutional Repository

বোঝার সাধ্য হয়নি কখনো। একারণেই তিনি বোধোদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে চাননি। কিন্তু যখন করলেন তখনও বোঝা গেল যে বোধোদয়ের প্রথমে 'পদার্থ' বা Matter .তারপর ঈশ্বর।[৩৬] সুতরাং 'বোধোদয়ের' ঈশ্বর প্রসঙ্গে আলোচনা থাকলেও তাঁকে আস্তিক্যবাদী বলে অভিহিত করা যায় না।

তবে প্রচলিত অর্থে যাকে ধর্ম বলা হয়, সেই অর্থে তিনি ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। তিনি কখনো পূজা-অর্চনা বা জপ-তপ করেননি আবার মন্দির মসজিদ গীর্জায় যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলে উভয়ের মধ্যে অনেক মতবিনিময় হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের মুখ থেকে ঈশ্বর সম্পর্কে একটি কথাও বের করতে পারেননি। এ বিষয়ে তিনি সর্বদা উদাসীন ছিলেন। তাই গোপাল হালদার[৩৭] এ বিষয়ের উপর মন্তব্য করে এভাবে:

> তবু স্পষ্টই বুঝা যায় এদেশে ধর্ম বলতে যা বুঝায়, এবং ধার্মিক লোকেরা ঈশ্বর বলতে যা বুঝেন, বিদ্যাসাগর তাতে আস্থা রাখতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল মানবিক ধর্মে-রিলিজিয়ন অব ম্যান-এ, বরং বলা যায়; যদিও প্রমাণ অজস্র যে, তাঁর সারাজীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস বিষমরূপেই চিড় খেয়ে গিয়েছিল – সে বিশ্বাস ভেঙ্গে যাওয়া তাঁর কালে তাঁর মতো মানুষের পক্ষে, অনিবার্য ছিলো। তথাপি ঈশ্বর সেই মুখ্যস্থান যতখানিই হোক তা জুড়ে বসতে পারেনি। তিনিও ঈশ্বরের আশ্রয় খুঁজেননি। তাই বলা যায়, বিদ্যাসাগরের মত ছিলো বুদ্ধদেবের মতেরই সমতুল্য – বুদ্ধদেব যেমন প্রিয় শিষ্য আনন্দের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন; ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন করো না, বরং আমি যেমন বলেছি তেমনভাবে জীবন গঠন করো 'আর্য সত্য' অবলম্বন করো। ক্ষমা-মৈত্রী করুণায় জীবনকে নির্মল করে তোলাই জীবনের সম্ভাব্য সাধনা। বিদ্যাসাগরের জীবনদর্শনের সঙ্গে মূলত এই আদর্শেরই দেখা যায় সুসংগতি –এই সুস্থ মানবতাবাদের।[৩৮]

উনিশ শতকের মানুষ হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোনো আধ্যাত্মিক মানুষ বা কল্পলোকের কোনো বাসিন্দা নন, তিনি আধুনিক সভ্যতার সামাজিক মানুষ। উনিশ শতকের অধিকাংশ চিন্তাবিদ সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্মালোচনার সাথে জড়িত রয়েছেন, বিদ্যাসাগর সেখানে ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি সমাজ জীবন পুনর্গঠনে ধর্মকে গুরুত্ব দেননি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনের মাধ্যমেই মানুষের ইহলৌকিক, জাগতিক কল্যাণবোধ, হিতবাদী নীতিবোধ জাগ্রত করা সম্ভব এবং তাহলেই সমাজে প্রচলিত নানাবিধ কুসংস্কার, দেশাচার ও সামাজিক অনাচার থেকে সমাজ মুক্তি পাবে এবং ব্যক্তির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধও রক্ষা পাবে। ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

বা ধর্মীয়নীতিবোধ – যে আকারের বা যে প্রকারের হোক না কেন, বা ধর্মকে কেন্দ্র করে সমাজ জীবনে যে আঘাত সংঘাত, তা শেষ পর্যন্ত মানুষের জাগতিক কল্যাণে বা ব্যক্তিসত্তার উন্মেষের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভবত এরূপ বিবেচনায় তাঁর সমাজ পুনর্গঠন পরিকল্পনায় তিনি ধর্মকে পরিহার করেছেন। এভাবে বিদ্যাসাগর ছিলেন সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ। তিনি সব সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিচার ও মূল্যায়ন করেছেন।[৩৯]

আরজ আলী মাতুব্বরও ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দর্শনের প্রবল অনুরাগী হলেও তিনি ছিলেন ভাববাদের বিরুদ্ধে। জীবন, জগৎ সৃষ্টিকর্তা, ন্যায়, অন্যায় সত্য, মিথ্যা, বস্তু ও জীবনের সংজ্ঞা, জীব-অজীবের পার্থক্য ইত্যাদি মৌলিক প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি কৈশোরকাল থেকেই নানারকম প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। বাস্তবতার আলোকে জিজ্ঞাসা, চিন্তা, প্রতিকূল পরিবেশ ও বৈরী রাজপুরুষরা তাঁর চিন্তার প্রকাশকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে। তাঁকে বিধর্মী, ধর্মহীন ইত্যাদি নিন্দনীয় অপবাদে আখ্যায়িত করে- তাঁর সামাজিক জীবনকে বিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জনৈকি ম্যাজিস্ট্রেট, কেন তাঁকে তাঁর চিন্তার জন্য দণ্ড দিয়ে কারাগারে আটক করা হবে না, তাঁর কারণ দর্শানোর জন্য কৈফিয়ৎ তলব করে তাঁর উপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। এতদসত্ত্বেও চিন্তার ক্ষেত্রে আরজ আলী মাতুব্বর কখনো দমিত হননি।[৪০] কিন্তু কতকগুলি কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো আরজ আলী মাতুব্বরের মধ্যেও আস্তিকবাদী ধ্যানধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন মায়ের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তিনি উক্তি করেন:

> আমার মা ছিলেন অতিশয় নামাজী-কালামী একজন ধার্মিক রমণী, তাঁর নামাজ - রোজা বাদ পড়াতো দূরের কথা, 'কাজা' হতেও দেখিনি কোনোদিন আমার জীবনে। মাঘ মাসের দারুন শীতের রাতেও তাঁর তাহাজ্জুত নামাজ কখনও বাদ পড়েনি এবং তারই ছোঁয়াচ লেগেছিল আমার গায়েও কিছুটা।[৪১]

সীজের ফুল কবিতায় তাঁর ধর্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়- এভাবে:

* বিধাতার কৃপাদৃষ্টি হইয়ে যথাকালে
আশাবৃক্ষে হোক ফল প্রতি ডালে ডালে।[৪২]

* ভেস্তে গেল, শান্তি পেল খোদার কৃপায়,
'ইন্নালিল্লাহে' বল মমিন সবায়।[৪৩]

* নিদোর্ষ জগতপতি; জ্ঞানহীন লোক
সংকল্প দোষেতে পায় পদে পদে শোক।[৪৪]

* বাসনা পুরাও সদা বলি হরি হরি,
অতীব মধুর নাম লও প্রাণ ভরি।[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

আবার মায়ের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন, সমাজে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণ অভিযান চালিয়ে তাঁর মায়ের কাছে পরপারে ফিরে যেতে চান। আবার তিনি বলেন, তিনি কখনো ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করছেন না, বরং তিনি ধর্মের বিরাজমান অসত্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলতে চান। অর্থাৎ তাঁর মতে ধর্ম থাকবে মিথ্যার আবর্জনাবর্জিত ও পবিত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৪৬] ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার আরো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, মৃত্যুর পরেও কাঙালীভোজসহ মৃত্যুদিবস পালন– যা মুসলিম ধর্মীয় রীতিনীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মূলত ধর্ম জিজ্ঞাসা ক্ষেত্রে বহু পথ ও মতাদর্শের দুর্গম পথ পরিভ্রমণ করে আরজ আলী মাতুব্বর যে ধর্ম-দর্শন গড়ে তুলেছিলেন সে দর্শন একান্তভাবেই তাঁর অন্তরের আলোক ধারায় আপ্লুত। তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন ধর্ম বিষয়ক আলোচনা করতেন না ,আরজ আলী মাতুব্বরও প্রকাশ্যে কখনো ধর্মবিষয়ক আলোচনা করেননি। বরং মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত ঘটনাটি তাঁকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করেছে। তিনি মুক্তবুদ্ধিরচর্চার মানুষ ছিলেন, সংশয়ের বিরুদ্ধের মানুষ ছিলেন এবং ইহজাগতিক বোধের মানুষ ছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পশ্চাদমুখী গ্রামীণ সমাজে বাস করেও তিনি স্বীয় চেষ্টায়, স্বীয় মননের আলোকে ভিন্নধর্মী মানসিকতা নিয়ে তিনি তাঁর চার পাশের মানুষকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সময়কার সমাজের অধিকাংশ লোক যেখানে ধর্মের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন সেখানে ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সমাজ গঠনে তিনি কখনো ধর্মের গুরুত্ব দেননি। ধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

> সাধারণত আমরা যাহাকে 'ধর্ম' বলি তাহা হইল কল্পিত মানুষের ধর্ম। যুগে যুগে মহাজ্ঞানীগণ এই বিশ্ব সংসারের স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'স্রষ্টার প্রতি মানুষের কি কোনো কর্তব্য নাই? নিশ্চয়ই আছে'– এইরূপ চিন্ত করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু মানুষের সমাজ ও কর্ম জীবনের গতিপথও দেখাইয়া দিলেন সেই মহাজ্ঞানীগণ। এইরূপে হইল কল্পিত ধর্মের আবির্ভাব। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মনীষী বা ধর্মগুরুদের মতবাদ হইল ভিন্ন ভিন্ন।[৪৭]

বরং সকল ধর্ম সম্পর্কে তিনি আরো মন্তব্য করেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকেরা এই কথাই বলে থাকেন যে, তাঁদের আপন আপন ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম, অন্য কোনো ধর্মই সত্য নয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের স্বর্গপ্রাপ্তি, পরিত্রাণ, নির্বাণ বা মোক্ষলাভ ঘটবে না। এ যেন বাজারের গোয়ালাদের ন্যায় সকলেই আপন আপন দধি মিস্টি বলে।[৪৮] তিনি ধর্মীয় বিধি-বিধান লক্ষ করে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেন প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে অনেক রাষ্ট্রের উত্থান-পতন হয়েছে। কিন্তু ধর্মে-

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মে অনেক কলহ বিবাদ থাকাতেও ধর্মের কোন বিলুপ্তি ঘটেনি। এর প্রথম কারণ হিসেবে তিনি বলেন রাষ্ট্রের ন্যায় ধর্মসমূহের আয়ত্তে তোপ কামান ডিনামাইট বা এ্যাটম বোম নাই, যাহা দ্বারা একে অন্যের ধ্বংস সাধন করতে পারে। ধর্মের হাতে মাত্র দুটি অস্ত্র – আশীর্বাদ ও অভিশাপ। তাঁর মতে ধর্মের এ অস্ত্রসমূহ ব্যক্তিবিশেষের উপর আদৌ ক্রিয়াশীল নয় এবং কোন সম্প্রদায়ের বা জাতির উপর একেবারেই অকেজো।[৪৯]

এখানে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আরজ আলী মাতুব্বর ঈশ্বরচন্দ্রের মতো ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ থেকেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরের যুক্তির প্রাঞ্জল্যতা, ধর্মের মুখোশ উন্মোচন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষাচিন্তা বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অন্ধকারময় দেশে বিদ্যাসাগর সমস্ত বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে বুদ্ধির লড়াই চালিয়েছিলেন, আরজ আলীও তা অনুসরণ করেছেন। বিদ্যাসাগর বাঙালি জাতির প্রাণস্বরূপ। কিন্তু প্রাণহীন এই বাংলাদেশে প্রাণ সঞ্চার করতে আরজ আলীর অবদানও কম নয়। উল্লেখ্য যে, বিদ্যাসাগরও ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না, তবে তিনি এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য প্রকাশ করেননি– এখানেই কেবল পার্থক্য।[৫০]

আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন যুক্তিবাদী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে মন্তব্য করেন:

> আঘাত করতে চাননি কারো ধর্ম বিশ্বাসে। ধর্মের মধ্যে যে অংশটি তিনি মনে করেন রূপকথা অথবা অতিকথা তাকে তিনি পৃথক করে ফেলতে চান ধর্ম থেকে। অতিকথাকে (মিথ) তিনি ক্ষতিকর মনে করেন বেশি, মিথ্যা কথা বলার তুলনায়। কেননা অতিকথাকে মিথ্যা বলে সহসা ঠেলা যায় না। অনেক আগে দার্শনিক বেকন বলে গেছেন এই কথাটা যে, কুসংস্কারের তুলনায় নাস্তিকতা ভালো, কেননা নাস্তিক ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করেন, আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি করেন অপমান। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করা বরঞ্চ ভাল, ঈশ্বরকে বিকৃতরূপে উপস্থিত করার চাইতে।... আরজ আলী বেকন পড়েনি, কিন্তু তাঁর লেখাতেও বেকনের ওই কথাটাই আছে। ভিন্নভাবে, প্রচ্ছন্নরূপে।[৫১]

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর এ কথায় স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, আরজ আলী মাতুব্বর ধর্ম ভাবনা হলো 'মুক্তমনের ধর্ম' তথা মানুষের ধর্ম। আরজ আলী মাতুব্বর *অনুমান* গ্রন্থকে সাতটি অধ্যায়ের ভাগ করেছেন। এর মধ্যে যথাক্রমে 'রাবণের প্রতিভা' 'ফেরাউনের কীর্তি;' 'ভগবানের মৃত্যু', 'আধুনিক দেবতত্ত্ব', 'মে'রাজ' এবং 'শয়তানের জবানবন্দি' এ ছয়টি অধ্যায়ে তিনি যুক্তি তর্কের মাধ্যমে রাবণ, ফেরাউন, ভগবান, দেবতা, মেরাজ ও শয়তান সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাকে খণ্ডন করার চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। ধর্ম অথবা ধর্মের নামের লেবাসের পার্থক্যের ব্যাপারে কথা বলার অধিকার আছে সবারই। তাই কাজী নূরুল ইসলামের ভাষায়:

> খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে অনেক লিখেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল। কিন্তু খ্রিষ্টানরাতো আজও তাঁকে দার্শনিক হিসেবে শ্রদ্ধা করে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না জ্যাঁ-পল সার্ত্র। কিন্তু ফরাসি দেশে যাঁরা সব চেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র তিনি তাঁদের একজন। জার্মান দার্শনিক নিট্‌শে বলতেন, ঈশ্বর মরে গেছে। কিন্তু নিট্‌শের দর্শন পড়ানো হয় পৃথিবীর সারা দেশে। বাংলাদেশে এমন কোনো ছাত্র-ছাত্রী নেই যারা রাসেল, সার্ত্র বা নিট্‌শের দর্শন পড়েনি। এ কথা সত্য যে, পাশ্চাত্যে মুক্ত চিন্তার ইতিহাসেও নানা উত্থান-পতন রয়েছে। অনেক দার্শনিক ও বিজ্ঞানীকে ধর্মান্ধতার নির্মম শিকার হতে হয়েছে। ... অনুবাদ গ্রন্থে রামের ব্যক্তিত্ব, দেবতার স্বভাব এবং ভগবান শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাতুব্বর সাহেব তাতে হিন্দু ধর্মের যেকোনো অনুসারীর পক্ষে ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো কেউ এ ব্যাপারে মাতুব্বর সাহেবকে সমালোচনা করে কোনো প্রবন্ধ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।[৫২]

মুহাম্মদ শামসুল হকের মতে:

> আরজ আলী মাতুব্বর মনে করেন, ধর্ম যুগে যুগে মানুষকে সুশৃঙ্খল করে শুভ ও মঙ্গলের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছে। কাজেই ধর্মের একটা প্রগতিশীল ভূমিকা আছে। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যা মানুষকে অমঙ্গলের পথে নিয়েছে। বরং মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সেবাপরায়ণতাই, ধর্মের ধ্যেয়। ধৃ ধাতু থেকে ধর্ম – যা মানুষকে ধারণ করে পোষণ করে। কিন্তু কালে কালে কুসংস্কারের কালো মেঘ ক্রমশ ধর্মকে আচ্ছন্ন করে এক শ্রেণীর মানুষকে মনুষ্যত্ব বিবর্জিত করে ফেলেছে। মাতুব্বরের সংগ্রাম এই মনুষ্যত্বহীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।[৫৩]

আরজ আলী মাতুব্বরের প্রশ্নের তালিকা বিশ্লেষণ করলেও তাকে আস্তিক বলা যায় না। ঈশ্বরচন্দ্রের মতো, প্রচলিত অর্থে যাকে ধর্ম বলা হয়, সে অর্থে তিনি কখনো ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম আবারো মন্তব্য করেন:

> স্বর্গ কোথায়? আরজ আলী মাতুব্বর প্রশ্ন করেছেন তাঁর বইতে। প্রায় সক্রেটিসের মতো বিনয়ে। স্বর্গটি বাইরে কোথাও, নাকি মনের ভেতর। যেখানেই থাকুক, সে যে বাংলাদেশে নেই তা আমরা কে না জানি। স্বর্গ চাই না, বাঁচার মতো পরিবেশ চাই। ... যাইয়ের সাহায্যে কাজ হবে না, যতদিন না জাগরণ আসছে ভেতরে।[৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের উন্নতিকল্পে তিনি বিবেক বুদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আর একই সাথে গুরুত্ব দিয়েছেন ঐক্যের সমন্বয়ের ওপর। আর এজন্য প্রয়োজন হবে অন্ধকার বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের ঐক্য এবং ওই ঐক্যবদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জনগণের ঐক্য। এভাবে বাস্তববাদী আরজ আলী মাতুব্বর বাস্তবতার বাহিরে বিন্দুমাত্র অবস্থান করেননি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো তাঁর ধ্যাণ ধারণায়ও কোনো আধ্যাত্মিকতা বা কল্পলোকের ধারণা স্থান পায়নি।

মানবতাবাদী দার্শনিক আন্দোলনের সাথে নারী মুক্তি আন্দোলনের সম্পর্ক রয়েছে বিশেষ করে আমাদের বাঙালি সমাজে নারীজাতি যে ভাবে অবহেলিত আছে। নারী কল্যাণার্থে বিদ্যাসাগর সমাজের অনেক সংস্কার সাধন করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ ও পরিবারে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজীবন বিরুদ্ধ শক্তির সাথে সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত-বঞ্চিত নারীজাতিকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করা মানবতাবাদীরই পরিচয়। নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য তিনি এমন এক ভূমিকা পালন করেছেন যার জন্যে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন বাংলার ঘরে ঘরে। নারীমুক্তি ও সমাজ সংস্কার শুরু করেন রামমোহন রায়, আর বিদ্যাসাগর তার পুর্ণরূপ দান করেন। রামমোহন তাঁর সমাজ সংস্কারে সহমরণ প্রথা বিলোপ সাধন করে সমাজে নারীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় যেমন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজে নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। উভয়েরই লক্ষ্য ছিল নারী জাতির উন্নতি সাধন করা, সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। ১৮২৯ সালে সহমরণ প্রথার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন সহমরণ প্রথার বিকল্প ব্যবস্থা ছিল বিধবাদের আমরণ ব্রহ্মচর্য – যা ছিল বিধবাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক। এ যন্ত্রণা বিদ্যাসাগরের হৃদয় দারুণভাবে স্পর্শ করল। যার ফলে তিনি ব্রতী হলেন বিধবাদের বিবাহের মাধ্যমে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে।[৫৫] এভাবে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহরোধসহ অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদির জন্য কাজ করে নারীজাতির যথাযোগ্য স্থান নির্ধারণ করাই ছিল তাঁর আরাধ্য। মানুষ ও মানুষের কল্যাণার্থে তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন মানবপ্রেমিক।

আরজ আলী মাতুব্বরও নিঃসন্দেহে একজন মানবপ্রেমিক দার্শনিক ছিলেন। তিনি স্বচ্ছ ও মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই সমাজের নারীদের অবস্থানকে অতি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন সব সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিকে অতিক্রম করে কথা বলেছেন নারী মুক্তির লক্ষ্যে। এর সপক্ষে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে রামায়নের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য থেকে:

Dhaka University Institutional Repository

> কুশ-লবকে গ্রহণ করলেও সীতাকে গ্রহণ করেননি রামচন্দ্র সেদিনও। সীতাদেবী হয়তো আশা করেছিলেন যে, বহু বছরান্তে পুত্রদ্বয়সহ রাজপুরীতে এসে এবার তিনি সমাদর পাবেন। কিন্তু তা তিনি পান নি, বিনিময়ে পেয়েছিলেন যতো অনাদর-অবজ্ঞা। তাই তিনি ক্ষোভে-দুঃখে হয়তো আত্মহত্যা করেছিলেন। নারীহত্যার অপবাদ লুকানোর উদ্দেশে এবং ঘটনাটি বাইরে প্রকাশ পাবার ভয়ে শ্মশানে দাহ করা হয়নি সীতার শবদেহটি, হয়তো লুকিয়ে প্রোথিত করা হয়েছিল মাটির গর্তে, পুরীর মধ্যেই। আর তা-ই প্রচারিত হয়েছে 'স্বেচ্ছায় সীতাদেবীর ভূগর্ভে প্রবেশ' বলে।[৫৬]

আরজ আলী মাতুব্বর এ যুক্তির দ্বারা প্রথম প্রমাণ করলেন যে, আবহমানকাল থেকে সমাজে নারীর অবস্থান কত দুর্বল ছিল এবং সেই সঙ্গে আঘাত হানেন ধর্মীয়, সামাজিক ও সংস্কৃতিকবোধকে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরোও ইঙ্গিত করেন যে, শিষ্টাচার, লোকাচার বা দেশাচার আদৌ কোনো ধর্মীয় বিধিব্যবস্থা নয়।

এভাবে মানবিক আবেদনের মাধ্যমে অবহেলিত নারীজাতির প্রতি আরজ আলী মাতুব্বর দেশবাসীর বিবেকবোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। আর এই মানবিক বেদনা ও চেতনাই হলো আরজ আলী মাতুব্বরের সমাজ সংস্কারের উৎসস্থল। এখানে তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তির অকাট্যতা প্রমাণ করে মানবীয় আবেদনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধর্মীয় আচরণ নারীকে কীভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে রাখার জন্য তৈরি হয়, এ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সেই ধর্মকে ইঙ্গিত করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এদেশে নারীর উপর অত্যাচারের কারণ হিসেবে ধর্মীয় কুপ্রথাকেই তিনি দায়ী করেছেন। খ্রিস্টান মিশনারিরা ভারতে এসেছিলেন তাঁদের ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনে এবং এদেশে আসার বাধা অপসারিত হওয়ার পর যে সমস্ত খ্রিস্টান মিশনারি ভারতে এসেছিলেন তাঁরা ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনেই এদেশে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও সভ্যতাকে খ্রিস্টান ধর্ম এবং ইউরোপীয় সভ্যতার থেকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সমাজে নারীর অবস্থান যে সভ্যতার মান নির্ণয় করে একথাটি মিশনারিদের মুখে বারবার উচ্চারিত হয়েছে, সেই সঙ্গে বলা হয়েছিল যে সমাজে নারীর মর্যাদা নেই। প্রথম দিকে একজন মিশনারি রেভারেন্ড উইয়েট ব্রেট বলেছিলেন 'কুকুর', শূদ্র এবং নারী কখনো দেবতার মূর্তি স্পর্শ করবে না। কারণ তা হলে দেবতার দৈবশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে',[৫৭] যদিও আলেকজান্ডার ডাফ্ নামে একজন সমাজ চিন্তাবিদ শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়েই দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, মেয়েদের লেখাপড়া করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং এ কথাই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল। আলেকজান্ডার ডাফ্ অবশ্য প্রচলিত কয়েকটি কুসংস্কারের কথা প্রবলভাবে প্রচার করেছেন। যেমন লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়। এ ছাড়াও সাধারণভাবে ধারণা ছিল যে, বারবণিতা কিংবা বাঈজীরাই সাধারণত লেখাপড়া শিখে থাকে।[৫৮] পরিবারে কন্যাসন্তানের জন্ম আনন্দবর্ধন করে না, তা

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়া অল্প বয়সে কন্যাসন্তানের বিয়ে, মেয়েদের দুরবস্থার কথা অনেক পাদ্রি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন রেভারেন্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড, বিভিন্ন কারণে হিন্দু মেয়েদের চরিত্র সম্পর্কেও কটাক্ষ করেছেন। খ্রিস্টান মিশনারিদের ভারতবর্ষীয় নারীদের দুরবস্থা সম্পর্কে এই উদ্বেগ কখনো ছিল আন্তরিক, কখনো বা ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যাই হোক না কেন, নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মিশনারিদের অতিরঞ্জিত প্রচারের ফলে এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে প্রভাবিত ও সংস্কার সচেতন হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।[৫৯] তিনি হয়তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এ বাণী নয়নে উপলব্ধি করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষায়:

> স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়মদোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুভাবাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশত স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষজাতি, কতিপয় অতিগর্হিত প্রথার নিতান্ত বশবর্তী হইয়া, হতভাগ্য স্ত্রীজাতিকে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নেই।[৬০]

খ্রিস্টান মিশনারিরা ভারতবর্ষের নারীদের যে অবস্থানের উল্লেখ করেন, তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন নারী সমাজ ছিল অত্যন্ত অবহেলিত। নারীজাতিকে মুখে দেবী আর কাজে দাসী হিসেবে মূল্যায়ন করার কুপ্রথাই তৎকালে দেশে প্রচলিত ছিল। তাই বিদ্যাসাগর নারীজাতির শিক্ষা বিস্তারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্যই ছিল নির্যাতিত ও অসহায় নারী জাতির ভাগ্যোন্নয়নে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কুপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো। তিনি বিধবা বিবাহের প্রবর্তন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ দূরীকরণের লক্ষ্যে নারীজাতির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এ লক্ষ্যে তিনি নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম- শিক্ষাবিহীন শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন[৬১] (১৮০১খ্রি.-১৮৫১খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে আরও অনেকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই সফল হতে পারেননি। সমস্ত মিশনারিরা নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন, দেখা গেল সে সফল মিশনারি নারী শিক্ষার নামে মেয়েদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারেও বেশি উৎসাহী ছিল। ফলে

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রীদের মধ্যে কিছু ছাত্রী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে দারুন অসন্তোষ দেখা দেয়। এমনকি নারীশিক্ষার ব্যাপারে অনেকে আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকে এবং যারা এতকাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ছিলেন তাঁরা দূরে সরে যেতে লাগলেন। নারীশিক্ষার প্রতি সমাজের এই অনীহা দূর করে খ্রিস্টীয় ভাবধারামুক্ত ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়েই ওয়াটার বেথুন উদযোগী ছিলেন। নারী জাতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রচলন করাই ছিল তাঁর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য; তাঁর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভাষণের প্রদত্ত বাণী থেকেই এ কথা উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেন:

> কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমি জানি, মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার কথা বললে অনেকে বিদ্রূপের হাসি হেসে থাকেন। তাঁদের ধারণা মেয়েরা যে শিক্ষা পাবে, তা তাঁদের জীবনের কোনো কাজেই লাগবে না। বাস্তবিক শিক্ষা যদি তাই দেওয়া হয়, তাহলে তাঁদের সঙ্গে আমিও সেই শিক্ষাকে বিদ্রূপ করব। ... আমি মাতৃভাষা শিক্ষা ও চর্চার উপর জোর দিয়েছি বেশি। ইংরেজি শিক্ষার কথা বলেছি, ইংরেজি সাহিত্য অনেক উন্নত বলে। বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে নিজের মাতৃভাষার ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন করবে, এই আমার ইচ্ছা। এই বিদ্যায়লয়ের মেয়েদের প্রথমে ভালো করে বাংলা শিক্ষা দেওয়া হবে। তারপর কিছু কিছু ইংরেজিও শেখানো হবে, এছাড়া সেলাই, অঙ্কন, হাতের কাজ প্রভৃতি মেয়েদের যে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে, সেগুলোও শিক্ষা দেওয়া হবে। এইভাবে শিক্ষা পেলে মেয়েরা উপকৃত তো হবেই, তাঁদের গৃহের শ্রীও তারা সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলতে পারবে।[৮২]

বেথুন সাহেবের এ ভাষণ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তৎকালীন সমাজে নারীশিক্ষা অনেক অবহেলিত ছিল। নারীশিক্ষা লোকাচার, দেশাচার ও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ছিল, আর এ কারণেই তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। নারীশিক্ষা সম্পর্কে যখন সমাজে এ ধরনের অনাচার প্রচলিত তখনই বিদ্যাসাগর বেথুন সাহেবের 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'-এ অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে, সমাজের অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। বিদ্যাসাগর তাঁর সমাজে প্রচলিত নারীশিক্ষা বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রথমেই তিনি নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে মনোনিবেশ করেন। এ উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের গাড়ির দু'পাশে মহানির্বাণতন্ত্রের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দেন। সেই শ্লোকের অংশ হল: "কন্যান্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।" বিদ্যাসাগরের এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ওয়াটার বেথুন মারা যাবার পর 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল', 'বেথুন স্কুল' নামে পরিচিত হতে থাকে, পরবর্তীকালে এ স্কুল কলেজ

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে উন্নীত হলে এর নাম দেয়া হয় "বেথুন কলেজ"। বাংলার তৎকালীন ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের আশ্বাসে বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। হুগলি জেলার পোটবারে দ্বিতীয় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি সরকারি অনুমোদন[৬৩] লাভ করে। বিদ্যাসাগর স্থাপিত ৪০টি বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫টি বালিকা বিদ্যালয় সরকারি গ্রান্ডস-ইন-এড পায়নি। বিদ্যাসাগর নিজে অর্থব্যয় করে ঐগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে সরকারের কাছ থেকে টাকা ফেরত পেলেও সরকার এক হাজার টাকার বেশি দিতে রাজি হননি। বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়গুলির প্রতি মমত্ববোধে 'নারী শিক্ষা ভাণ্ডার' নামে তহবিল গঠন করে এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। অনেক শিক্ষানুরাগী এবং বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ কিছু সিভিলিয়ান এই তহবিলে নিয়মিত চাঁদা দিতেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির গভর্নর স্যার বার্টল ফ্রিয়ার-কে ১৮৬২ সালে একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, "যেসব বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য আপনি চাঁদা দিয়েছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে। নিকটবর্তী জেলাগুলির মানুষও স্ত্রী শিক্ষার সমাদর করা আরম্ভ করিয়াছে।"[৬৪] এভাবে নারীশিক্ষার প্রতি ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অগ্রণী ভূমিকা। নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন সদা সচেতন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগর ছিলেন একজন বাস্তবাদী দার্শনিক। নারীশিক্ষার প্রচলনের ফলে নারীশিক্ষা মাধ্যমে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি দেখেছেন, সমাজে বহুল প্রচলিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত হানতে হলে এ সমাজ যুক্তির দোহাই মানবে না। তাই তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তির মাধ্যমেই প্রমাণ করেছেন যে, বিধাব বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত করার কারণেই সমাজ তা গ্রহণ করেছে। এর জন্য তিনি শুরুতে বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট হচ্ছে তা এক্ষণে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হয়েছে।[৬৫] বিষয়টির প্রয়োজনীতা নির্দেশ করার পর বিদ্যাসাগর, বিষয়টির পক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদানের পূর্বে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার আলোকে তিনি প্রথমেই ধর্ম শাস্ত্রের লক্ষণ নির্দেশ করেন।[৬৬] তারপর তিনি তাঁর আবিস্কৃত শাস্ত্রীয় যুক্তির মূল ভিত বিধবার পুনর্বিবাহ বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের অন্যতম প্রণেতা পরাশরের বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক শ্লোকের অবতারণা করেন। পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে বিধবাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> স্বামী অনুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, ক্লীব বলে প্রমাণিত হলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করলে, অথবা পতিত হলে স্ত্রীরা পুনর্বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন।[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

পরোপকারী পরাশর বিধবাদের বিবাহের বিধি প্রদান করেন। তাই স্বামীর মৃত্যুসহ উপর্যুক্ত পাঁচ প্রকার অঘটনে বিধবার পূর্ণবার বিবাহ করা শাস্ত্রসম্মত হলো।[৬৮] শাস্ত্রীয় যুক্তির সাহায্যে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রথা প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন:

> যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে (বিধবাবিবাহকে) কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোক কখনই ইহা কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদানুসারে চলিতে পারেন না। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বোতভাবে কর্তব্যকর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্র সম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক।[৬৯]

শাস্ত্রীয় যুক্তি গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে তিনি বেদব্যাস প্রচলিত রীতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ পরস্পরবিরোধী হলেও বেদকে অনুসরণ করাই শ্রেয়। আর স্মৃতি ও পুরাণ পরস্পরবিরোধী হলেও স্মৃতিকে অনুসরণ করা শ্রেয়। মনুসংহিতার বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বিদ্যাসাগর এ কথাও প্রমাণ করেন যে, যুগানুসারে মানুষের শক্তি কমে যাওয়ার কারণে এক যুগের ধর্ম অন্য যুগের প্রযুক্ত নয়। এক যুগের ধর্ম এক রকম। সত্যযুগের ধর্ম অন্য, ত্রেতাযুগের ধর্ম অন্য; দ্বাপর যুগের ধর্ম অন্য এবং কলিযুগের ধর্ম অন্য।[৭০] বিদ্যাসাগর এ সমস্যার সমাধান করেছেন পরাশর সংহিতা থেকে। পরাশর সংহিতায় অতি স্পষ্টভাবে কোন যুগের কোনো ধর্ম অনুসরণীয় তা বলা হয়েছে। সেখানে আছে, মনু নিরূপিত ধর্ম সত্যযুগের ধর্ম গৌতম নিরূপিত ধর্ম ত্রেতাযুগের ধর্ম, শঙ্খ লিখিত ধর্ম দ্বাপর যুগের ধর্ম এবং পরাশর নিরূপিত ধর্ম কলিযুগের ধর্ম।[৭১] তাই বিদ্যাসাগরের মতে কলিযুগের পরাশর শাস্ত্রই প্রধান। পরাশর সংহিতায় যেহেতু পূর্বোক্ত পাঁচটি অবস্থায় বিধবার পুনর্বিবাহের নির্দেশ রয়েছে, তাই কলিযুগে বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রানুমোদিত।

বিদ্যাসাগর বিধবা প্রবর্তনের জন্য যেসব শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করেছেন, বিরোধীপক্ষ তা খণ্ডন করার লক্ষ্যে পুস্তক রচনা করে ভীষণভাবে চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ রচিত এবং উমাকান্ত তর্কালঙ্কার সংশোধিত *বিধবা বিবাহের নিষেধক প্রমাণাবলি;* কালীদাস মৈত্র রচিত *পৌনর্ভবখণ্ডনম্,* রামচন্দ্র মৈত্র সঙ্কলিত *বিধবোদ্বাহবারক,* রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাসদগণ বিরচিত *বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি-না* এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তর। এসব পুস্তিকায় উত্থাপিত যুক্তি অধিকাংশই হাস্যকর ভাবা বিকট ও রুচিপূর্ণ। প্রতিবাদীদের অনেকেই যুক্তি দেন, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের পক্ষে যে পরাশর রচনাটি উদ্ধার করেছেন, তা বাগদত্তা কন্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বিধাব নারীর ক্ষেত্রে নয়। [৭২]

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাসাগর বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি-না,* এ বিষয়ের ওপর দ্বিতীয় পুস্তক আরও ব্যাপক কলেবরে প্রকাশ করলেন। এখানে তিনি গোঁড়া রক্ষণশীলদের শাস্ত্রীয়-যুক্তি ও ব্যাখ্যা খণ্ডন করে বিধবা বিবাহের পক্ষে আরও জোরালো ভাষায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনা করেন। প্রথম পুস্তিকায় শিষ্টাচার বা দেশাচার সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন দ্বিতীয় পুস্তিকায় তা আরও পরিষ্কার করে বিরুদ্ধবাদীদের খণ্ডন করেন। মহাভারত[৭৩] থেকে শ্লোক সংগ্রহ করে তিনি দেখিয়েছেন শিষ্টাচার বা দেশাচার সব থেকে দুর্বল প্রমাণ। তাই এর দোহাই দিয়ে বিধবা বিবাহকে নিবৃত্ত করা যায় না। তিনি জোরালো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, পরাশর বচন- বিবাহিত বিষয়, বাগদত্তার বিষয় নয়; কলিযুগ বিষয়, যুগান্তর বিষয় নয়। আবার পরাশরের বিবাহ-বিধি মনুবিরুদ্ধ নয়, বেদবিরুদ্ধও নয়। এভাবে তিনি নানাবিধ যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, পরাশয় বচনই সর্বতোভাবেই বিধবা বিবাহের পক্ষে। সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর এভাবে নারীজাতিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার বলয় থেকে মুক্ত করতে সহায়তা করেছেন।

আরজ আলী মাতুব্বর স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন এভাবে দেশাচারকে ধর্মীয় বিধানের স্বীকৃতি দিয়ে নারীদের ওপর নানাভাবে অনাচার অত্যাচার চলছে। আরজ আলী নীরবে নিভৃতে এভাবে নারীদের শৃঙ্খলমুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কারণ দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে নারী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলো আলোড়িত হচ্ছে আরজ আলী মাতুব্বর আরো দু' তিন দশক আগে সে বিষয়গুলো উথাপন করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরের এ প্রশ্ন হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। এ প্রশ্নের শিকড় ছিল দীর্ঘদিনের প্রোথিত দেশাচারের অনিয়মের বিরুদ্ধে একটি তীব্র প্রতিবাদ। তাই নারীদের প্রতি মানবীয় বেদনা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরজ আলী বলেন, মুসলমান পরিবারে ভাঙন সৃষ্টির জন্য প্রধানত দায়ী হলো তালাক প্রথা এবং এ প্রথার অপব্যবহার করা হয়। বিয়ের সময় স্ত্রী -পুরুষের সম্মতির প্রয়োজন হয় অথচ বিবাহ বিচ্ছেদের সময় স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন হয় না। মাতুব্বর বলেন– স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়, অথচ তুচ্ছ কারণে বহুলোক স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। স্ত্রী তার ভুল সংশোধন করার সুযোগ পায় না। অর্ধাঙ্গ যদি পঙ্গু বা রোগগ্রস্থ হয় তবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া বাঞ্চনীয়। ঠিক তেমনি স্ত্রীকে সংশোধন করে নেওয়া প্রয়োজন। মাতুব্বর মনে করেন– স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি হবে তা বিয়ের আগেই অভিভাবকদের চিন্তা করা উচিৎ, প্রয়োজনবোধে মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নেওয়া চলে। "হিল্লা প্রথা" যা ১৯৬১ সালে পারিবারিক আইন দ্বারা রহিত করা হয়েছে তা সম্পুর্ণ অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করে মাতুব্বর বলেন– যখন স্বামীর ক্রোধের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তখন স্বামীর জন্যই শাস্তির বিধান থাকা প্রয়োজন।[৭৪] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো আরজ আলী মাতুব্বরের দৈব বাণীতে কখনো আস্থা ছিল না। মাতুব্বর মুক্ত মন নিয়ে প্রচলিত

Dhaka University Institutional Repository

রীতিনীতি সংস্কার করার পক্ষপাতী ছিলেন। হিন্দু ধর্মে প্রচলিত তৎকালীন 'সতীদাহ' প্রথা অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল, ফলে বৃটিশ আমলে এ অমানবিক ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছিল। মাতুব্বর বলেন ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার করণে এ ধর্মীয় গোঁড়ামি আবার ফিরে আসবে কিনা। এ ব্যাপার নিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর সংকিত। কারণ সতীদাহ প্রথা রহিত করণে তৎকালীন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর সপক্ষে ছিলেন মাত্র গুটিকয়েক হিন্দু, অধিকাংশ গোঁড়া হিন্দুই ছিলেন বিপক্ষে।[৭৫] মাতুব্বরের ভাষায়:

> ধর্ম জগতে এরূপ কতগুলি নীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি এবং ঘটনার বিবরণ প্রচলিত আছে যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নহে, এবং ওগুলি দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত ও বটে।[৭৬]

কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন আরজ আলী সম্পর্কে মন্তব্য করেন এভাবে:

> নারীকে তিনি দেখেছেন সমাজের বৃহত্তর অংশ হিসেবে। এই বৃহত্তর অংশের নিপীড়ন তাঁর কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক মনে হয়েছে। সে জন্য তিনি ধর্মের নামে প্রচলিত সেই মূলে হাত দিয়েছেন। নারী আন্দোলন বা নারী অধিকারের সপক্ষে কথা বলার জন্য তিনি শুধুই তাঁর দায়িত্ব পালন করেননি। বিষয়টি তাঁর কাছে উপরিতলের বিষয় নয়, এটি জীবনেরই গভীর দিক, যে জীবন সভ্যতা নির্মাণ করে এবং মানবজাতির অগ্রযাত্রাকে বিস্তৃত করে। সাদা চোখে দেখে বলা যাবে না যে, আরজ আলী মাতুব্বর শুধুই নারীবাদী ধারণা থেকে এমন একটি আঘাত করেছেন সমাজকে। নারী নির্যাতনের বিষয়টি তাঁর কাছে জীবনের মৌল সত্যের বিপরীত কাজ বলে মনে হয়েছে। এই অর্থে তাঁর ভূমিকা একজন বড়মাপের সমাজ সংস্কারকের।[৭৭]

বিদ্যাসাগর ও আরজ আলী মাতুব্বর – এ দুই দার্শনিককে দেখা যায়, সমাজে যা কিছু অমঙ্গল অশুভ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হতে। সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁরা ছিলেন নিরপেক্ষ বাস্তববাদী চিন্তাবিদ। ভাববাদের কাল্পনিকতা তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি। যা কিছু দেখেছেন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছেন, প্রচলিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত হেনেছেন যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে উভয় দার্শনিক মানুষের মর্যাদার লক্ষ্যে কথা বলেন। যা একটি সুন্দর সুষ্ঠ সমাজ গড়ার হাতিয়ার স্বরূপ। সতীদাহ প্রথা,অবাঞ্ছিত কন্যাসন্তান হত্যা, পরিবারে কন্যাসন্তানের অবহেলা, বিধবার অশেষ শারীরিক যন্ত্রণা ও অকাল মৃত্যুর ফলে বহুদিন ধরে ভারতীয় সমাজে নারীদের দৈহিক অস্তিত্ব ছিল সঙ্কটাপন্ন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নারীকে এইরূপ ধর্মীয় সামাজিক প্রথা থেকে রক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

করে, দৈহিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারকরা তৎপর হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে নারী শিক্ষার প্রচলনের কারণে নারীজাতি কিছুটা সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। তবে এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরই বেশি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রথমদিকে ন্যূনতম পারিবারিক প্রয়োজনেই নারীশিক্ষার প্রচলন হয়েছিল। সত্তরের দশকে অবশ্য উচ্চশিক্ষার দ্বার প্রসারিত হয়। বিদ্যাসাগর এই ব্যবস্থাকে শুধু সমর্থনই করেননি, নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে তিনি অভিনন্দিতও করেছিলেন। নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্ন তখনও আলোচিত হয়নি। নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবী উচ্চারিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগর নারীর কল্যাণে যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাতে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৭৮]

সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নারীজাতির অবদান সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গির পূর্বাভাস পাওয়া যায়। নারীজাতির প্রতি আগস্ট কোঁতের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দেখা যায় এ দুই দার্শনিকের বহু পূর্বে আগস্ট কোঁতে নারীজাতির এ অবদানকে অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। পরিবার ও সমাজে নারীজাতির তৎকালীন অবস্থান কোঁতকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। সামাজিক প্রগতিতে নারীর ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিঃসন্দিগ্ধ। এ সমাজের পুনর্গঠন ও প্রগতির ক্ষেত্রে নারী জাতির অগ্রণী ভূমিকায় তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যাসাগর দৃষ্টবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এমনকি পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে অগাষ্ট কোঁতে, জেমস্ মিল ও জন স্টুয়ার্ট মিল ভারতীয় দার্শনিকদের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আরজ আলী মাতুব্বর প্রচলিত অর্থে যাকে ধর্ম বলা হয় সে অর্থে তাঁরা ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। উভয় দার্শনিকই পূজা-অর্চনা, বা যপ-তপ করেননি; আবার মন্দির-মসজিদ-গির্জায় যাওয়ারও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। তাঁদের সমগ্র জীবন সাধনায় কবি চণ্ডীদাসের 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', এই মানব ধর্মেরই স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ধর্মের নামে যারা আবিলতা সৃষ্টি করে তাকে প্রতিহত করা সত্য-সন্ধানী মানুষেরই কাজ। একশ্রেণীর লোক খারাপ দিকটিকে প্রতিহত করতে চায় না। আবার মানবিক সত্যকেও প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না। এই দু'দার্শনিকই যাবতীয় ভেদাভেদের উর্ধ্বে জীবনের সেই মানবিক দিকটিকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং মানবিক বোধের বাইরে যা কিছু তা প্রতিহত করতে চেয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনের মাধ্যমেই মানুষের ইহলৌকিক, জাগতিক কল্যাণবোধ, হিতবাদী নীতিবোধ জাগ্রত করা সম্ভব। তাহলেই সমাজ মুক্তি পাবে নানাবিধ প্রচলিত কুসংস্কারক, দেশাচার ও সামাজিক অনাচার থেকে। ফলে রক্ষা পাবে ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মীয় নীতিবোধ – যে আকারের বা যে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকারের হোক না কেন, বা ধর্মকে কেন্দ্র করে সমাজজীবনে যে আঘাত সংঘাত, তা শেষ পর্যন্ত মানুষের জাগতিক কল্যাণে ব্যক্তিসত্তার উন্মেষের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।[৭৯] তাঁদের ধর্ম ভাবনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমাজ পুনর্গঠন পরিকল্পনায় তাঁরা ধর্মকে গুরুত্ব দেননি।

উভয় দার্শনিকের আদর্শ ছিল বাস্তবমুখী। এ দুই দার্শনিকের সবচেয়ে বেশি স্মর্তব্য যে বিষয় সেটি হলো বিদ্যাসাগরের যেটি সবচেয়ে বড় পরিচয়, সেটি তাঁর দেশবাসীরা বিভিন্ন তিরস্কারের মুখে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছেন। অপরদিকে যদিও আরজ আলী দেশবাসীর তিরস্কারকে অগ্রাহ্য করার প্রয়াস পেয়েছেন তবুও তাঁকে পেতে হয়েছিল পবিত্র হাজতবাস। এর থেকে একটি কথাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর দেশের লোক যে যুগে ছিলেন অন্ধ, ছিলেন বদ্ধতায় নিমগ্ন; তাঁরা সে যুগকে অতিক্রম করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের স্থান বর্তমান কালেও আছে এবং ভবিষ্যতেও আরও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। তাঁরা অতীতের জড়বাঁধা নিয়মকে লঙ্ঘন করে দেশকে ভবিষ্যতের অগ্রগতির চরম ও পরম সার্থকতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কাজকর্মের উৎস ও প্রেরণা ছিল মানুষ। জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে মানুষের মানবতার অম্লান স্বীকৃতি তাঁর বোধ ও উপলব্ধির মূল কথা।[৮০] জাগতিক মঙ্গল ও কল্যাণ ভাবনা তাঁর দর্শনে প্রবল। জীবন দর্শনে তিনি স্বীকার করেছেন মানুষকে। তিনি যে মানুষকে স্বীকার ও গ্রহণ করেছেন, সে মানুষের কোনো জাত নেই, কোনো ধর্ম নেই। অর্থের পরিমাপে বা কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস অবিশ্বাস বা সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় সে মানুষের বিচার করা চলে না।[৮১] আরজ আলী মাতুব্বরেরও যাবতীয় কাজকর্মের উৎস ছিল মানবপ্রেম। তাই আরজ আলী মাতুব্বর উপলব্ধি করেন: "বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মই আস্তিক বিশেষত একেশ্বরবাদী। হিন্দুধর্মও মূলত একেশ্বরবাদী। তাই যদি হয় অর্থাৎ জগতের সকল লোকই যদি একেশ্বরবাদী হয়, তবে তাহাদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্ববোধ থাকা উচিত।"[৮২] অর্থাৎ আরজ আলীও বিদ্যাসাগরের মতো স্বীকার করেন যে, মানুষের কোনো জাত বা ধর্ম নেই। তাই আরজ আলী মাতুব্বরের মতে মানবতার মাপকাঠিতে মানুষ পরস্পর পরস্পরের ভাই, ভালোবাসার পাত্র এবং তাঁরা সকলেই সমানভাবে দয়ামায়ার যোগ্য অর্থাৎ মানবতার দৃষ্টিতে তাঁরা সবাই সবার সমান।[৮৩]

কথিত আছে, বিদ্যাসাগর তাঁর আয়ের প্রায় সবটুকু ব্যয় করতেন দয়া-দাক্ষিণ্য ও পরোপকারের কাজে। তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে সমস্ত সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করে গেছেন। তিনি তাঁর অর্জিত অর্থ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে গেছেন। বিদ্যাসাগরের 'উইল' মানবতাবাদী জীবনদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মহাত্মা যেমন গান্ধীজির চরিত্রের মহৎ দিকটির পরিচয় বহন করে, মহর্ষি যেমন দেবেন্দ্র চরিত্রের বড় দিকটির পরিচয় বহন করে, ব্রাহ্মানন্দ যেমন কেশব চরিত্রের বড় দিকটির পরিচায়ক তেমনি দয়ার সাগরও বিদ্যাসাগর চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রকাশ করে। তাই বিদ্যার সাগর হয়েও একই সঙ্গে দয়ার সাগর। তার স্বভাব-চরিত্রই এমনভাবে গঠিত ছিল যে, কারও বিপদ দেখলে তিনি তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে না গিয়ে থাকতে পারতেন না। এই সাহায্য কখনও তিনি করতেন অর্থের মাধ্যমে, আবার কখনও বা করতেন সেবার মাধ্যমে। তিনি নিজে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম বলে অভিহিত করেছেন। এই পুণ্যকর্ম পালন করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন এবং এজন্য তিনি প্রাণান্ত স্বীকারেও প্রস্তুত ছিলেন। এছাড়া তিনি যে কত নীতিবান ও ত্যাগী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার নিজ পুত্রকেও বিয়ে দিয়েছিলেন বিধবার সঙ্গে। অনুজ শ্রী সম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা এক চিঠিতে[৮৪] এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

> ... আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্‌যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না।... বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-বিহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম তাহা হইলে আমার অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে সঙ্কুচিত হইব না।[৮৫]

সমাজ জীবনে এমনি স্বার্থত্যাগী নীতিবানদের দৃষ্টান্ত বিরল। অপরদিকে আরজ আলী মাতুব্বরও আদর্শ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্যসাধারণ। সততা ও নৈতিকতায় ঘাটতি ছিল না একবিন্দুও জীবনের কোনো পর্যায়ে। দ্বিগুণ পোষণকারী ব্যক্তিও তাঁর সততা, নৈতিকতায় মুগ্ধ হয়েছেন, যে কারণে আমিন পেশায় নিয়োজিত থাকাকালে তার দর্শনের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী চরমোনাইয়ের পীর সাহেব তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন। পীর সাহেবের জমি জিরাত সূক্ষ্মভাবে মাপার জন্য আরজ আলীকে

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত মনে করেছিলেন। নিঃস্বার্থপরায়ণতা ও নৈতিকতার আরেকটি ঘটনায় পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বাড়ি থেকে বরিশাল শহর প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে থাকায়, বরিশাল লাইব্রেরিতে পড়াশোনা বা সমমনা লোকজনের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন মাঝি আমজাদ আলীর নৌকায় আসা-যাওয়া করতেন। এমনিভাবে একদিন বাকিতে বাড়ি ফিরলে পড়াশোনায় মগ্ন হওয়ার কারণে মাঝির পাওনার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। রাত দুটোর দিকে হঠাৎ মাঝির পাওনার কথা মনে পড়ায়, হারিকেন জ্বেলে নাতি ফরিদকে ঘুম থেকে উঠিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেলেন তিন কিলোমিটার দূরবর্তী মাঝির বাড়ি। ভুলে গিয়েছিলেন বলে ক্ষমা চাইলেন। মাঝিতো বিস্ময়ে হতবাক।[৮৬] বিবেকবোধ ও নীতিবোধ এমনিভাবে তাকে জাগ্রত করেছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল। এভাবে আরজ আলী মাতুব্বর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর– এ দুই দার্শনিকেরই আদর্শের সাথে, চিন্তার সাথে জীবন যাপনের সম্মিলন অনন্যসাধারণ।

বিদ্যাসাগর হলেন অনন্যসাধারণ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। যথার্থ মানবতাবাদীই – ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং ব্যক্তিসত্তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে মানুষের কল্যাণ কামনা করে। স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি আস্থা থাকলে, নিজ সত্তা সম্পর্কে মর্যাদা জ্ঞান না থাকলে অপর ব্যক্তিসত্তা বা অস্তিত্বকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া যায় না - যা এই দুই দার্শনিকের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল। তাঁরা শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কখনও নিজ ব্যক্তিসত্তার বিসর্জন দেন নি।

উভয় দার্শনিক জাগতিক ঘটনাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁরা সব ঘটনার কার্যকারণ-সম্পর্ক খুঁজেছেন। জাগতিক কোনো ঘটনাকে তাঁরা ঐশ্বরিক ক্রিয়া বা দুর্ভেদ্য রহস্যের প্রতিফলন হিসেবে গ্রহণ করেননি। ঘটনার কার্যকারণ খুঁজতে যুক্তিবাদী মনে সংশয় দেখা দিত। সংশয় জাগত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে। মানবিক করুণায় আপ্লুত হয়ে উভয় দার্শনিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। উভয় দার্শনিকের মানবতাবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো – তাঁদের যুক্তি। উভয় দার্শনিক সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন – তবুও তাঁদের মানবতাবাদ আবেগসর্বস্ব ছিল না। তাঁদের মানবপ্রেমিক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল লৌকিক পৃথিবীর দিকে। আর তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিল নৈয়ায়িক মানসিকতার মূলমন্ত্র। সম্ভবত এটা ছিল যৌক্তিক মানবতাবাদীরই আর একটা রূপ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, বাস্তববাদ ও যুক্তিবাদ – মানবতাবাদের এই ত্রিধর্মই উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান ছিল প্রবলভাবে। তাঁরা যথার্থই মানুষের স্বরূপান্বেষণে নিজেদেরকে জীবনভর ব্যাপৃত রেখেছেন। বিদ্যাসাগর ও আরজ আলী উভয় মানসে সত্য বিশ্লেষণই ছিল একান্ত বাস্তব। সত্যের কোনো দেহাতীত, কালাতীত, অতীন্দ্রিয় সত্তা তাঁদের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁরা সত্য প্রকাশের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে শাস্তির ভয়ে ভীত হননি কিংবা পুরস্কারের লোভে আকৃষ্ট হননি। কোনো আইনের ভয়েও যে তারা সত্যের অনুসারী হয়েছেন তা নয়, বরং নিজেদের দার্শনিকবোধের প্রতি অনুগত হয়েই তারা সত্যের সাধন করেছেন। এ্যারিস্টটল যেমনটি করে বলেছিলেন: "অন্যেরা যা করে নিছক আইনের ভয়ে, তা-ই স্বেচ্ছায় করার অনুপ্রেরণা আমি অর্জন করেছি দর্শন থেকে ।"[৮৭] এরিস্টটলের এ উক্তিতেই রয়েছে যথার্থ দর্শনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং যথার্থ দার্শনিক চরিত্রমানসের। প্রাচীন যুগের সক্রেটিস থেকে শুরু করে সমকালীন রাসেল, সার্ত্র প্রমুখ দার্শনিকগণ জ্ঞান ও সত্যের তথা মহৎ মানবোচিত জীবন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রাণ দিয়েছেন। আরজ আলী মাতুব্বর ও বিদ্যাসাগর জ্ঞান ও সত্যের অন্বেষণে ছিলেন অন্যতম এবং তাঁদের সকল কর্মের পশ্চাতে কোনো না কোনো জাগতিক উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে আর্তের সেবাই ছিল তাঁদের ধর্ম। আর এখানেই তাঁরা সার্থক – এক পরমার্থিক প্রত্যাশাবিহীন জীবনবাদে।

এভাবে সত্য সুন্দর মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন যাবতীয় অপশক্তি বিরুদ্ধ, ধর্মীয় শোষণের এবং সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ছিল আরজ আলী মাতুব্বর এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের । বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর অর্জন করেছেন *দয়ার সাগর* উপাধি। এ কাজ কখনো তিনি করতেন সেবার মাধ্যমে আবার কখনো করতেন অর্থের মাধ্যমে। তিনি যা আয় করতেন তা সবটুকু ব্যয় করতেন দয়া-দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে। তিনি এতই দয়ার মানুষ ছিলেন কয়েকজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সঠিক সময় মাসোহারা পাঠানোর লক্ষ্যে তাঁর স্বাস্থ্যহানি হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকতে পারেননি।[৮৮] আবার ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণবঙ্গ ও উড়িষ্যায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি নিজের জেলা ও নিজের গ্রামে গিয়ে সম্পূর্ণ নিজের খরচে দীর্ঘ চার মাস যাবত লঙ্গরখানা খুলে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। আবার অল্পদামে অসহায়দের চিকিৎসার জন্য তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন এবং এ চিকিৎসাশাস্ত্রে সুনাম অর্জন করেন। বিদ্যাসাগরের বদান্যতার আর একটি উদাহরণ হলো মাইকেল মধুসূদনকে আর্থিক সাহায্য প্রদান। অর্থানুদানের জন্য মাইকেলের আবেদনে তিনি অতুলনীয় সাড়া দিয়েছিলেন।[৮৯] নিজের সাক্ষাৎ আত্মীয়স্বজন ছাড়াও তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অর্থানুদানের উইলের মাধ্যমে তিনি "দয়ার সাগর উপাধি" লাভ করেন। বিদ্যাসাগরের এ উইল তাঁর মানবতাবাদী জীবনদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

অপরদিকে আরজ আলী মাতুব্বরও ইহজাগতিকতা ও মানবতাবাদে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জীবদ্দশায় আরজ আলী মাতুব্বর স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের যোগ দেন। তিনি এতই মানবতাবাদী ছিলেন যে, মানবকল্যাণে

Dhaka University Institutional Repository

নিজের যাবতীয় সম্পত্তি দান করে যান। অধিকন্তু জীবন সায়াহ্নে নিজের চোখ ও মরদেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য দান করে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এক ব্যতিক্রমধর্মী ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দেন। লামচরি গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী আরজ আলী মাতুব্বর আনুষ্ঠানিক ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাব্রতী ধর্মাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করে বিদ্রোহী হয়ে রইলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। স্বশিক্ষিত হয়েও জ্ঞানের স্রোতস্বীনী ধারায় ছিলেন অসীম শক্তির অধিকারী। মানবতার মাপকাঠিতে আরজ আলী মাতুব্বর মানবকল্যাণে নিজ দেহ ও চক্ষুদানসহ, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর রচনার জন্য তিনি মানব সমাজকে ঋণী করে গেছেন।

এ কথা সত্য যে, আরজ আলী মাতুব্বর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আগেও অনেক মানবতাবাদী বাঙলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। নবযুগের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন মানবতাবাদী। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরের লোকের সঙ্গে অবতরণ করে সাধারণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা ও ব্যথা-বেদনার সাথে নিজেদেরকে একাত্ম করার সুযোগ পাননি। যেমনটি পেয়েছিলেন আরজ আলী মাতুব্বর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করে বলেছেন:

> সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে
> মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ায় প্রাঙ্গণের ধারে;
> ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিলো না একেবারে।[৯০]

এ দুই দার্শনিক সমাজের প্রতিকূল অবস্থাতেও ব্যক্তিসত্তাকে নির্বাসিত করেননি। যথার্থ মানবতাবাদী তাঁরাই, যাঁরা ব্যক্তিস্বাধীনতায় স্বীকৃতি এবং ব্যক্তিসত্তার প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের মূল্যায়ন করেন। আত্মমর্যাদাজ্ঞানকে তাঁরা বিন্দুমাত্রও ক্ষুদ্র হতে দেননি। এ দার্শনিকদ্বয়ের মানবতাবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো যুক্তিবাদ। তাঁরা মানুষের মনে এমন এক স্বচ্ছ যৌক্তিক চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন যে চিন্তা শক্তি হবে সহজ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন। যার ফলে মানুষ নিজে কুসংস্কারমুক্ত হওয়ার পথ খুঁজে পাবে, বেরিয়ে আসতে পারবে অন্ধকারের বলয় থেকে, আলোকিত হবে সমাজ।

সমাজের নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মানসিকতা নিয়ে বিংশ শতকে যদি আরো কিছু বাঙালি মানবতাবাদী জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে বাঙলায় নবজাগরণের ইতিহাস, নিঃসন্দেহে অন্য এক নবতর স্রোতধারায় প্রবাহিত হতো। মানবিক করুণায় আপ্লুত হয়ে এ দুই দার্শনিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। তাঁদের মনে জেগেছিল সংশয়, ঈশ্বরের করুণার

Dhaka University Institutional Repository

ওপর সংশয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়। বলা বাহুল্য, যুক্তিবাদী মনই তাদেরকে আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলে। এদিক থেকে বিচার করলে উভয় দার্শনিক একই সঙ্গে যুক্তিবাদী এবং বাস্তববাদী; তাঁদের কাছে সামাজিক বৈষম্যতা অত্যন্ত অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে। তাঁরা স্পষ্টতই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সামাজিক বৈষম্যের কারণে একটি সমাজ পঙ্গু ও অকর্মণ্য হয়ে যায়। আর সমাজের অস্বাভাবিক উঁচু নিচুর কারণেই এ বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। মানুষকে কতখানি ভালোবাসতে পারলে সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল অতিক্রম করা যায় তা তাঁদের দর্শনে সহজেই প্রতীয়মান।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

১. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আয়জ আলী মাতুব্বর, রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ৯৩

২. ঐ পৃ. ২১২

৩. ঐ পৃ. ২০৪

৪. বাঙালি সমাজ চিন্তাবিদ।

৫. ফুলরেণু গুহ, *বাঙালীর সমাজ চিন্তা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১৫

৬. মো.মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩২২

৭. দৃষ্টবাদ আগস্ট কোঁতে(August Comte) প্রবর্তিত দর্শন বিশেষ। এ দর্শনে তিনি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ বিষয়সমূহকে স্বীকৃতি দান করেছেন এবং সর্ব প্রকার অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সত্তাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর উক্তি "প্রেম আমাদের মূলতত্ত্ব, শৃঙ্খলা আমাদের ভিত্তি এবং উন্নতি আমাদের লক্ষ্য"। তাঁর মতে বিশ্বমানবই একমাত্র উপাস্য দেবতা। উদ্ধৃতি : সাইয়েদ আব্দুল হাই, *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬ পৃ. ৭৪৮

৮. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আয়জ আলী মাতুব্বর, রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২৫৬

৯. ঐ প, ২৫০

১০. রামমোহন রায়ের উদারপন্থী ভাবাদর্শে পুষ্ট হয় Young Bengal নামে একটি প্রগতিশীল গোষ্ঠী কলকাতায় আবির্ভূত হয়। "বাঙালির ঐহিক জীবন চর্চা ও স্বাধীন মনন সাধনায় এ গোষ্ঠীর অবদান ছিল অপরিসীম। প্রধানত হিন্দু কলেজ তথা প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এই দলটি। এ দলের দীক্ষাগুরু ছিলেন প্রতীচ্য রাষ্ট্র দর্শনে উদ্বুদ্ধ এবং যুক্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তার অনুসারী হিসাবে পরিচিত কলকাতা হিন্দু কলেজের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অধ্যাপক হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো (১৮০৯-৩১)। "ইউরোপীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও এদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিলো অকৃত্রিম। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি এডাম স্মিথ, লক, হিউম, বার্কলি, বেন্থাম, মিল প্রমুখ আধুনিক দার্শনিকের মতের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্রে এবং প্রধানত মুগ্ধ হয়েছিলেন রুশোর ধ্যান ধারণা দ্বারা"।

১১. ইন্দ্র মিত্র, করুণা সাগর বিদ্যাসাগর, ব্যালান্টাইনের রিপোর্টের উত্তরে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য, (১৮৫৩, ৭ সেপ্টেম্বর) পৃ. ৭৩০ উদ্ধৃতি : প্রদীপ রায়, 'ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন দর্শন', শরীফ হারুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে দর্শন : ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী- ১৯৯১, পৃ. ২০১

১২. প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, মিল তাঁর *System of logic* গ্রন্থের মূল্যবান চিন্তা ভাবনায় বিশেষ নীতিবিদ্যা বিষয়ক যুক্তিবিন্যাস ও প্রকরণ পদ্ধতির সমৃদ্ধির সাধনে আগষ্ট কোঁতের "Positivist Philosophy" ব্যবহার করেছেন বলে কোঁতের নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন।

১৩. প্রদীপ রায়, *বিদ্যাসাগর: সামাজিক ব্যক্তিত্ব*, বুক ট্রাষ্ট কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১৩৮

১৪. স্যাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত

১৫. আমিনুল ইসলাম: *বাংলাদেশে দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ৪৪

১৬. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আয়জ আলী মাতুব্বর, রচনা-১*, পৃ. ৫২-৫৩

১৭. জেরেমী বেনথাম, জন স্টুয়ার্ট মিল ও হেনরি সিজউইকের দ্বারা প্রবর্তিত নৈতিকতার মানদন্ড সম্পর্কিত মতবাদ।

১৮. মোঃ মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৯

১৯. আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশে দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ৪৪

২০. Eric Stokos. *The English Utilitarianism*. Clarenda Press. Oxford. 1969. পৃ. ৫৫

২১. আইয়ুব হোসেন, *আয়জ আলী মাতুব্বর*, পৃ. ৫৪-৫৫

২২. ঐ, পৃ-৫৫

২৩. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ*, তৃতীয় খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ.২৬০

২৪. অমল কুমার রায়, *বিদ্যাসাগর ও পরমহংস*, দাতালা পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৩৬৪

২৫. আনু মুহাম্মদ, 'প্রশ্নের শক্তি: আয়জ আলী মাতুব্বর', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

২৬. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আয়জ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৬৯-৭০

২৭. ঐ, পৃ. ৬৯

২৮. ঐ, পৃ. ৬৯

২৯. শামসুর রাহমান, 'অন্ধকারে এক অসামান্য আলোকগুম্ভ', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ.১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

৩০. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আয়জ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ১৫০

৩১. বেগম রোকেয়া , '**স্ত্রী জাতির অবনতি**', আব্দুল কাদির (সম্পাদিত) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (প্রনীত), *রোকেয়া রচনাবলী*, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০, *পরিত্যক্ত অনুচ্ছেদ, ভূমিকা*

৩২. ঐ

৩৩. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ১৪৮-১৪৯

৩৪. মোঃ মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

৩৫. ফজলুদ্দীন উমর, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, চিরায়ত, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ.৩৮১

৩৬. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাঙলা সমাজ-চিত্র*, প্রথম খণ্ড, প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৮৮৬, পৃ. ৩৮০-৮১

৩৭. ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর গবেষকদের মধ্যে একজন অন্যতম গবেষক ।

৩৮. গোপাল হায়দার, *প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর*, অরুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯১১, পৃ. ৯৬

৩৯. প্রদীপ রায়, *বিদ্যাসাগর: সামাজিক ব্যক্তিত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৪০. সরদার ফজলুল করিম, 'আরজ আলী মাতুব্বর: আমাদের সক্রেটিস:, মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৪১. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আয়জ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ১৯০

৪২. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২৫০

৪৩. ঐ, পৃ. ২৫২

৪৪. ঐ, পৃ. ২৩২

৪৫. ঐ পৃ. ২৪৩

৪৬. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ১৩৬

৪৭. ঐ, পৃ. ৫১

৪৮. ঐ, পৃ. ৫২

৪৯. ঐ, পৃ. ৫১

৫০. শামসুল আলম সাঈদ, 'ওমর খৈয়াম ও আরজ আলী মাতুব্বর', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

৫১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন জিজ্ঞাসা', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৫২. কাজী নূরুল ইসলাম, 'আরজ আলী মাতুব্বর: জীবন দর্শন', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-৩৪

৫৩. মুহাম্মদ শামসুল হক, 'আরজমানস', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬

৫৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'আয়জ আলী মাতুব্বরের জীবন জিজ্ঞাসা', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৫৫. রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করে মহৎ কাজের যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর সেই বিধবাদের বিবাহের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে রামমোহনের অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করেছেন ।

৫৬. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত) *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ.১৪৭

৫৭. Abijit Dutta, *Nineteenth Century Bengal Society and the Christian Missonaries*, Minerva, Calcutta, 1992, পৃ. ১২২-২৩

৫৮. ঐ, পৃ. ১২৭

৫৯. অমিয় কুমার সামন্ত, *বিদ্যাসাগর*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ-৪৮

৬০. গোপাল হায়দার (সম্পাদিত), *বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র*, ২য় খণ্ড, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, পৃ. ১৭১

৬১. ১৮৪৯ সালে ভাইসরয়ের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য এবং এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি । তিনি ২১জন বালিকা নিয়ে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন; এবং মিশনারিদের স্কুলগুলির অবস্থা দেখে সচেতনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, এই বিদ্যালয়ে কোন ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে না কিংবা হিন্দুদের ধর্ম নিয়ে কোন মন্তব্য করা হবে না । অমিয় কুমার সামন্ত, *বিদ্যাসাগর*, পৃ. ৫৪

৬২. বিনয় ঘোষ : *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পৃ. ১২-২১

৬৩. সরকারি অনুদান পাওয়া যাবে এই আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মে পর্যন্ত এই কয় মাসে বিদ্যাসাগর বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় ৪০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । এই বিদ্যালয়গুলোর মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৩৭০ জন । এই স্কুলগুলি স্থাপিত হয়েছিল মফস্বল শহরেও নয় – একেবারে গ্রামে । বেথুন স্কুলের মতই পাঠ্যসূচী ছিল, কেবল সূচিশিল্প পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না । স্কুলগুলির যথেষ্ট জনপ্রিয়তা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল, তা ছাত্রীসংখ্যা থেকেই বুঝতে পারা যায়। গ্রামের পরিচিত পরিবেশে ও মানুষজনদের মধ্যে মেয়েদের অক্ষর প্রশ্নটি তেমন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। গ্রামে পারস্পরিক মেলামেশার একটি আবহ থাকার জন্য জাত-অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি প্রশ্নে একটি সর্বজনস্বীকৃত ব্যবস্থা গ্রাম্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ছাত্রী সংখ্যার বিচারে গ্রামাঞ্চলে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কম ছিল না।

৬৪. চণ্ডিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর*, ষ্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১৫৯-১৬০

৬৫. গোপাল হায়দার (সম্পাদিত), *বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র*, পৃ. ২১

৬৬. মন্বত্রি বিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।

যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী।।

পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষ গৌতমৌ।

শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ।।

মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত) ,: *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা বা যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি* (মূল ও বঙ্গানুবাদ)

সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার,কলিকাতা,১৩৯৮ , দ্বাজ্ঞ ১.৪-৫

৬৭. নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণং পতিরন্যো বিধীয়তে।

(পরাশর সংহিতা ৪র্থ অধ্যায়।)

৬৮. উল্লেখ্য যে, বিদ্যাসাগরের জীবনীকারদের পরিবেশিত তথ্য থেকে জানা যায় বিদ্যাসাগর দিবারাত্র স্মৃতিশাস্ত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বিধবাদের বিবাহের পক্ষে পরাশরের এই শ্লোক তিনটি আবিষ্কার করেন। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে এ শ্লোক তিনটির মধ্যে প্রথমটির গুরুত্ব অপরিসীম। হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত এরূপ জনশ্রুতির সঙ্গে তৎকালীন সংস্কার আন্দোলনের অনেকেই পরিচিত ছিল। এমনকি বিদ্যাসাগর আবিস্কৃত রচনার সংগেও তাঁরা মোটামুটি পরিচিত ছিলেন। তবে এ রচনাটির গ্রহণযোগ্য সঠিক অর্থ তাঁদের অজ্ঞাত ছিল। যে কারণে বিধবার পুনর্বিবাহের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের এই আবিষ্কার সেই বাধা কে অগ্রাহ্য করতে সংস্কারবাদীদের সাহস জুগিয়েছিল। মূলত এ শ্লোকটি বিদ্যাসাগর কর্তৃক আবিস্কৃত হওয়ার পর থেকে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের বিরোধী চিন্তাবিদরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাই এ শ্লোকের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬৯. গোপাল হায়দার সম্পাদিত, *বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র*, পৃ. ২২

৭০. অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।

অন্যেকলিযুগে নৃ নাং যুগহ্রাসানুরূপতে ।

(মনুসংহিতা, ১:৮৫)

৭১. কৃতে তু মানবাধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।

দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ ।

(পরাশর সংহিতা।)

৭২. প্রদীপ রায়, *বিদ্যাসাগরঃ সামাজিক ব্যক্তিত্ব*, পৃ. ৮৭

৭৩. ধর্মজিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিন্।

দ্বিতীয়ন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ।

(মহাভারত, অনুশাসন পর্ব)

৭৪. হোসনে আরা কামাল, বেগম রোকেয়া ও আরজ আলী মাতুব্বর মত ও পথ-একটি পর্যালোচনা, মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

৭৫. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ১৫৯

৭৬. ঐ, পৃ. ১৩৫

৭৭. সেলিনা হোসেন, 'সময়ের অগ্রগামী মানুষ' মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ১১২

৭৮. অমিয় কুমার সামন্ত, *বিদ্যাসাগর*, পৃ. ৮২

৭৯. প্রদীপ রায়, *বিদ্যাসাগরঃ সামাজিক ব্যক্তিত্ব*, পৃ. ১৪৫

৮০. প্রদীপ রায়, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন দর্শন', শরীফ হারুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে দর্শনঃ ঐতিহ্য প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২০১

৮১. ঐ, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

৮২. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র*-১, পৃ. ৫২

৮৩. ঐ, পৃ. ৫২

৮৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র দ্বাবিংশ বর্ষীয় শ্রী নারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা ঘানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চতুর্দশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করতে মনস্থির করেন। বিদ্যাসাগরের অনুজ শ্রী শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, নারায়ণ যা'তে এই বিধবা বিবাহ না করে সেজন্য অগ্রজকে চিঠি লেখেন। এর উত্তরে বিদ্যাসাগর ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১১ আগষ্ট অনুজ শম্ভু চন্দ্র বিদ্যারত্নকে এই চিঠি লেখেন।

৮৫. মোঃ মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৮

৮৬. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র*-১, পৃ. ১৯০

৮৭. আমিনুল ইসলাম, 'আরজ আলী মাতুব্বর' মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত) প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৮৮. Hiranmoy Benerjee, *Iswarchandra Vidyasagar,* Sahitya Academy, New Delhi. 1971, পৃ. ৭৮

৮৯. মাইকেল বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে বলেছেন, 'এমন একজনের কাছেআমি আজ আবেদন জানাচ্ছি যাঁর জ্ঞান আর মনীষা প্রাচীনকালের ঋষির মতো, উৎসাহ উদ্দীপনা ইংরেজদের মতো, আর হৃদয়টি বাঙালি মায়ের মতো'

৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐকতান।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আরজ আলী মাতুব্বর ও গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মানবতাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর ও গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মানবতাবাদ

দর্শন মুক্তবুদ্ধির আলোকে অনুভব, বিশ্বাস ও ধারণাকে বিশ্লেষণ করার কথা বলে। দার্শনিক চিন্তা চেতনার গতি ধাবিত হয় নৈতিক ও পারমার্থিক জ্ঞানের দিকে এবং সর্বোপরি তা'রূপ নেয় মানব কল্যাণের মহান লক্ষ্যে। দার্শনিকরা মানুষের জীবনের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি নিয়ে ভাবেন। জীবনকে দর্শন থেকে বাদ দেয়া যায় না, এক কথায় সার্থক দর্শনের অপর নাম জীবনদর্শন। সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই জীবনমুখী অর্থ ও ব্যঞ্জনার নিরিখেই বিচার করতে হবে আরজ আলী মাতুব্বর ও গোবিন্দ চন্দ্র দেব (১৯০৭ খ্রি.-১৯৭১ খ্রি.) এর মানবতাবাদকে।

আরজ আলী মাতুব্বর ও গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী ও মুক্তমনের দার্শনিক। এ দুই জ্ঞানতাপস ছিলেন জীবন সংগ্রামের সৈনিক এবং সেই সঙ্গে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা এবং তার সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দেশক। অর্থাৎ উভয়ের লক্ষ্য জীবনদর্শন। জীবনদর্শন জীবন সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ জীবনদর্শন হল সেই জিজ্ঞাসা যেখানে আমরা আদর্শ বা সত্যিকার মানবজীবন সম্পর্কে কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর খুঁজি।[১] এই দুই দার্শনিকের দর্শনে জীবনদর্শন বলতে সেই দর্শনই বুঝায়।

আরজ আলী মাতুব্বর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না করেই নিজের চেষ্টার অর্জন করেছিলেন প্রগাঢ় জ্ঞান। প্রচলিত বিশ্বাস, মূল্যবোধকে তিনি আঘাত করেছেন, চলমান পথকে প্রায়ই প্রত্যাখ্যান করেছেন, সত্য উদঘাটনের অজস্র প্রশ্ন মেলে ধরেছেন। নিজে সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে অজস্র বই পড়েছেন, শাণিত করেছেন নিজের জ্ঞান ও যুক্তিকে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও অলৌকিতার বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে সত্যকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট থেকেছেন। কৈশোর জীবনে মায়ের মৃত্যুর ঘটনা আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনে সত্যানুসন্ধানের চেতনার উন্মেষ ঘটায়। মায়ের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি খাজনার দায়ে জমিদাররা দখল করে নিলে, শৈশব থেকেই মাকে নিয়ে তাঁর জীবন সংগ্রামের সূচনা হয়। একমাত্র সুহৃদ বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন স্নেহময়ী জননীকে। চরম দুঃখ-দৈন্য ও দুর্দশার মধ্যেও মা তাঁকে স্নেহ-মমতা দিয়ে আগলে রেখেছেন। এমনি এক স্নেহময়ী মায়ের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ছবি তোলাকে কেন্দ্র করে গ্রামের লোকে মৃত মায়ের লাশ দাফন না করে চলে যাওয়াতে তাঁর মনে প্রশ্নের উদয় হয়। অপরাধ যদি হয়ে থাকে তবে তার শাস্তি (আরজ আলীর) পাবার কথা; এ কৃতকর্মের দায় সম্পূর্ণ আরজ আলীর। এই একটি মাত্র ঘটনাই (আরজ

Dhaka University Institutional Repository

আলীর) জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই ঘটনার জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে মানুষের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে দায়ী করেন। আইয়ুব হোসেনের ভাষায় :

> মার মৃত্যু পরবর্তী ঘটনা আরজ আলী মাতুব্বরের মননে প্রবল নাড়া দেয়। সজোরে ঘা দেয় চৈতন্যে। এই ঘটনার পরই তিনি স্থির সংকল্প হন সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার গোঁড়ামি দূর করতে আজীবন লড়াই করে যাবেন। না, সে লড়াই হাতিয়ার নিয়ে নয়। বিবেক, বুদ্ধি দিয়ে যুক্তির তোড়ে অন্ধ আবেগকে আঁধারের কালিমাকে ম্লান করে সত্যের আলোয় উদ্ভাসন ঘটাবেন। বিভিন্নমুখী প্রচুর পড়াশুনা ও সে সাথে লেখনী হাতে নিলেন। রচনা করলেন বেশ কিছু প্রশ্ন সম্বলিত প্রথম পাণ্ডুলিপি 'সত্যের সন্ধান'। এটি নিয়ে কোর্ট কাচারি হয়ে শেষ পর্যন্ত কোর্টের রায় মেনে নিয়ে প্রায় দেড় দশক কাল নিষ্ক্রিয় থাকতে হয় তাকে। পড়াশুনা, তথ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুতি নিতে থাকেন এ সময়। দেশ স্বাধীন হবার পর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবার পর পুনরায় লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। এবার একটানা লিখেই যেতে থাকেন। আমৃত্যু এই অন্যতম সাধনায় নিয়োজিত থেকে বেশ কখানা পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন। দর্শন, প্রধানত ধর্ম দর্শন সম্পর্কেই অধিকাংশ রচনা বেশিরভাগ পাণ্ডুলিপি[২]।

আরজ আলী মাতুব্বর অনুভব করেন, যুগ যুগ ধরে মানুষের অন্ধবিশ্বাসের কাছে কোনো যুক্তি স্থান পায় না, পরাজিত হয় মানুষের মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, আন্তরিক ইচ্ছাবোধ; উপেক্ষিত হয় ব্যক্তি চাহিদা। এ ঘটনা থেকে আরজ আলী মাতুব্বরের বোধের যে উন্মেষ ঘটে তা ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে। জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করার প্রত্যয় নেন মানুষকে যুক্তিবাদী হিসেবে গড়ে তোলার। সে লক্ষ্যে তিনি গ্রামে একটি লাইব্রেরিও স্থাপন করেছিলেন। ধর্মের সাথে যুক্ত উদ্ভট ও অলৌকিক কাহিনীগুলোকে উপড়ে ফেলতে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি।

গোবিন্দ চন্দ্র দেব সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার লাউতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের পারিবারিক উপাধি 'পুরকায়স্থ' মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে দেবের বড় ভাই বীরেন্দ্র চন্দ্র পুরকায়স্থ লিখেছেন:

> Though I have retained the surname of "Purkayastha", my other brothers, including Dr. Gobinda Chandra Dev, have dropped it altogether.[৩]

গোবিন্দচন্দ্র দেবের পরিবারে পারিবারিক উপাধি 'পুরকায়স্থ' কালক্রমে বর্জন করেন। তাঁর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পুরকায়স্থ অত্যন্ত সহজ সরল লোক – ইস্টার্ন বেঙ্গল ও আসাম রেলওয়ের জুরী থেকে লাভ

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত মাটি ভরাটের কাজ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হন। তাঁর সাব কন্ট্রাক্টারগণ তাকে ঠকাতে থাকলে, চুক্তি অনুযায়ী কাজ না হওয়ায় রেল কোম্পানিকে প্রায় তৎকালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। জায়গা জমি, সহায় সম্পত্তি সব বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করতে হয়। ফলে ঈশ্বরচন্দ্র দেবের বসতবাড়ি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ব্যবসায় লেউলিয়া ও সর্বস্বান্ত হওয়ার পর ঈশ্বর চন্দ্র দেবের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পরে এবং ১৯২৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় গোবিন্দ চন্দ্র দেবের বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। ফলে সংসারের দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর উপর। এই সময়ই থেকে আর্থিক কষ্টের মধ্যে দেবের জীবন অতিবাহিত হয়। উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ মিশন নামক সেবা সংস্থার মাধ্যমে তিনি কলকাতায় লেখাপড়া শেখেন এবং কালক্রমে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা ও মানবতার আদর্শ তাঁর পরবর্তী জীবনের কর্মপ্রেরণা ও দর্শনের মূল উৎস হয়ে উঠেছিল।[৪]

এমনিভাবে দেখা যায় গোবিন্দচন্দ্র দেবের জীবনদর্শন ও সৃষ্টি হয়েছে তাঁর সমকালীন ঐতিহাসিক, সামাজিক ও দার্শনিক নিয়মের আলোকে। আরজ আলী মাতুব্বরের দার্শনিক মত গঠনে যেমনি তাঁর মায়ের মৃত্যুর ঘটণা উল্লেখযোগ্য ছিল তেমিন গোবিন্দ চন্দ্র দেবের দার্শনিক মত গঠনে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্ত ার করেছে তাঁর ছোটবেলায় প্রচলিত আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদ নামক দু'টি পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা। বাবার অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও মৃত্যুর কারণে শৈশবেই তিনি অসহায় ও আশ্রয়হীন হয়ে মিশনারিদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। মিশনারিদের সংস্পর্শে এসেই তিনি তাঁদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন আধ্যাত্মিক ও মানবতাবাদী দর্শনের প্রথম শিক্ষা। মিশনারিরাই তাঁর মনে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও ধর্ম বিশ্বাসের বীজ বপন করেছিলেন। পারিবারিক বিপর্যয়ের ফলে তাঁর মনে যে শূন্যতা ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল, মিশনারিদের সংস্পর্শে এসে তা অনেকটা লাঘব হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি মিশনারিদের কাছ থেকে বিদায় নেন এবং প্রবেশ করেন সংশয়বাদ ও স্বার্থবুদ্ধির কর্মজগতে। কিন্তু তবু মিশনারিদের কাছ থেকে পাওয়া আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ তিনি লালন করেছেন দার্শনিক মতবাদের এক গুরুত্বপুর্ণ উপাদান হিসেবে।[৫]

একই সঙ্গে সামাজিক কারণে দেবের জীবনে আর একটি ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল – সেটা হলো বস্তুবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। এভাবে দেখা যায় গোবিন্দ দেবের আধ্যাত্মবাদের বিশ্বাস ছিল – মিশনারিদের উপহার আর বস্তুবাদে বিশ্বাস ছিল তাঁর দুঃসাহসিক, বিপর্যস্ত পিতার অবদান। তিনি বলেন, সম্পদ থেকে দারিদ্র্যে, সুখ থেকে দুঃখে তাঁর বাবা যদি এভাবে হঠাৎ নিপতিত না হতেন তাহলে হয়তো মানুষের জীবনে বস্তুসম্পদ যে কতটা গুরুত্বপুর্ণ তা তিনি কোনো দিনই উপলব্ধি করতে পারতেন না। বাল্য-যৌবনের এ দুই বিরোধী অভিজ্ঞতা অপরিমেয় প্রভাব বিস্ত ার করেছে তাঁর পরবর্তী জীবনে। উভয়কেই তিনি তাঁর জীবন সংগ্রামে পেয়েছেন সমান ফলপ্রসূ হিসেবে। বিপদে

Dhaka University Institutional Repository

আপদে তিনি সাহায্য পেয়েছেন অবিচল আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের মাধ্যমে আর বস্তুবাদী অভিজ্ঞতা তাঁকে একান্তভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে একাত্ম হতে শোষিত-বঞ্চিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে। এ কারণে তিনি আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বকে অলীক মনে করতেন।[৬]

গোবিন্দ চন্দ্র দেবের জীবনদর্শন মূলত তত্ত্বান্বেষী নয়, কল্যাণান্বেষী। কল্যাণ বলতে তিনি মানুষের বিশেষত সাধারণ মানুষের সুখকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, জীবনদর্শনের আসল কাজ হলো এ লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে সত্যিকার পথের ঠিকানা বলে দেওয়া এবং তাকে সর্বজনীন কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ করা। এ অর্থে তাঁর জীবনদর্শনকে একই অর্থে বলা যায় জীবনবাদী, প্রয়োগবাদী, সুখবাদী ও মানবতাবাদী। এ কথার সুস্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায় তাঁর ভাষায় এভাবে:

> মানবিক মূল্যগুলোর সত্যিকার প্রমান পাওয়া যায় জীবনের পুঁথির মধ্যে, কোন যুক্তিবিদ্যায় কেতাবে নয়।... সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল-চেতনার মৌলিক সমস্যাটাকে সংক্ষেপে এই ভাবে ব্যক্ত করা যায়: জন বাচতে চায় এবং সুখী লোকের মত বাচতে চায় এবং তার প্রতিবেশি টম-ও তাই করতে চায়। কিন্তু কখনও কখনও একত্রে বাস করা তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে। সঠিকভাবে দেখতে ও বুঝতে গেলে, মূল্য সম্পর্কিত দর্শন এই বাঁচার যথোপযুক্ত উত্তর বের করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। জীবনের প্রতি আমাদের যে সহজাত অনুরাগ এবং তাকে ধারণার যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের যে সীমাহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আমার ধারণায় এ দর্শন তারই এক অপরিহার্য পরিশিষ্ট। বাকি সমস্ত তাই তত্ত্বীয় দর্শন; জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, এবং মূল- চেতনার অন্তঃসারের মধ্যেও তা পড়েনা।[৭]

মানবকল্যাণ তথা সার্থক জীবনদর্শনের এ চিন্তা ধারায় গোবিন্দচন্দ্র দেব আশ্চর্যজনকভাবে সরে গিয়েছিলেন উপমহাদেশীয় চিন্তাধারার প্রবাহ থেকে। ধর্ম ও দার্শনিক ঐতিহ্যের দিক থেকে সমশ্রেণীভুক্ত হয়েও যেক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষ লিখেছিলেন *The Religion of Man,* সেক্ষেত্রে তিনি লিখেছেন *Aspiriations of the Common Man.*[৮] এ গ্রন্থেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সাধারণ মানুষেরই দলে – যেসব স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা তাঁকে জীবন সংগ্রামে টিকিয়ে রেখেছে সেগুলো তাদেরকে কেন্দ্র করেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক তাগিদের পাশাপাশি জৈবিক তাগিদে তিনি কখনো অখুশি হননি। বরং এমন এক জীবনদর্শনের সন্ধান করেন যে দর্শন এই উভয় রকম প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। যে সমাজ প্রতিষ্ঠা তাঁর দর্শনের লক্ষ্য হল এমন এক সুসমৃদ্ধ সমাজ যার স্বীকৃত লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের জড় ও আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটানো।[৯] তিনি সাধারণ মানুষের উন্নতির লক্ষ্যে বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

> Under-developed countries with their starving millions, who do not know what two square meals exactly mean, tell a different story. It will be very sound and legitimate perhaps to concede as a general principle that for his harmonious growth, the common man needs dollars as well as faith.[১০]

এভাবে তিনি সাধারণ মানুষের উন্নতির লক্ষ্যে ডলারের পাশাপাশি বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং সেজন্য তিনি মন্তব্য করেন এভাবে:

> In a healthy compromise and a happy synthesis lies the key to man's durable progress and harmonious growth. Let us not yield to extremism and repent.[১১]

অর্থাৎ স্থায়ী প্রগতি ও সুসামঞ্জস্য সংবৃদ্ধির চাবিকাঠি হলো কল্যাণময় আপোসরফা এবং মনোজ্ঞ সমন্বয়সাধন। মানুষ কোনো ভাবেই যেন কোনো চরমপন্থার কাছে আত্মসমর্পণ না করা। গোবিন্দ চন্দ্র দেবের দর্শন তাত্ত্বিক দিক থেকে সমন্বয়ীবাদী। তাত্ত্বিক দিক থেকে তিনি সমন্বয় ঘটিয়েছেন অভিজ্ঞতাবাদ, যুক্তিবাদ ও স্বজ্ঞাবাদের, জড়বাদ এবং ভাববাদের-সসীম আত্মার অস্তি ত্ব ও অসীম পরমাত্মার –ধর্ম, কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শনের। তেমনি জীবনদর্শনেও তিনি সমন্বয় ঘটিয়েছেন সাধারণ মানুষের জৈবিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের, ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মোক্ষানুসন্ধানের। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'মধ্য পথ'।[১২] *আমার জীবন দর্শন* গ্রন্থে তিনি বলেন :

> একদিকে আধুনিক উগ্র জড়বাদ আর অন্যদিকে পুরানো আধ্যাত্মবাদ। ... প্রথমটির আশ্রয় নিলে সব কিছু আধ্যাত্মিকতাকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়ার কামড়া-কামড়ি নিয়েই মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আর দ্বিতীয়টির আশ্রয় নিলে আধ্যাত্মিকতার নামে বহুলোক ইহলোকের সুখ-ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এই দুই পথের কোন পথেই মানুষের তৃষ্ণা মিটতে পারে না। তাই যাঁরা জানুক, তাঁরা খেয়ে নেন মধ্যপথ ও এই মধ্য পথেই পান সত্যের সন্ধান। এই মধ্যপথই আমার জীবন-দর্শনের মধ্যমণি।[১৩]

গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মতে, সমন্বয়ী পথের মাধ্যমেই জীবনের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। রাসেল যেমন বলেছেন: The good life is one inspired by love and guided by knowledge.[১৪] তেমনি দেব ও মনে করতেন, জ্ঞানের সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই সম্ভব স্থায়ী কল্যাণ। জ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

আসবে বিজ্ঞান থেকে, আর প্রেমের প্রেরণা আসবে সমন্বয়ধর্মী এবং সংস্কার ও সংকীর্ণতামুক্ত বিশ্ব-দর্শন থেকে। এ সম্পর্কে ড. সেব উল্লেখ করেন:

> Modern man needs both knowledge and love, more particularly scientific knowledge and spiritual love. Perhaps he needs the latter more. The synthesis of knowledge and love should be the nucleus of the new morality; he needs for his own peace and prosperity and also for the survival of his species.[১৫]

অর্থাৎ আধুনিক মানুষের জন্য জ্ঞান ও প্রেম উভয়েরই প্রয়োজন, বিশেষত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক প্রেমের মধ্যে দ্বিতীয়টার প্রয়োজন বেশি। তাঁর নিজের শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং স্বজাতির টিকে থাকার জন্য যে নৈতিক ব্যবস্থা তারও প্রয়োজন আছে। জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয় হবে তার কেন্দ্রবিন্দু।

একদিকে যেমন তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তথাকথিত আভিজাত্যের বিরোধী ছিলেন অপরদিকে তেমনি ধর্মীয় গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধেও ছিলেন। মার্কসবাদের মতো সনাতন ধর্মকে তিনি বর্জন করেননি, কিন্তু ধর্মের নামে বিদ্বেষ বা অনৈক্যের মন্ত্র ছড়ানোও পছন্দ করেননি। মূলত ধর্মকে তিনি মনে করেছেন "মানব কল্যাণের প্রেরণা"[১৬] হিসাবে এবং মানুষের ভেতরে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনকেই তিনি ধর্মের মূল উদ্দেশ্য বলে উলেখ করেছেন।[১৭] তাঁর মতে :

> The more we concentrate on the essence of religion, the universal spirit behind it will loom large before our vision and the physical differences of religion will either disappear or dwindle into insignificance. To say the least, it will not then be a barrier for unity, amity, understanding and cohesive growth.[১৮]

অর্থাৎ, ধর্মের সারবস্তুর দিকে অবলোকন করলে তার অন্তর্বর্তী সর্বজনীনতা আমাদের কাছে স্পষ্টতর হবে। এবং ধর্মের অবয়বগত বিভিন্নতা বিলীন হয়ে যাবে অথবা তা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়বে। ফলে ঐক্য, মৈত্রী, সমঝোতা ও সুসংহত শ্রীবৃদ্ধির পথে থাকবে না কোনো অন্তরায়। গোবিন্দ চন্দ্র সেবের

Dhaka University Institutional Repository

মতো আরজ আলী মাতুব্বরও ধর্মের অবয়বগত বিভিন্নতাকে তাৎপর্যহীন মনে করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বর মূলত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর ভাষায় :

> ধর্ম জগতের এমন কতকগুলো বিধি-নিষেধ, আচার-অনুষ্ঠান ও ঘটনাবলির বিবরণ পাওয়া যায় যাহার যুক্তিযুক্ত কোন ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য নহে। তাই সততই মনে কতকগুলি প্রশ্ন উদয় হয় এবং সেই প্রশ্নগুলি সমাধানের অভাবে ধর্মের বিধি-বিধানের উপর লোকের সন্দেহ ও অন্ধবিশ্বাস জন্মে। ফলে ধর্মের বিধি-বিধানের উপর লোকের শৈথিল্য ঘটে। ধর্মযাজকদের অধিকাংশের নিকটই সেই সকল প্রশ্নাবলীর সদুত্তর পাওয়া যায় না। ... ধর্মের নাম করিয়া ধর্মবিরোধী কাজ করিতেও উহাদের বাধে না। পবিত্র কোরান যে বলিতেছে– "লা ইকরাহা ফিদ্দীন", অর্থাৎ ধর্মে জবরদস্তি নাই– সেদিকে উহারা ভ্রুক্ষেপ করে না। অধিকন্তু সরকারী আইন বাঁচাইয়া যতদূর ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়, তাহা করিতেও ত্রুটি করে না। উপরন্তু রাজশক্তিকে হস্ত গত করিয়া ধর্মের নামে অধর্মকে চালাইবার আকাশ-কুসুমও উহারা রচনা করিতেছে।[১৯]

আরজ আলী মাতুব্বর ধর্মে কোনো রকম গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় না দিয়ে কুসংস্কারমুক্ত ধর্মের কথা বলেছেন। তাই তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, তাঁর অভিযান শুধু অসত্য বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, – কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। প্রত্যেকটি ধর্ম হতে হবে মিথ্যার আবর্জনা বর্জিত ও পবিত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।[২০] আরজ আলী বলেন- "আগুন আবিষ্কার থেকে শুরু করে পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কার পর্যন্ত অন্য কোনো আবিষ্কারেই আঞ্চলিকতা নেই, কিন্তু ধর্ম ও রাষ্ট্র হচ্ছে আঞ্চলিকতায় ভরপুর।"[২১] একদিকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে ধর্ম, অন্যদিকে প্রকৃতপক্ষে সমাজ রাষ্ট্রের অভিব্যক্তিই হয়ে ওঠে ধর্ম। তাই সমাজ, রাষ্ট্র বাদ দিয়ে ধর্মের কোনো অস্তিত্ব নাই। ইতিহাসের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় মানুষের সমাজ জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের রূপও পরিবর্তিত হয়েছে। গোত্রজীবন থেকে মানুষ যখন রাষ্ট্রজীবনে প্রবেশ করছে তখন ধর্ম ও গোত্রীর পরিচয় থেকে রাষ্ট্রীয় বা বৈশ্বিক পরিচয়ে পরিচিত হয়েছে। যেসব জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রিক সামরিক অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়েছে তাদের ধর্মের প্রভাবও বেড়েছে তত বেশি। আবার মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের ঈশ্বরের জ্ঞান ও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্যই আগের ঈশ্বরের চেয়ে পরবর্তী ঈশ্বরের জ্ঞান অনেক পরিণত দেখা যায়। বহু ভাষা, বহু জাতি, বহু গোত্র যেভাবে বিলুপ্ত হয়েছে তেমনি অনেক ধর্ম, অনেক ঈশ্বর, অনেক দেবতা ও অনেক নবীও বিলুপ্ত হয়েছে। ধর্ম, রাষ্ট্র, বৃত্তি বা পেশা ইত্যাদি ভেদে অসংখ্য সমাজ রয়েছে এখন দেশে দেশে।[২২] এক ধর্ম আসলে কখনই এক ধর্ম নয়। প্রতিটি ধর্মের আছে বহু ধর্মের বাস যা নির্ধারিত হয় মূলত সমাজেরই ইচ্ছায় এবং সমাজের তাগিদে। মূলত বিভিন্ন ধর্মীয় উপলব্ধি, চর্চা ও ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে সমাজের মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যকার বৈষম্য। সমাজে মানুষের মধ্যকার বৈষম্য, ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থান, নিপীড়ক ও নিপীড়িত– এর সবেরই বহির্প্রকাশ দেখা যায় একই ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি, চর্চা ও ব্যাখ্যার মধ্যে। একই আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর কিংবা একই নবী, দেবতা বিভিন্নভাবে গৃহীত হয় বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানে। আবার কখনো হয়ে যায় সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনী আল্লাহ রসুলের নাম করে নারকীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অসংখ্য নারী-পুরুষ তাদের অত্যাচারে আর্তনাদ করেছে, জালেমদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে - সেই একই আল্লাহ-রসুলের নাম করে। পোপের যিশু বিশ্বব্যাপী যখন সাম্রাজ্যবাদী অগ্রাসন, দেশে দেশে স্বৈরশাসন, নিপীড়ন ও বৈষম্যকে মহিমান্বিত করে, তখন দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্রবিরোধী লড়াইয়ে যিশুকে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে স্থাপন করে মুক্তির ধর্মতত্ত্ব। এই বৈপরীত্য, এই লড়াই ধর্মের লড়াই ছিল না। এটি সমাজের ভেতরের শ্রেণীসমূহের বিভিন্ন বর্গসমূহের (লিঙ্গীয়, জাতিগত, বর্ণগত) সমাজের ভেতরকার ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির লড়াই।[২৩] ধর্ম হল এই বিভিন্ন অবস্থানগত বিভিন্ন ভাষা।

এভাবে আরজ আলী মাতুব্বর ও গোবিন্দ চন্দ্র দেব ধর্মের নামে সামাজিক কর্তৃত্ব ও মতাদর্শিক আধিপত্যকে কখনো মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। এ দুই দার্শনিক যেসব কথা বলেছেন, যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন মনে হলেও আসলে সেগুলি ছিলো সমাজ ক্ষমতা কর্তৃত্ব অধিপতি সংস্কৃতি নিয়েই প্রশ্ন। আরজ আলীর ভাষায় :

> সৎ ও অসৎ কাজের ব্যাপক ও পাকাপোক্ত ভাগাভাগি সুদৃঢ় হয় ধর্ম ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে। আদিম যুগের সেই পুরোহিততন্ত্রের আমল থেকে শুরু করে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে ধর্ম ও রাষ্ট্রের কঠিন শাসন।[২৪]

আরজ আলী মাতুব্বর আরো বলেন :

> মানবতার মাপকাঠিতে মানুষ একে অন্যের ভাই, ভালোবাসার পাত্র, দয়া-মায়ার যোগ্য, সুখ দুঃখের ভাগী, এক কথায় একান্তই আপন, কিন্তু ধর্মে বানাইল পর।[২৫]

তাইতো বোধকরি গোবিন্দ চন্দ্র দেব – আরজ আলী মাতুব্বরের এই উক্তি দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বরের মতো দেবের মানবতাবাদ শুধু মানুষের মহিমা প্রচার করার মতবাদ নয়। বরং তাঁর মতে, মানবাতাবাদ হলো মানবকল্যাণকে সেবার ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার প্রেরণা সংক্রান্ত মতবাদ। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

মানবতাকে সেবা করা। নিজের জীবনেও সেব এই আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। অপর দিকে আরজ আলী মাতুব্বরও মানবতার ঐক্যের কথা বলেন। তাঁর ভাষায় :

> আচার, অনুষ্ঠান, প্রার্থনা পদ্ধতি ইত্যাদি এমন কোনো বিষয় নেই যাতে সকল ধর্ম একমত পোষণ করে। ... মানবতাবর্জিত কোন ধর্ম পৃথিবীতে নেই। আর্তের সেবা, দুস্থের প্রতি দয়া, অহিংসা, পরোপকার ইত্যাদি সব ধর্মে শুধু স্বীকৃতই নয়, একান্ত পালনীয় বিধান। সুতরাং সব ধর্মের স্বীকৃত যে মতবাদ, অর্থাৎ মানবতাবাদই হওয়া উচিত মানুষের আন্তর্জাতিক ধর্ম বলাম মানবধর্ম।[২৬]

গোবিন্দ চন্দ্র সেব ও আরজ আলী মাতুব্বর উভয় দার্শনিকই মূলত উপলব্ধি করেন যে, যুগে যুগে মানুষের কল্যাণ আসে উন্নত জীবন ধারণের চিন্তা থেকে। আর সে জন্য প্রয়োজন হলো সমাজ জীবন থেকে দুঃখ, দৈন্য, শোষণ ও বঞ্চনা দূর করার প্রচেষ্টা – যা সম্ভব হবে কুসংস্কারহীন মুক্ত বুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে। গোবিন্দ চন্দ্র সেব ছিলেন সাধারণ মানুষের আপনজন। তাঁর মতে, আপামর জনসাধারণের উপেক্ষা করে কোন স্থায়ী সুষম এবং প্রগতিশীল সমাজ নির্মাণ সম্ভব নয়।[২৭] তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব, প্রেম ও ঐক্যের মধ্যেই ধর্মের ভূমিকাকে চিত্রিত করেছেন। তিনি মানুষের ভিতরে প্রেমের সমন্ধ স্থাপনকেই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[২৮]

এভাবে ঐক্য, প্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তিনি ধর্মের ভবিষ্যৎ ভূমিকা উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি তাঁর তেমন কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি ধর্মকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত হয়েও শুভ প্রভাবের দিক থেকে ধর্ম সজনীন বা অধিব্যক্তিক (Extra personal) এবং এ কারণেই সার্বিক কল্যাণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্মের একটা ভূমিকা থাকবে।

গোবিন্দ চন্দ্র সেবের চিন্তাধারায় দর্শন ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিকতা এবং বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও প্রেমের সমন্বয় ঘটিয়েছে। অধিকন্তু, তিনি দর্শনের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং বিজ্ঞানের জড় শক্তির আঁতাতের মাধ্যমে ও তাদের যৌথ প্রয়োগের দ্বারা সকল মানুষকে একত্র করে গড়তে চেয়েছিলেন একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ বিশ্বসমাজ; যে সমাজ বা রাষ্ট্রের মৌল উদ্দেশ্য হবে বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও উন্নতি। বুদ্ধ, যিশু ও মুহম্মদের মানবতাবাদী কল্যাণ ও ঐক্য দর্শনে প্রভাবিত ও অণুপ্রাণিত সেবের দর্শন একাত্মবাদী ও সমন্বয়ধর্মী। তিনি অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন ঐক্য ও একতার উপর। কামনা করেছে একটি বিশ্বরাষ্ট্রের তাই তিনি বলেছেন, For modern man the idea of unity has became a matter of breath, next in importance only God's oxygen.[২৯] অর্থাৎ আধুনিক মানুষের জন্য ঐক্যের ধারণা মানুষের জীবনী শক্তিস্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দ চন্দ্র দেব ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অনুসারী, রামকৃষ্ণকে তিনি সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির পথ নির্দেশ বলে মনে করেন। তিনি বুদ্ধকেও পৃথিবীর মানবতাবাদের অন্যতম প্রবক্তা বলে অভিহিত করেন। বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও তাঁরা দু'জনেই আন্তরিকভাবে মানবতাবাদী ছিলেন। তাঁরা উভয়েই মানবজাতিকে দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে মুক্ত করার কথা বলেছেন এবং মানবজাতিকে ভালোবাসার কথা বলেছেন। দেবের মতে:

> বুদ্ধ দৃঢ়ভাবে সমষ্টি কল্যাণের কথা প্রচার করেছিলেন যার মূল কথা উভয়ের মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি বস্তুবাদী এবং আধ্যাত্মবাদীগণ বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে মানবকল্যাণের জন্য আগ্রহী হন এবং যা তাদের হওয়া উচিত, তা' হলে বুদ্ধের মধ্যে তারা একটি মহৎ পরিচালককে দেখতে পাবেন।[৩০]

সমন্বয়ী কল্যাণ প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক উপায় হিসাবে গোবিন্দ চন্দ্র দেব সম্ভবত ভেতরে ভেতরে সমাজবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।[৩১] এবং রাষ্ট্রনৈতিক উপায় হিসেবে তিনি রাসেলের মতো আন্তর্জাতিকতার উপর জোর দিয়েছেন এবং এক বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের তাগিত দিয়েছেন। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবকে মানব-ইতিহাসের এক সন্ধিকাল বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন :

> ... no balanced economic stracture could possibly be conceived to-day without assuring a decent living standard for the common man.[৩২]

অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্য জীবনযাত্রার একটি উপযুক্ত ফল স্বীকার না করে আজ আর কোনো সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায় না। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে উল্লেখ করেন যে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ উত্তীর্ণ হয়ে মানুষকে প্রেম ও ঐক্যবোধের ভিত্তিতে এক বিশ্বরাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে, যেটা হবে বর্তমান রাষ্ট্র সংঘেরই এক উন্নততর রূপ। এই উদার ঐক্যবোধ জাগাতে না পারলে আকাশচুম্বী বৈজ্ঞানিক সভ্যতা থেকে মানুষের বিশেষ কোনো কল্যাণ হবে না, বরং বিজ্ঞানের কাছ থেকে মানুষ যেসব সাংঘাতিক মারণাস্ত্র পেয়েছে ও পাচ্ছে, তাদের চিন্তা-বিরহিত, বর্বর অপপ্রয়োগের ফলে এমন কি তার অস্তি ত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে।[৩৩]

গোবিন্দ চন্দ্র দেব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-গর্বিত তথাকথিত সুসভ্য মানুষকে সাতার না-জানা পণ্ডিতের সাথে তুলনা করেছেন এবং একই সঙ্গে তিনি এই আশা ও আকাংখা প্রকাশ করে বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

> আজকের দিনের মানুষের বিজ্ঞানের জ্ঞানভারে ভরা জীবন তরী একত্ববাদের অভাবে বিদ্বেষের কলঙ্কালিতে উদ্বেলিত অজ্ঞান-সমুদ্রে না চিরতরে ডুবে যায় এটাই সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কথা। তার বেঁচে থাকার তাগিদেই শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে মানুষ মর্ত্যলোকে অমৃতত্ত্বের আভাস পেয়ে শান্তি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে এ আশাই দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।[৩৪]

মানবতাবাদী চিন্তাধারায় বাংলাদেশের দর্শন চর্চায় গোবিন্দচন্দ্র দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। দেব ধর্ম, উদারতা, মানবতাবোধ ও সামাজিক ন্যায়ে বিশ্বাসী ছিলেন।[৩৫] তাঁর আজীবন সাধনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জীবন ও জগতের কল্যাণ নিহিত ত্যাগে ও প্রেমে।[৩৬] গোবিন্দ চন্দ্র দেব মানুষের মধ্যে যে বৈষম্য আছে, তা দূর করার কাজে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমন্বয়বাদী। তিনি ইউরোপ, ভারতবর্ষ এবং ইসলামি দেশগুলোর মানবতাবাদকে সমন্বিত করে নিজের মানবতাবাদকে গড়ে তোলেন। তিন ধরনের মানবতাবাদের তুলনা করা যায়, ইউরোপীয় মানবতাবাদ রেনেসাঁয় যার জন্ম, তা মানুষকে চিন্তার মুক্তি, অধিকার বোধ এবং গণতন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। ভারতীয় মানবতাবাদ মানুষের সঙ্গে ব্রহ্মের অভিন্নতা এবং সমস্ত প্রকৃতি ও প্রাণীর মধ্যে মানুষের সংগে ঐক্যের কথা বলেছে। ইসলামের মানবতাবাদে দেখা যায়, ঈশ্বর সমস্ত কিছুর স্রষ্টা হওয়ায়, সমস্ত জগতে একটি ঐক্য আছে। ইসলাম মানুষের সঙ্গে মানুষের ভ্রাতৃত্বের কথা বলে এবং এমন একটি রাষ্ট্র ও সমাজ গড়তে চায়, যেখানে পরম করুণাময় এবং শক্তিমান আল্লাহর নির্দেশে সকলের মধ্যে সাম্য বিরাজ করবে। গোবিন্দচন্দ্র দেব এই তিন ধরনের মানবতাবাদকে তাঁর চিন্তায় সমন্বিত করেছেন, যার উদ্দেশ্য হলো একই আকাশের নিচে সমস্ত মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা।[৩৭]

দেবের জীবনদর্শন ও জীবনদর্শন লাভের উপায় উভয়ই ছিল সমন্বয়ধর্মীয়। উভয় দিক থেকেই তিনি মধ্যপথ অবলম্বনের কথা বলেছেন। উদ্দেশ্যের দিক থেকে মধ্যপথ এসে মিশেছে মানুষের দেহ ও আত্মা, ইহকাল ও পরকাল এবং দৈনন্দিন জৈবিক প্রয়োজন ও আধ্যাত্মিকতা, আর উপায়ের দিক থেকে এসে মিশেছে বিজ্ঞান আর ধর্ম, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি-রাজনীতি আর আধ্যাত্মবাদী জীবন-দর্শন, বৈজ্ঞানিক উৎপাদন ব্যবস্থা আর প্রেম ভিত্তিক মানবতাবাদী সমাজ ব্যবস্থা।[৩৮] দেব বলেছেন, ... সারা জগতের অগণিত জনসাধারণের কল্যাণের অফুরন্ত প্রেরণা যোগানই আমার জীবনদর্শনের উদ্দেশ্য।[৩৯]

আরজ আলী মাতুব্বর অন্ধতা ও কুসংস্কার দূর করে মানুষের মনে উদ্বুদ্ধ করেছেন সত্য ও জ্ঞানের আলো। বিজ্ঞানীদৃষ্টি দিয়ে জগৎ ও জীবনের সবকিছু পর্যবেক্ষণ ও গ্রহণ করাই ছিল তাঁর জীবনার্থের মূল কথা। দেবের মতো আরজ আলীর দর্শনেরও উদ্দেশ্য জনসাধারণের কল্যাণার্থে কাজ করা। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন কুসংস্কারমুক্ত, বাস্ত ববাদী, বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীল দার্শনিক। তিনি লক্ষ করছেন সমাজকে কুসংস্কার এমনভাবে আচ্ছন্ন করে আছে যার ফলে সমাজের মুক্ত বুদ্ধির চর্চা ও প্রগতির ধারা প্রতি মুহূর্তে ব্যাহত হচ্ছে। তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও উগ্রজাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। আইয়ুব হোসেন মন্তব্য করেন:

> আরজ আলী মাতুব্বর ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মের লৌকিক বিশ্বাস এবং যুক্তিবর্জিত উপাদান সম্পর্কে বিস্ত র প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন মানবতাহীন আবেগপ্রসূত, আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব ধর্মীয় বিধিবিধানকে। আবদ্ধ চিন্তার অনেকেই এতে সংশয় প্রকাশ করেছেন, আরজ আলী কী ধর্মীয় উপলব্ধিতে আঘাত হানতে চেয়েছেন? তিনি কী মানুষের ধর্মবোধ দুর্বল করার প্রয়াস পেয়েছেন? তিনি কী ধর্মের কোমল অনুভূতিকে হেয় করতে সচেষ্ট হয়েছেন? ধর্ম যদি মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন হয়, মূল উপাদান যদি মানবতা সম্মত হয় তবে তাকে তিনি উচ্চকিতই করতে চেয়েছেন। এই মূলের পরিপার্শ্বে জমে ওঠা বাহুল্যকে সর্বতোভাবেই নাকচ করেছেন। মানবতায় ধর্মকে তিনি সমুজ্জ্বল করতে চেয়েছেন। যুক্তি ও মননের আলোকে এবং মানবতার দৃষ্টিভঙ্গিতে যাবতীয় মতামত গ্রহণ ও বর্জনে পক্ষপাতিত্ব করেছেন।[৪০]

আরজ আলী মাতুব্বর এভাবে বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তির সাথে সত্য ও জ্ঞানের সমম্বয় সাধন করেছেন। তিনি বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তির সাথে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমম্বয় সাধন করেছেন। আর ধর্মকে তিনি দেখতে চেয়েছেন মানবতাবাদী ধর্ম হিসেবে। আরজ আলীর মতে অন্ধতা এবং কুসংস্কারই মানব সমাজের উন্নতি ও প্রগতির প্রধান অন্তরায়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় আরজ আলী মাতুব্বরের ভাষ্য:

> অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ধারক ও বাহক হলো মানুষের গতানুগতিকতা এবং মানব সমাজের প্রগতির পরিপন্থী। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মূল উৎস উদঘাটন করে জনগণের দৃষ্টিগোচর করানোর উদ্দেশ্যে 'সৃষ্টি রহস্য' নামে আমি সম্প্রতি আর একখানা ক্ষুদ্র পুস্ত ক লিখেছি।[৪১]

আরজ আলী মাতুব্বর ধর্মের নামে হানাহানি পছন্দ করেন নি। তিনি ধর্ম জগতের মতানৈক্যের কারণ নির্ণয় করেন। তাঁর ভাষায়, বিশ্বমানবের সহজাতবৃত্তি বা 'স্বভাবধর্ম' হলো আহার বিহার, বংশরক্ষা বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক চাহিদার মাধ্যমে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করা। মানুষের এই স্বভাবধর্মরূপ মহাব্রত পালনের উদ্দেশ্যে তৈরি হলো কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সমাজ-নীতি এবং রাষ্ট্র; তৈরি হলো জ্ঞান বিজ্ঞানময় পৃথিবী। মানুষ যেখানে যে কাজেই লিপ্ত থাকুক না কেন, দেখা যাবে সে তাঁর 'স্বভাবধর্ম' তথা 'স্বধর্ম' পালনে ব্রতী। এই মহাব্রত পালনে কাহারো কোনো প্ররোচনা নেই এবং

Dhaka University Institutional Repository

কোনো মতানৈক্যও নাই।[৪২] সৃষ্টির শুরু থেকে এ পর্যন্ত এ মহাব্রত পালিত হচ্ছে। আরজ আলী আরও উল্লেখ করেন:

> ... ধর্ম বলিতে প্রচলিত কথায় এই স্বভাবধর্মকে বুঝায় না। যদিও এ কথা স্বীকৃত হইয়া থাকে পশু-পাখি, কীট, পতঙ্গ এমনকি জল, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদিরও এক একটি ধর্ম আছে, তত্রাচ বিশ্বমানবের ধর্ম বা 'মানবধর্ম' বলিয়া একটি আন্তর্জাতিক ধর্মকে স্বীকার করা হয় না। সাধারণত আমরা যাহাকে ধর্ম বলি তাহা হইল মানুষের কল্পিত ধর্ম। যুগে যুগে মহাজ্ঞানীগণ এই বিশ্বসংসারের স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'স্রষ্টার প্রতি মানুষের কি কোনো কর্তব্য নাই? নিশ্চয় আছে' – এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু মানুষের সমাজ ও কর্মজীবনের গতিপথও দেখাইয়া দিলেন সেই মহাজ্ঞানীগণ। এইরূপে হইল কল্পিত ধর্মের আবির্ভাব। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মনীষী বা ধর্মগুরুদের মতবাদ হইল ভিন্ন ভিন্ন।[৪৩]

আরজ আলীর মতে, এই কল্পিত ধর্মের আবির্ভাবের ফলেই দেখা দেয় বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন মতভেদ। আবার একই ধর্মে বিভিন্ন মতভেদ। একাধিক মতনৈক্য থাকা সত্ত্বেও আপন আপন ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে দাবি করার প্রবনতা দেখা যায়। সকল সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকরা একই কথা বলেন তাঁদের আপন ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম, অন্য কোনো ধর্ম নয়। এভাবে ধর্ম নিয়ে চলে একজাতি অন্যজাতির প্রতি ঘৃণ্যমনোবৃত্তি। অর্থাৎ ধর্মের নামে তৈরি হয় সাম্প্রদায়িকতা।[৪৪] কিন্তু আরজ আলী মাতুব্বর এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ তিনি চাচ্ছেন এমন একটি ধর্ম যেখানে থাকবে না কোনো হানাহানি, বিদ্বেষ। তাঁর মতে, "মানবতার মাপকাঠিতে মানুষ একে অন্যের ভাই, ভালোবাসার পাত্র, দয়ামায়ার যোগ্য সুখ-দুঃখের ভাগী; এক কথায় একান্তই আপন।"[৪৫] আরজ আলী মাতুব্বরের বিশ্বাস প্রচলিত ধর্মকে যৌক্তিক পদ্ধতিতে বিশেষণ করতে পারলেই তৈরি হবে একটি সুশীল সমাজ।

গোবিন্দ চন্দ্র দেবের জীবনদর্শন তত্ত্বমূলক নয় বরং কল্যাণধর্মী। তাঁর মতে, জীবনদর্শনের লক্ষ্য হলো মানুষকে সর্বজনীন কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা। এ অর্থে তাঁর জীবনদর্শনকে একই সঙ্গে জীবনবাদী, প্রয়োগবাদী, সুখবাদী ও মানবতাবাদী বলা যায়।[৪৬] কারণ আদর্শ জীবন কি এবং আদর্শ জীবন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়– এ সম্পর্কে *Basic Human Values* নামক গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন:

> মানব জীবনের মৌলিক মূল্যগুলি কি কি? এবং তাদের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উন্নতিবিধান করা যায় কিভাবে? আমার মনে হয়, এ প্রশ্ন দুটোর মধ্যে প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টা অন্তত গুরুত্বের দিক থেকে বড়ো এবং এতকাল দার্শনিকরা এ প্রশ্নটার প্রতি যে মনোযোগ দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগ তার প্রাপ্য বলে আমি মনে করি। প্রথম প্রশ্নটা গুরুত্ব না কমিয়েও এ কথা বলা যায় যে,

Dhaka University Institutional Repository

> এটা এমন একটা তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা যার ব্যাপারে কেবল গুটি কতক কেতাবি লোকের আগ্রহ; অথচ, একটা নিতান্ত বাস্তব অর্থে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে যে মানব গোষ্ঠীর অস্তিত্বই একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে উঠেছে, সে মানব গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয়টার উত্তরের উপরই।[৪৭]

আমার জীবন দর্শন গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন, "সারা জীবন দর্শনের সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্থাপনের চেষ্টা করে এই সত্য উপলব্ধি করেছি যে, সার্থক দর্শন মানেই জীবনদর্শন।"[৪৮] মানবতাবাদে বস্তুবাদী এবং আধ্যাত্মিক ধারা পরিলক্ষিত। দেবের মতে, মানুষের জীবনের দুটি দিক আছে একটি হল বস্তুগত দিক ও অন্যটি হল আধ্যাত্মিক দিক। বস্তুগত মানবতাবাদে আধ্যাত্মিক দিকটি প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক দিকটি উপেক্ষা করা কোনো মতেই দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে না। তাঁর মতে, সমগ্র মানব সভ্যতার স্বার্থে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলিকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। তা না হলে বস্তুগত উন্নতির চাপে মানুষ মূল্যবোধগুলি হারিয়ে ফেলবে। মূল কথা গোবিন্দ দেবের জীবন দর্শন হলো কল্যাণাস্বেষী এবং সে কল্যাণ বলতে তিনি মানুষের বিশেষত সাধারণ মানুষের সুখকে বুঝিয়েছেন।[৪৯] দেব উপলব্ধি করেছেন,শুধুমাত্র জাগতিক মানবতাবাদকে গ্রহণ করলে কখনো মানবকল্যাণ সম্ভব নয়। তাই দেব অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করেন :

> To my mind, secular humanism by itself cannot save man in this nuclear age. Without the cementing bond of his hidden spiritual unity with the universe, man might under the pressure of mighty engines of destruction of his own make go back to the dust out of which he has been fashioned.[৫০]

অর্থাৎ, জাগতিক মানবতাবাদ এই পারমাণবিক যুগে মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। পৃথিবীর সঙ্গে তার লুক্কায়িত দৃঢ় সম্বন্ধ ব্যতীত মানুষ শক্তিশালী যন্ত্রের ধ্বংসের চাপে সাজানো ধূলির জগতে ফিরে যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, "সারা জগতের অগণিত জনসাধারণের কল্যাণের প্রেরণা যোগানোই আমার জীবন দর্শনের উদ্দেশ্য।"[৫১]

তাই দেখা যায়, দেবের মতে, বস্তুবাদ এবং আধ্যাত্মবাদের সমন্বয়েই প্রকৃত মানবকল্যাণ নিহিত। মানবধর্মকেই আরজ আলী মাতুব্বর জীবনের প্রধান পালনীয় ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন। মানবধর্মই ছিল তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি উল্লেখ করেন: "আমি একজন মানবদরদী এমন কথা বলছি না, তবে মানবতাকে শ্রদ্ধা করি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে বেশি এবং পালনও করে থাকি আমার সামান্য

Dhaka University Institutional Repository

শক্তি দিয়ে যতটুকু পারি।"[৫২] তাঁর মতে, সব ধর্মের স্বীকৃত যে মতবাদ, অর্থাৎ মানবতাবাদই হওয়া উচিত মানুষের আন্তর্জাতিক মানবধর্ম।[৫৩] কারণ জগতের দুর্বলদের জন্য তাঁর উদ্বেগ। তিনি বলেন, জগতের রোদন-বিনয় হলো শুধুমাত্র দুর্বলদের জন্য। প্রত্যাশিত বস্তু পাবার জন্য দুর্বল রোদন করে কিন্তু সবল তা কেড়ে নেয়। তাই আরজ আলীর মতে, এই শক্তিহীন দলে যারা আছেন অর্থাৎ শতকরা ৮০ জন লোকই ভরসা রাখে মানবতার উপর এবং দেশে 'মানবতাবাদ' প্রতিষ্ঠা হোক – এ কামনা করে।[৫৪] তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন মানবতা বা মানবধর্মেই পৃথিবীতে একদিন সকল মানুষের প্রধান ধর্ম হয়ে দেখা দেবে। তিনি বলেন – 'মানবতা' .... মানবতাই হবে আগামী দিনের মানুষের আন্তর্জাতিক ধর্ম তথা 'মানবধর্ম'।[৫৫] বাংলাদেশের মানুষের মনেও মানবধর্মের উদ্ভব হবে তিনি এ আশা পোষণ করেন। আরজ আলী মাতুব্বরের মতে:

> .... যদিও দর্শনশাস্ত্রটি সার্বজনীন, তথাপি হিন্দু দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, মুসলিম দর্শন, ভারতীয় দর্শন, গ্রীক দর্শন, ইত্যাদি দর্শনে যেমন স্বাতন্ত্র্য, বর্তমান বাঙালির জাতীয় দর্শনেও তেমনটি বাঞ্ছনীয়। আর আমার ব্যক্তিগত অভিমত থেকে বলছি, তা হওয়া উচিত মানবতাবাদী দর্শন। কেননা সর্বদেশে এবং সর্বকালে মেহনতী মানুষই মানবতার প্রত্যাশী, পুঁজিপতিরা নয়। আর দুনিয়ার দরিদ্রতম দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ, যেখানে মেহনতী মানুষের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৯০। তাই এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনদর্শনই হওয়া উচিত বাঙালীর জাতীয় দর্শন তথা মানবতাবাদী দর্শন।[৫৬]

সমাজসেবা এবং মানবকল্যাণ আকাঙ্ক্ষাই ছিল আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনে প্রধান ব্রত। মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়েও অনেক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর নিজ গ্রামে 'আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরীর' এক বার্ষিক সভায় বলেছেন – মানুষকে দেয়ার মতো আমার কিছুই নেই, আছে শুধু মানবকল্যাণের বাসনা। তিনি বলেন:

> আমার জীবনের ব্রত হচ্ছে মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করা। আমার মনে হয় যে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিশেষ উপায় হচ্ছে মানুষে জ্ঞান বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ লোকশিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি সাধন করা। আর সে উদ্দেশ্যে সিদ্ধির সামান্য ইন্ধন যোগাচ্ছি পুস্ত কাদি প্রণয়ন, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে। এ ছাড়া আমার অন্যান্য যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ।[৫৭]

মানবকল্যাণের আকাঙ্ক্ষা আরজ আলী মাতুব্বরের মধ্যে কীভাবে সক্রিয় ছিল, তা তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ড থেকে যেমন উপলব্ধি করা যায়, তেমনি বোঝা যায় তাঁর উইলের ভাষা থেকে। কায়িক শ্রমের

Dhaka University Institutional Repository

আয় তিনি দান করেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠানে, আর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর চোখ ও দেহ দান করেছেন বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজকে। তিনি নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে নিজের বাড়িতেই মানুষের জ্ঞান অর্জনের জন্য স্থাপন করেছেন, 'আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী'। নিজের অর্থ থেকেই তিনি মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে গেছেন, বিশ্ব মানবতা ও মানব ধর্মের জন্য ব্যবস্থা করেছেন বার্ষিক রচনা প্রতিযোগিতা। মানব কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি জীবদ্দশাই গঠন করে যান কয়েকটি তহবিল, সেগুলো আজ 'আরজ ফান্ড' নামে পরিচিত। তিনি তাঁর এ প্রতিষ্ঠানটি দান করে গেছেন রেজিস্ট্রীকৃত ট্রাস্টনামা' দলিল দ্বারা জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে।[৫৮] আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর চিন্তা চেতনা, রচনা তথা সমগ্র জীবন সাধনা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এমন দর্শন যা মানুষ ও মানুষের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণে নিয়োজিত। তিনি মানুষের কল্যাণার্থে উৎসর্গ করে গেছেন নিজেকে, নিজের জীবন, সহায়-সম্বল সব কিছুকে। অপরদিকে গোবিন্দ চন্দ্র দেবও মানবজাতির কল্যাণার্থে নিয়োজিত থেকে সদা কাজ করে গেছেন। মানুষের কল্যাণার্থে দর্শনের প্রচার ও প্রসারকল্পে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের হাতে তাঁর সম্পত্তি উইল করে গেছেন। তাঁর উইলকৃত অর্থ দিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে "দেব সেন্টার ফর ফিলোসফিকাল স্টাডিজ।"[৫৯] বুদ্ধ ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারা তাঁর মানবতাবাদী চিন্তাধারার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ সম্পর্কে তাঁর দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ, *The Philosophy Vivekananda* এবং *Buddha, The Humanist.* স্বামী বিবেকানন্দের প্রশংসা করে গোবিন্দ চন্দ্র দেব বলেন:

> কোনো একটি মুহূর্তের জন্যও মানব প্রকৃতির মহিমা ভুলে যেও না। আমরা হচ্ছি সর্ব বৃহৎ ঈশ্বর, যা আমরা সব সময় ছিলাম বা সব সময় থাকবো। খ্রিস্ট এবং বুদ্ধ হচ্ছে অসীম সমুদ্রের ঢেউমাত্র যা আমি নিজেও।[৬০]

দেব পুনরায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদানের কথা উলেখ করে বলেন:

> ...মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি মুক্তি অর্জনের প্রয়াসকে সঠিক পথে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা ছিল বিবেকানন্দের অপরিসীম। ব্যক্তি মুক্তি তথা সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য তাঁর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ব্যক্তির সর্বোচ্চ পূর্ণতা অর্জন এবং সাধারণ মানুষের চিরকালীন এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা দূরীকরণের একটি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাজনিত প্রচেষ্টা।[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দচন্দ্র দেব নিজের জীবনেও মানবতাবাদের আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি আজীবন মানবকল্যাণের সেবায় ব্রত ছিলেন। দেবের মতে:

> মানবতাবাদ আমরা চাই এবং আমাদের কল্যাণের জন্যই আরো বেশি করে চাই। কিন্তু আমরা জাগতিক মানবতাবাদ চাই না। সাধারণ মানুষের জীবনের উন্নতির জন্য জাগতিক মানবতাবাদ নিঃসন্দেহে প্রয়োজন, কিন্তু তা একদেশদর্শিতায় দুষ্ট এবং আমরা যদি এই একদর্শী ও চরমপন্থা মেনে নেই, তাহলে আমরা কুকুরের বাঁকা লেজ আর কখনো সোজা করতে পারব না।[৬২]

গোবিন্দ চন্দ্র দেবের দার্শনিক চিন্তার গতি সুপ্রশস্ত । পরমসত্তা, জ্ঞানের স্বরূপ ইত্যাদি বিশুদ্ধ দার্শনিক সমস্যা তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু তাঁর চিন্তার মূলকেন্দ্র ছিল মানব-জীবন, মহৎ-জীবন যাপনের সমস্যা, কিংবা নিছক বাঁচা-মরার সমস্যা। এদিক থেকে তিনি ছিলেন দার্শনিক গুরু সক্রেটিসের ভাব শিষ্য। দেব বিভিন্ন মানবতাবাদী চিন্তাধারার প্রতি সহনুভূতিশীল ছিলেন। তাই তিনি তাঁর দর্শনে বিভিন্ন প্রকার মানবতাবাদের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি সকল মানবতাবাদী ধারণায় উপনীত হবার চেষ্টা করেন এবং সম্ভবত সার্থকও হয়েছিলেন।[৬৩] তিনি চেয়েছিলেন দরিদ্র, অত্যাচারিত, নিপীড়িত, দুস্থ মানুষকে শোষণ ও জুলুমের হাত থেকে মুক্ত করতে। ভারতীয় মানবতাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি, এমন এক সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা করেছিলেন যেখানে মানুষের মধ্যে প্রেম, সহানুভূতি ও শান্তি বিরাজ করবে। পৃথিবীর সকল জীবন্ত শ্রেণীর মধ্যে তিনি ঐক্যের বাণী প্রচার করেছিলেন। মানুষে মানুষে সাম্যের ইসলামী মানবতাবাদী ধারণাকে তিনি হৃদয়ঙ্গম ও প্রচার করেছিলেন।[৬৪]

এভাবে গোবিন্দ চন্দ্রদেব যে সমৃদ্ধিশালী ও মানবতাবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখতেন, তা ছিল সাধারণ মানুষের ইতিহাস। গোবিন্দ দেবের মতে, এ সাধারণ মানুষ কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সমষ্টি নয়। এই মানুষ আমাদের আশেপাশের রক্ত-মাংসের মানুষ সমাজভূক্ত মানবীয় একক বিশেষ। সেজন্য সাধারণ মানুষের উন্নতিকে বাদ দিয়ে সমাজের উন্নতির চিন্তা করা অনেকটা মরীচিকার পেছনে ধাওয়া করার মতো। তাই তিনি বলেন, "Luckily, unluckily, modern man is cut off from the mornings of that lofty idealism of the past." [৬৫]

গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মতে শান্তিপূর্ণ, মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল সমাজের তিন ধরনের শত্রু আছে এবং এদেরকে একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি গোষ্ঠীতন্ত্র (Sectionalism)-কে এ ত্রিভুজের ভিত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং বাহু দুটোকে গোঁড়ামি ও হিংসা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। হিংসাপূর্ণ মনমানসিকতাই গোঁড়ামিকে স্থায়ী এবং চাঙ্গা করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

এই তিনটি জিনিসই সমাজে অবস্থানরত মানুষকে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ, একাত্মতাবোধ এবং মানব প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে তিনি এদের বিষধর সরীসৃপ এমনকি উন্মত্ত কুকুর ও সাপের মতো ভয় করতেন। কারণ যেক্ষেত্রে শেষোক্তগুলো মানুষের দেহকে বিনষ্ট করে, প্রথমোক্তগুলো সেখানে মানুষের আত্মার ক্ষতি করে। তিনি দুঃখ করে বলেন, আজকে যখন দুনিয়াটা ক্রমাগত ছোট হয়ে আসছে এবং বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা মহাবিশ্বের বিভিন্ন দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন যারা কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের অবস্থা বহু শতাব্দী পূর্বে প্লেটো বর্ণিত সেইসব ব্যক্তির মতো যারা হাত পা বাঁধা অবস্থায় অন্ধকার গুহার মধ্যে পড়ে আছে। তিনি অবশ্য আশা করেন যে, এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। অবস্থার চাপে এ ধরনের সঙ্কীর্ণ ও আদিম মানসিকতার পরিবর্তন হবে। অচিরেই সাধারণ মানুষের প্রয়োজন স্বীকৃত হবে এবং একটি উদার বিশ্ব গড়ে উঠবে।[৬৬]

গোবিন্দ চন্দ্র দেব অর্থনৈতিক উন্নতি, নৈতিক প্রগতি ও আধ্যাত্মিক বিকাশের ধারা উপলব্ধি প্রেক্ষাপটে বিশ্ব সংস্কৃতির অবয়ব নির্মাণ করতে সচেষ্ট হন। তার মতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সজ্ঞানীন রূপ মিলে একটি দিক উন্মোচিত হয়, যার ফলে কোন একটি দেশ, সমাজ বা জনগোষ্ঠীর জীবন উপলব্ধি ও প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; মানুষ নিজেকে একজন বিশ্বমানুষ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে এমন একটা ভাব ও বস্তুগত পরিবেশ তৈরি হয়েছে – এ ব্যাপারে গোবিন্দ চন্দ্র দেব নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন। ধর্ম ও দর্শন বহুকাল ধরে যে ঐক্যের কথা বলে এসেছে তা অনেকের কাছে বিমূর্ত মনে হলেও গোবিন্দ দেবের মতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এ শর্তটিকে মূর্ত করে তুলেছে। বাহ্যিক ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাগতিকতার অন্তরালে বিজ্ঞান এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক কাজটি হয়তবা অসচেতনভাবে সমাপ্ত করেছে।

গোবিন্দচন্দ্র দেব ক্রমশ তত্ত্বালোচনা থেকে সরে গিয়ে বর্তমান বিশ্বের সমস্যাদির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। তাই তাঁর শেষদিকের লেখাগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দর্শনের কূট প্রশ্নের চেয়ে বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমকাল, নৈতিকতা, প্রযুক্তিবিদ্যা, আণবিক মারণাস্ত্র ইত্যাদি প্রমাণের দিকেই বেশি ঝুঁকেছিলেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানকে জীবনের প্রয়োজন থেকে আলাদাভাবে দেখেননি। তিনি জোর দিয়েছেন বুদ্ধি ও প্রয়োজনবাদের সমন্বয়ের উপর এবং সেই জন্যই তিনি তাঁর চিন্তার সর্বশেষ পর্যায়ে বুদ্ধের বাণীর মধ্যে এ সমন্বয় লক্ষ করে সেই দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।[৬৭]

আরজ আলী মাতুব্বর যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাথে সর্বজনীন মানবধর্মের সমন্বয় করেছেন। সর্বজনীন অর্থাৎ হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সবার ধর্ম হবে এক, সেটাই তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এবং তাঁর এই প্রমাণের পিছনে নিহিত ছিল একটা যুক্তি তথা বৈজ্ঞানিক সত্যতা, যার উদাহরণ দিয়েছেন তিনি সর্বত্র। তবে গোবিন্দ দেবের দর্শনের সাথে আরজ আলী মাতুব্বরের পার্থক্য এই যে, তিনি কোনোভাবে অতীন্দ্রিয় কিছুকে মেনে নেন নি অর্থাৎ আধ্যাত্মবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, যা গোবিন্দ দেবের দর্শনে স্থান পেয়েছিল। গোবিন্দচন্দ্র দেব তার দর্শন রচনা করেছেন ঐতিহাসিক ধর্মানুভূতি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সঠিক মূল্যায়নের ওপর। সাধারণ মানুষ যুক্তি এবং দর্শনের চেয়ে যথাক্রমে বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাই তিনি যুক্তির সঙ্গে ধর্মের বিশ্বাস ও অনুভূতিকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন তা কোনো গতানুগতিক বিশেষ ধর্ম নয়- বরং এক সর্বজনীন মানবধর্ম, যা অন্য কোনো ধর্মের সঙ্গে কলহ বা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ নয়। তাঁর দৃষ্টিতে যথার্থ ধর্ম মাত্রই সাধারণ গণমানুষের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের বাহন, তথা মানবমুক্তির উপায়স্বরূপ।[৩৮]

বস্তুত জীবনবিযুক্ত দর্শন চর্চা ও ধর্মীয় সাধণা সাধারণ মানুষের কোনো স্থায়ী কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আনতে পারে না। অন্যদিকে, নৈতিক, আধ্যাত্মিক আদর্শ ও মূল্যবোধ বর্জিত অবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রাভিযান শুধুমাত্র ধ্বংসের গতিকেই ত্বরান্বিত করে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ্য, অনেকে ধর্মের বিরোধিতা করতে গিয়ে ধর্মের নামে ধর্মের ধ্বজাধারী স্বার্থবাদীরা যেসব অমানবিক, অনৈতিক কাজ করছে সেগুলিই উল্লেখ করেন। কিন্তু ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও মানব সভ্যতার ইতিহাসে সত্যিকার ধার্মিকদের ইতিবাচক ও দিকনির্দেশক ভূমিকার কথা ভুলে যান। পক্ষান্তরে এরাই যখন বিজ্ঞান বা কোনো জাগতিক ভাবাদর্শের জয়গান করেন তখন কিন্তু বিজ্ঞান ও আলোচ্য মতাদর্শের অপব্যবহার করে। আবার এদের ছত্রছায়ায় অন্যায় বা অশুভ কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটলে সে ব্যাপারে নীরব থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কাজ বস্তুনিষ্ঠ এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতার পরিচায়ক নয়। এ প্রসঙ্গে আমিনুল ইসলাম বলেন :

> এর জন্য আসলে কি ধর্ম দায়ী ? ডঃ দেবের মতো আমারও ধারণা 'না'। এর জন্য ধর্ম দায়ী নয়, দায়ী আসলে সেসব ব্যক্তি যারা ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের অসাধু উদ্দেশ্য হাসিল করার লক্ষ্যে, ...ধর্মের এই অসাধু প্রয়োগ যেমন পারে না মানুষকে কল্যাণের পথের দিকদর্শন দিতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির লক্ষ্যহীন প্রয়োগও তেমনি পারছে না শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে। যেমন বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ আজ যান্ত্রিক ও বৈষয়িক শক্তির অধিকারী হয়েছে বটে; কিন্তু নৈতিক চরিত্র ও মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সে আজ মর্মান্তিক অধঃপতনের সম্মুখীন। ...মানুষকে আজ অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে অন্ন-বস্ত্র-ভিটামিন যেমন প্রয়োজন তার দৈহিক প্রাণকে টিকিয়ে রাখার জন্য, তেমনি তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার পুষ্টি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন, দয়া, মায়া, ন্যায়, সত্য, সুন্দর,

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণ প্রভৃতি মূল্যবোধের মনন, শ্রবণ ও অনুশীলন। মানুষের ব্যাপক কল্যাণ ও দীর্ঘস্থায়ী সুখশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই, থাকতেও পারে না।[৬৯]

আরজ আলী মাতুব্বর, গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব ও আমিনুল ইসলাম প্রমুখ মানবতাবাদী দার্শনিকগণ সমাজের কল্যাণের অন্তরায় হিসেবে ধর্মের অসাধু প্রয়োগকারীদের দায়ী করেছেন এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নতির দিক নির্দেশ করেছেন। আজকের এই হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কলহময় পৃথিবীতে মানুষ কামনা করে ঐক্য-সৌহার্দ্য ও শান্তি-প্রগতি; সকল মানুষ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কলহ ও মতপার্থক্য পরিত্যাগ করে – ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে একটি আশঙ্কামুক্ত সুন্দর জীবনযাত্রার কামনা করবে। মানবতাবাদী দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেবও তা-ই কামনা করেছেন তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে, তাঁর আত্মার অন্তঃস্থল থেকে। আর তাই তিনি বলেন: "... visualized the future of the common man in a synthetic philosophy that finds the truth of matter in spirit and of spirit in the matter."[৭০] আরজ আলী মাতুব্বর ও গোবিন্দ চন্দ্র দেবের দর্শনের মূলমন্ত্র ছিল এক নিরাপদ, অভাবমুক্ত, স্বাস্থ্যোজ্বল মানুষের জন্য পৃথিবী গড়ে তোলা। জনগণের মধ্যে নৈতিক, ধর্মীয় ও মানবিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে পৃথিবীকে ভবিষ্যত মানুষের জন্য বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা। যাতে সকল সুস্থ মানুষ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধমুক্ত বিশ্বে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। সেদিক থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ দুই দার্শনিকের 'দর্শন' মানবজীবনের কল্যাণার্থে আদর্শিক হাতিয়ার হিসেবে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। যে কারণে অনাগত ভবিষ্যতে তাঁদের দর্শন এবং চিন্তাধারা গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করতে সহায়ক এবং অনুপ্রেরণা জোগাবে। আরজ আলী মাতুব্বর ও গোবিন্দচন্দ্র দেব মানবতাবাদী জীবনদর্শনের লক্ষ্যেই নিবেদন করেছেন চিন্তা, চেতনা ও সমগ্র জীবন সাধনা। বিশ্বে আজ বিরাজ করছে অশান্তি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদপুষ্ট সমকালীন মানুষ আজ হারিয়ে ফেলেছে বহুযুগের লালিত মূল্যবোধ এবং মূল্যমানসমূহ। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আজ সব দেশের সব মানুষ অসহায়। মানুষ নিপতিত হচ্ছে সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে। এ মুহূর্তে বড়ই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এ দুই দার্শনিকের জীবনদর্শন অনুসরণ করা। তাহলে অন্তত পৃথিবীর বুক থেকে সবরকম সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটবে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ বাস করতে পারবে নিশ্চিত নিরাপত্তা ও অনাবিল সুখ-শান্তিতে।

আরজ আলী মাতুব্বর, গোবিন্দ চন্দ্র দেব ও আমিনুল ইসলাম প্রমুখ মানবতাবাদী দার্শনিকগণ সমাজের কল্যাণের অন্তরায় হিসেবে ধর্মের অসাধু প্রয়োগকারীদের দায়ী করেছেন। এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নতির দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. আবদুল মতিন, 'গোবিন্দ্র চন্দ্র দেবের জীবন দর্শন', শরীফ হারুন (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, বাংলা একাডেমী, ২য় খন্ড, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৫৩৯

২. আইয়ুব হোসেন 'সম্পাদিত', *আরজ আলী মাতব্বর রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৪৮

৩. মোঃ আব্দুল হামিদ, 'গোবিন্দ্র দেব স্মরণে', *নন্দন* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, পৃ. ২

৪. প্রদীপ কুমার রায়, 'গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও কর্ম', প্রদীপ কুমার রায় (সম্পাদিত), *গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*, মিতার্তা প্রেস, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২

৫. আমিনুল ইসলাম, 'গোবিন্দ দেবের জীবন দর্শন ও সমকালীন মানুষ', প্রদীপ কুমার রায় (সম্পাদিত), *গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*, পৃ. ৭৭

৬. ঐ, পৃ. ৭৭

৭. সাইয়েদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *Proceedings of Pakistan Philosphical Congress*, ১৯৬০, পৃ. ৯৭

৮. ১৯৬০ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

৯. G.C. Dev, *Aspirations of the Common Man*, The University of Dhaka, 1963, পৃ. ৬

১০. ঐ, পৃ. ৬

১১. ঐ, পৃ. ৬

১২. আব্দুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩-৪৪৪

১৩. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, *আমার জীবন দর্শন*, মলিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬০, পৃ. ১০

১৪. Bertrand Russell, *An Outline of Philosophy*, Routledge, London, 1993 (Reprinted), পৃ. ১৮৮

১৫. G. C. Dev, *Aspirations of the Common Man*, পৃ. ৮২-৮৩

১৬. ঐ পৃ. ৭৮

১৭. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, *আমার জীবন দর্শন*, পৃ. ৯২

১৮. G. C. Dev, *Aspirations of the Common Man*, পৃ. ৬৪

১৯. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-১*, পৃ. ৫৮

২০. ঐ পৃ. ১৩৬

২১. ঐ পৃ. ২৮০

২২. ঐ পৃ. ২৮১

২৩. আনু মুহাম্মদ, 'প্রশ্নের শক্তি; আরজ আলী মাতুব্বর', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

২৪. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-১*, পৃ. ২৭৯

২৫. ঐ পৃ. ৫২

২৬. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত) *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা-২*, পৃ. ১৮৮

২৭. Hasan Azizul Huq (ed.), *Works of Govinda Chandra Dev*. Bangla Academy, Dhaka, 1980, *(Aspirations of the Common Man)*, পৃ. ৪৪১

২৮. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, *আমার জীবন দর্শন*, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

২৯. G.C. Dev, *Aspirations of Common Man*, পৃ. ১৮৯

৩০. G. C. Dev, *Buddha The Humanist,* Paramount Publishers, Dhaka, 1969, পৃ. ২৬

৩১. আবদুল মতীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫

৩২. G. C. Dev *Aspirations of the Common Man*, পৃ. ১৪৯

৩৩. আবদুল মতীন, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪৫

৩৪. গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব, *আমার জীবন দর্শন*, পৃ-১১২

৩৫. মোঃ আব্দুল হামিদ, 'গোবিন্দ দেব স্মরণে' *মনন*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, রাজশাহী, জুলাই ১৯৭২ পৃ. ২

৩৬. আব্দুল জলি মিয়া, 'ডঃ জিসি দেবের স্মরণে,' *দর্শন*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৩৭৯, পৃ. ৩৭

৩৭. মৃণাল কান্তি ভদ্র, 'বাংলাদেশের দর্শন চর্চা' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৯২, পৃ. ৪৩৬

৩৮. আবদু মতিন: প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৬

৩৯. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, *আমার জীবন দর্শন*, পৃ. ৯৫

৪০. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত) *আরজ আলী মাতুব্বর, রচনা-১*, পৃ. ৩৭-৩৮

৪১. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত) *আরজ আলী মাতুব্বর, রচনা-২*, পৃ. ২৭১

৪২. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত) *আরজ আলী মাতুব্বর, রচনা-১*, পৃ. ৫১

৪৩. ঐ পৃ. ৫১

৪৪. ঐ পৃ. ৫২

৪৫. ঐ পৃ. ৫২

৪৬. আব্দুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪২

৪৭. সাইয়েদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *Proceedings of Pakistan Philosphical Congress*, ১৯৬০, পৃ. ৯৫

৪৮. গোবিন্দচন্দ্র দেব, *আমার জীবন দর্শন*, পৃ. ৬-৭

৪৯. আবদুল মতীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২

৫০. G.C. Dev, *Arpirations of the common Man*, পৃ. ২৯

৫১. গোবিন্দচন্দ্র দেব, *আমার জীবন দর্শন*, পৃ. ৯৫

৫২. আইয়ুব হোসেন 'সম্পাদিত', *আরজ আলী মাতব্বর রচনা সমগ্র-২*, পৃ. ২৮৮

৫৩. ঐ, পৃ. ২৮৮

৫৪. ঐ, পৃ. ২৮৮

৫৫. ঐ, পৃ. ২৯৪

৫৬. ঐ, পৃ. ৩০৭-৩০৮

৫৭. ঐ, পৃ. ৩০৯

৫৮. ঐ, পৃ. ২৯৮

৫৯. আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯

৬০. G. C. Dev, The *Philosophy of Vivekananda and the Future of Man*, Ramkrishna Mission, Dhaka, 1963, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

৬১. ঐ, পৃ. ২৯৮

৬২. G. C. Dev, *Aspirations of the Common Man*, পৃ. ২৯

৬৩. মোঃ তাহাসউদ্দিন, 'গোবিন্দচন্দ্র দেবের মানবতাবাদী দর্শন,' প্রদীপ কুমার (সম্পাদিত), *গোবিন্দ চন্দ্র দেব : জীবন ও দর্শন*, ১৯১, পৃ. ৯৪

৬৪. G. C. Dev, *Aspirations of the Common Man*, পৃ. ১৮-১৯

৬৫. ঐ, পৃ. ২

৬৬. Hasan Azizul Huq (ed.), *Works of Govinda Chandra Dev*, পৃ. ৪৪২-৪৪৩

৬৭. ডাঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, *আমার জীবন দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ-১০

৬৮. আমিনুল ইসলাম, *'গোবিন্দ দেবের জীবন দর্শন ও সমকালীন মানুষ'*, প্রদীপ কুমার (সম্পাদিত), পৃ. ৮৪-৮৫

৬৯. আমিনুল ইসলাম, *গোবিন্দ চন্দ্র দেব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৪-৪৫

৭০. G.C. Dev, *Idealism: A New Defence and a New Application*, Dhaka University, Dhaka, 1958 (Preface)

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর দর্শনে মানব জীবনের অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্যের সন্ধান লাভ করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত জীবশ্রেষ্ঠ মানুষকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবনদর্শনের সূত্রপাত, যা মানবতাবাদের মূলমন্ত্র। যে কারণে তিনি সকল সংকীর্ণতা ও লৌকিকতার বাঁধন ছিন্ন করতে পেরেছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তা-চেতনার অনুধ্যানে যে ধরনের দর্শনের ঈঙ্গিত বহন করে তা কেবল মাত্র ব্যবহারিক প্রয়োগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যার গুরুত্ব সমকালীন প্রেক্ষাপটে অপরিসীম। তিনি সবকিছু যুক্তির নিরিখে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। এর গুরুত্ব মানব কল্যানে অপরিহার্য। তিনি বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনায় আঘাত করে মুক্ত চিন্তার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। আর এ কারণে আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে মানবপ্রেম ও বিজ্ঞান চেতনার যৌক্তিক বিতর্ক অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয়।

প্রাচীন গ্রিসে থেলিস থেকে শুরু করে প্লুটিনাস প্রমুখ দার্শনিকগণ বৈজ্ঞানিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বমানবের উৎপত্তি ও মানুষের মানবিক মর্যাদার লক্ষ্যে যুক্তি স্থাপন করেছেন। মানুষের জীবনের স্বাধীনতার মর্যাদার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে আরজ আলী মাতুব্বরও গ্রিক দর্শনের সূত্র ধরে যৌক্তিক চিন্তা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশেষণের মাধ্যমে জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাতে তাঁর চিন্তাধারার যৌক্তিক মানবিক আশা-আকাক্ষা, নৈতিক ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে তাঁর দর্শনের তাত্ত্বিক দিকের চেয়ে প্রায়োগিক দিকের গুরুত্বই বেশি প্রতিভাত। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে বেকন, ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ, লক, হিউম প্রমুখ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জ্ঞান চর্চার উপর আলোকপাত করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদসহ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের দর্শন জ্ঞানবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল দর্শন – যার প্রতিফলন আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনেও পরিলক্ষিত হয়। আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের বিশৃঙ্খলা ও অসাম্প্রদায়িকতার জন্য মানুষকে দায়ী করেছেন। তিনি যুক্তির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনার করুণ চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরে তা থেকে অবসানের পথেরও নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমাজতন্ত্র তথা 'সাম্যবাদ' হচ্ছে বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানের একমাত্র মাধ্যম। সমকালীন পাশ্চাত্যদর্শনের মার্কস, রাসেল, সার্ত্রে প্রমুখ দার্শনিকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জীবনমুখিতা। সমকালীন যুগে দর্শনকে মানুষের প্রয়োজনে এবং মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করার কথা বলা হয়। তাঁরা সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা বলেন। তাঁদের দর্শনে বিজ্ঞানের প্রতি অধিকতর ঝোঁক পরিলক্ষিত হয় - আরজ আলী

Dhaka University Institutional Repository

মাতুব্বরের জীবনেও যার ব্যত্যয় ঘটেনি। আরজ আলী মাতুব্বর মানুষের সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে থেকে মানবিক দিককে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং মানবিক মূল্যবোধ ব্যতিরেকে সবকিছুই তিনি প্রতিহত করতে চেয়েছেন।

আরজ আলী মাতুব্বর বিংশ শতাব্দীতে এসে জীবনকে দর্শন থেকে আলাদা করে দেখেননি। দর্শনকে বিজ্ঞানমুখী ও জীবনমুখী করার লক্ষ্যে তিনি ঐশ্বরিক শক্তির চেয়ে বাস্তব যুক্তি ও বিচারের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন দর্শন কোনো পূর্বসংস্কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়াকে প্রশ্রয় দেয় না। তিনি বিশ্বাস করতেন সত্যিকারের জ্ঞানপিপাসু এবং সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি অবশ্যই উদার, যুক্তিবাদী এবং নীতিবোধসম্পন্ন হয়ে থাকেন। কোনো সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতা স্পর্শ করতে পারে না এ ধরনের মানুষকে। সেই সঙ্গে কোনো অন্ধ গোঁড়ামিও এদেরকে আকর্ষণ করতে পারে না। মোটকথা দর্শন যৌক্তিক চিন্তা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করতে চায় না। দর্শন তাঁর বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করে যুক্তির নিরিখে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তাই দর্শনের তাত্ত্বিক দিকের চেয়ে প্রায়োগিক দিকটাই বেশি গ্রহণযোগ্য। আরজ আলী মাতুব্বর আইয়ুবীয় দর্শনের চিন্তার সূত্র ধরে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় যে দার্শনিক অনুসন্ধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকেই বেশি গুরুত্বের ভূমিকা পালন করে।

আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর কৈশোরকাল থেকেই জগত-জীবন সৃষ্টিকর্তা, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, বস্তুজীবনের সত্তা, জীব-অজীবে পার্থক্য প্রভৃতি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে নিজের মনে প্রশ্ন তুলেছেন, চিন্তা করেছেন। এভাবেই মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। জগত ও মানুষ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন বিজ্ঞানমনস্ক আরজ আলী মাতুব্বর – আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তার বয়স কত? কিভাবে এর উৎপত্তি? দিনরাত কিভাবে হয়? কিভাবে মৌসুমের পরিবর্তন ঘটে? কোন্ প্রাণ দিয়ে প্রাণী জগতের শুরু? এ পৃথিবীর সঙ্গে বাকি জগতের সম্পর্ক? এ জগতের শেষ কোথায়? আরজ আলী মাতুব্বর এ সব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য যত ধরনের ধর্মগ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন তা পেখেছেন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা – যেমন পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রত্নবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্র অধ্যয়ন করেছেন। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ ধর্মসহ অন্য সব কিছুর মতো অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিজ্ঞান তাঁকে এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে যুক্তিসঙ্গত একটি কাঠামো দান করেছিল যা দিয়ে তিনি বিজ্ঞানের ব্যবহারের ওপর গুরত্ব আরোপ করেছিলেন।

আরজ আলী মাতুব্বর জগতের স্বরূপ অনুসন্ধান এবং সব কিছুকে যুক্তির নিরিখে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন যা মানবিক মর্যাদার বৃদ্ধিকল্পে সহায়ক ভূমিকা রাখে। কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনায় আঘাত করে মুক্তচিন্তার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টাই ছিল তাঁর সংকল্প। সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

অচলায়তনে তাঁর রচনার এক একটি বাক্য হয়েছে এক একটি আঘাত। তাই সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। মানবপ্রীতি ছিল তাঁর মধ্যে অপরিসীম। তাঁর চিন্তা চেতনায় সর্বদা বিরাজ করত মানবকল্যাণ। নিজের অজ্ঞতা দূর করার লক্ষ্যেই আরজ আলী মাতুব্বর জ্ঞান অর্জনের কথা বলেন । যে কারণে স্বশিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক, আপোসহীন ও প্রতিবাদী দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর সারাজীবন লড়াই করে গেছেন মানবকল্যাণার্থে। অজ্ঞতা দূরীকরণের লক্ষ্যেই শিক্ষার যত আয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজের অজ্ঞতা, অন্ধতা দূর করে– নিজেকে আরো উন্নত করার চেষ্টায় রত থাকা মানবতাবাদী দর্শনের মূল লক্ষ্য। আরজ আলী মাতুব্বর প্রশ্নের মাধ্যমে তৈরি করতে চেয়েছেন নিজ ব্যক্তিসত্তা, চিনেছেন নিজেকে। তিনি তাঁর মুক্তবুদ্ধির আলোকে নিজেকে চিনেছেন বলেই প্রশ্ন করেছেন সত্য সম্পর্কে। এভাবে আরজ আলী মাতুব্বর যা বুঝেছেন তা পরিস্কার বুঝেছেন, যা বলেছেন সহজ সরলভাবে বলেছেন, এবং যা তাঁর বিশ্বাসে ছিল তা-ই তিনি উচ্চারণ করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল মানবতাবোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, যা মানবকল্যাণে অপরিহার্য।

আরজ আলী মাতুব্বর সোফিস্টদের মতো মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। দার্শনিক চিন্তাধারাকে কার্যকর ও বাস্তবমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে সোফিস্টরা যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁদের মানবতাবাদী চিন্তার মাধ্যমে পরবর্তীকালে মানুষের জন্য তাঁরা এ শিক্ষা রেখে যান যে, প্রকৃতি নয় বরং মানুষ নিজেই তাঁর চিন্তার প্রথম ও প্রধান সমস্যা। মানবতাবাদী দর্শন প্রচারের মাধ্যমে তাঁরা দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে এক নতুন প্রাণ ও প্রেরণার সঞ্চার করেন। আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর দর্শনে সোফিস্টদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের অন্যায়কে অন্যায় বলে ভাবতে শিখিয়ে মানুষকে মানবিক মর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন; উদ্বুদ্ধ করেছেন যুক্তিবোধে।

গ্রিক দার্শনিক সোফিস্টদের মানবকেন্দ্রিক চিন্তাধারায় পরিপূর্ণতা লাভ করে সক্রেটিসের চিন্তায়। প্রাচীনযুগে সক্রেটিস বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে প্রমাণ করেছেন যে, একজন দার্শনিকের কাছে জ্ঞান, সত্য ও সুনীতির চেয়ে আর কিছু প্রিয় এ পৃথিবীতে নেই। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব মতামত থাকে, থাকে নিজস্ব সিদ্ধান্ত। যুক্তিবিদ্যার যুক্তিমালার গতি থাকে সিদ্ধান্তের দিকে। আবার দার্শনিক চিন্তা, চেতনার গতিও ধাবিত হয় নৈতিক ও পারমার্থিক জ্ঞানের দিকে। সর্বোপরি তা' রূপ নেয় ব্যাপকভাবে মানবকল্যাণের মহান লক্ষ্যে। সক্রেটিস এথেন্সবাসীকে নানারকম যুক্তিসম্বলিত প্রশ্ন করে উদ্বুদ্ধ করতেন। আরজ আলী মাতুব্বরও সুদীর্ঘকালের লালিত বিশ্বাস, প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের মূলে আঘাত হেনে প্রশ্ন রেখেছিলেন সৃজনশীল তৎপরতায়। কেবলমাত্র সৃজনশীল মনুষের মধ্যেই তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তেজনা ও উদ্বেগ অনুভব করার ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বরের মতে, বিজ্ঞানচর্চার মূলমন্ত্র হতে হবে সংশয়, এমনকি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ হতে হবে সংশয়পীড়িত চিত্ত। এ ধরনের সংশয়ের কারণেই তিনি বিজ্ঞান পাঠকে অপরিহার্য বলে মনে করেন এবং বিজ্ঞান পাঠের ফলে সংশয় আরো তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠলে আরজ আলী মাতুব্বর এই কুসংস্কারজর্জরিত সমাজে হয়ে ওঠেন একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি। সক্রেটিসের মতো এই প্রশ্নগুলি গ্রামের আরো বিভিন্ন মানুষের সামনে উপস্থাপন করলে প্রতিষ্ঠিত হয়– একটি ভিন্ন জগৎ, যার ভিত্তি ছিল ধর্ম। তাই আরজ আলী মাতুব্বর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব না হয়েও অজপাড়াগাঁয়ে বাস করেও রাষ্ট্রের বিরূপ দৃষ্টিতে পড়েন। দেশদ্রোহী বলে অভিযোগ দিয়ে তাঁকে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়।

সক্রেটিস যেমন বিবেকের প্রভুত্ব ও ব্যক্তিগত খামখেয়ালির উপর ভিত্তি করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহসী হয়েছিলেন, যা তৎকালীন যুগে মানবিক মর্যাদা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল; যে বিষয়টি বর্তমান প্রেক্ষাপটেও মানবকল্যাণের জন্য অপরিহার্য। ঠিক তেমনি বিংশ শতাব্দীকে আরজ আলী মাতুব্বরের মতো আর একজন সৈনিকের আর্বিভাব ঘটেছিল যিনি সাহসী চিত্তে যুক্তির নিরিখে ধর্মান্ধতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার চেষ্টায় রত ছিলেন। ধর্মান্ধতা পুনরুজ্জীবনের পাঁয়তারা, রাজনীতিতে অবাধগতিতে ধর্মের ব্যবহার, পুরাণের অস্বাভাবিকতা, ধর্মের বিধান ও ফতোয়া জারি যখন মানুষকে পঙ্গু করে ফেলতে চায় – তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে এ ধরনের স্বশিক্ষিত এবং আত্মাসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের। কারণ সমাজে এক ধরনের আত্মমর্যাদাবোধ শূন্য উচ্চ শিক্ষিত গোষ্ঠী আছেন যাঁরা বিজ্ঞানবিমুখ ধর্মান্ধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকেন। এভাবে বিজ্ঞান ও যুক্তিকে আড়ালে রেখে প্রযুক্তির ব্যবহার করতে গেলে সৃষ্টি হয় মারাত্মক সাংস্কৃতিক শূন্যতা ও শক্তির অপব্যবহার। তাই সমাজের এ দুঃসময়ে বড়ই প্রয়োজন হয়ে পড়ে আরজ আলী মাতুব্বরের মতো এ ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের। যিনি অত্যন্ত সাহসী চিত্তে একদিকে প্রশ্ন করতে পারেন প্রচলিত বিশ্বাসকে, সন্দেহ করতে পারেন ধর্মের সাথে জড়িত পুরাণকে, অপরদিকে মুক্ত চিন্তাচর্চায় বিজ্ঞানের সাহায্যে শনাক্ত করতে পারেন মানুষের অসীম সম্ভাবনাকে। সক্রেটিসের মতো তিনি আমৃত্যু মুক্তচিন্তা করে গেছেন যুক্তিকে অবলম্বন করে। আধুনিক জগতে মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞানদীপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে বাঙালি জাতি অনেক পিছিয়ে আছে। অন্যের হাবভাব আচার-ব্যবহার, গতিবিধি সমস্তই হুবহু অনুকরণ করার প্রবল ইচ্ছা বাঙালি জাতির মধ্যে জাগ্রত থাকলেও বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ক্ষীণ। কিন্তু কোনো কিছুই বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা না করে গ্রহণ করা উচিত নয়। আর তাঁর জন্য প্রয়োজন মুক্তবুদ্ধির। মুক্তবুদ্ধির দ্বারা বিচার করে গূঢ় সত্য সম্পর্কে বিশেষরূপে নিশ্চিত হয়ে তা গ্রহণ করলে আর ভাববিপর্যয় ঘটে না। বরং উক্ত বিষয় জ্ঞান আরো প্রখর হয়। যুক্তি-বিচার-বিশ্লেণই হলো মৌলিক

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তার জনক ও পরিপোষক,যা মানবকল্যাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আজকের সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আরজ আলী মাতুব্বরের মানবতাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণার্থে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে।

আরজ আলী মাতুব্বর প্লেটোর মতো ভাববাদী না হলেও তারই মতো নৈতিকতার আলোকে মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছেন। আর নৈতিকতা অবশ্যই বুদ্ধিনির্ভর এবং সঙ্গে সঙ্গে মুক্তবুদ্ধি নির্ভর হলেই সেখানে যুক্তির উপস্থিতি থাকবে। ফলে মানুষ লোভ-লালসা বর্জন করে স্বার্থের পরিবর্তে সার্বিক কল্যাণে মনোনিবেশ করবে। আরজ আলী মাতুব্বরের নৈতিকতার কথা বলতে গেলে বলতে হয় তিনি ছিলেন সক্রেটিসের মতো আত্মবিশ্লেষণী, বিচারবাদী, ন্যায়পরায়ণবাদী, নিয়মতান্ত্রিক, সংযমী ইত্যাদি গুণের অধিকারী। সৎ ও সহজ জীবনাচরণের অধিকারী আরজ আলী মাতুব্বর সাদামাটা জীবনযাপন করতেন; সততার ঘাটতি ছিল না একবিন্দুও তাঁর জীবনের কোনো পর্যায়ে। তাঁর মতের সাথে দ্বিমত পোষণকারী ব্যক্তিও তাঁর সততায় মুগ্ধ হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। মানুষ সব কিছু যুক্তির নিরিখে বিচার-বিশেষণ করলে একটি সমাজকে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। প্লেটো যেমন করে যুক্তি ও নীতির উপর ভিত্তি করে দেখেছিলেন একটি আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন, ঠিক তেমনিভাবে আরজ আলী মাতুব্বরও তাঁর দর্শনে যুক্তির নিরিখে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আলোকে একটি সুখী সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর মতে যথার্থ দর্শনের লক্ষ্যবস্তু হবে সত্যের প্রতি আকর্ষণ। ন্যায় ও যুক্তির আলোকে মানবিক মর্যাদা অর্জন করতে পারলে মানুষ লোভ-লালসা বর্জন করে ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে সার্বিক কল্যাণে মনোনিবেশ করতে পারবে। এটাই ছিল আরজ আলী মাতুব্বরের বিশ্বাস। এ হিসেবে তাঁকে পরার্থবাদী নীতিবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। পরার্থবাদ নিজের স্বার্থ ব্যতীত অন্যান্য মানুষের স্বার্থোদ্ধারের কথা ভাবে। আরজ আলী মাতুব্বরের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। গ্রামের কৃষক আরজ আলী মাতুব্বর জনকল্যাণে নিজের যাবতীয় সম্পত্তি ছাড়াও জীবন সায়াহ্নে নিজের দু'টি চোখ এবং মরদেহ দান করে এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আবার উপবাস আর ছিন্নবাস দিয়ে আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন শুরু হলেও তিনি এরিস্টটলের মতো ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন অধ্যয়ন করেছেন। এবং নিয়মিত কৃষিকাজে ব্যস্ত থেকেও রচনা করেছেন ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ।

দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেড়ে ওঠা আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তা-চেতনায় শ্রেণী সংগ্রাম ও সামাজিক বৈষম্যের কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান। তিনি মার্কসের মতো রাজনৈতিক আন্দোলনে কখনো মুখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেননি। তবে তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন, সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদ

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানের একমাত্র উপায়। তাঁর মতে 'শুধুমাত্র রকেট রোবটের ব্যবহার ও স্বর্গ-নরকের দর্শন দ্বারা' মানব সমাজের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অযৌক্তিক।

শোষিত, নির্যাতিত, পিছিয়ে পড়া এক শ্রেণীতে আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম। তাই পিছিয়ে পড়া এই শ্রেণীর মধ্যে আরজ আলী উপলব্ধি করেছিলেন ক্লেদাক্ত মানবতার ক্রন্দন। আরজ আলী মাতুব্বর মার্কসের মতো নৈরাশ্যের পরিবর্তে আশাবাদি দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে অবলোকন করার কথা অনুভব করেন। তাঁর মতে, দরিদ্র শ্রেণী আগেও যাদের দ্বারা শোষিত-নির্যাতিত হয়েছে আজও তাদের দ্বারাই নির্যাতিত হচ্ছে; তাই তিনি এর ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছেন শেকড়সুদ্ধ উপড়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। সমাজের অভ্যন্তরে শিকড় বসিয়েছেন – অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মানুষের মুক্তির দাবিতে। সেই সঙ্গে লড়াই করেছেন কৃষক সমাজের জন্য, দূর করার চেষ্টা করেছেন শ্রেণীর কূপমণ্ডূকতা ও পশ্চাৎপদ জারজীর্ণতাকে। তাঁর *সত্যের সন্ধান* ও অন্যান্য রচনা ওই অনগ্রসর শ্রেণীর সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে, যা চেতনার জগতকে ভেঙ্গে দিয়ে শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটাতে পারে। ফলে মার্কসের মতোই এভাবে আরজ আলী মাতুব্বরকে আগামী দিনের মেহনতি মানুষ স্মরণ করবে, শ্রদ্ধা করবে। ফলপ্রসূ হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরজ আলী মাতুব্বরের চেতনা ও দর্শন।

শতাব্দীকালের দীর্ঘ জীবনে দুটি মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষকারী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল জীবনের কোনো কিছুকে তিনি বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করেননি। তিনি এতই মানবতাবাদী ছিলেন যে, শতাব্দীকালের দুটি মহাযুদ্ধ তাকে ভীষণ বিচলিত করেছিল। তিনি মানবিক আদর্শ ও চিন্তাধারার জন্য বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন। জীবনের কোনো কিছুকেই তিনি বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করেননি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে সরকার তাঁকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করায় তার মনে সাম্যবাদ ও মানবপ্রীতির বীজ রোপিত হল। রাসেল তাঁর সুদীর্ঘ দার্শনিক জীবনে বহু মত ও পদ্ধতি পরিবর্তন করলেও তাঁর মানবতাবাদী আদর্শ সর্বদাই সমুন্নত ছিল।

সমকালীন দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর সময়ের সমাজের করুণ অবস্থা দেখে বিচলিত হন। রাসেলের মতো কোনো কিছুকে সঠিকভাবে গ্রহণ করার জন্য তাঁর মনে ছিল যুক্তিসম্বলিত হাজারো প্রশ্ন। রাসেলের মতো আরজ আলীও যুক্তির মাধ্যমে সমাজের সংস্কার সাধন চেয়েছিলেন। মানুষ সব কিছু যুক্তির নিরিখে বিচার-বিশেষণ করলে একটি সমাজকে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বার্ট্রান্ড রাসেলের জীবনের লক্ষ্য ছিল সন্দেহাতীত সত্যে পৌঁছানো এবং নৈর্ব্যক্তিক পরম সত্য লাভ করা। তাই তিনি তাঁর *The Problems of Philosophy* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, 'এ জগতে এমন জ্ঞান কি আছে – যা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে না।' আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে ডেকার্ট যেমন সংশয়ের মাধ্যমে দার্শনিক

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয়তা খুঁজে পেয়েছিলেন, তেমনি রাসেলও বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণ করতে চাননি। রাসেল মনে করেন, সংশয়মুক্ত সত্য পেতে হলে বিনাবিচারে কোনো কিছুকে গ্রহণ করা ঠিক নয়। এভাবে রাসেলের বিচার-বিশেষণের পদ্ধতির নাম যৌক্তিক বিশেষণ। কোনো কিছুর বিশেষণ ছাড়াও যৌক্তিক সংশেষণেরও প্রয়োজন আছে। যৌক্তিক সংশ্লেষণের সাহায্যে জগতের সামগ্রিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এটাই ছিল রাসেলের ধারণা।

আরজ আলী মাতুব্বরও লক্ষ্য ছিল সন্দেহাতীত জ্ঞান অর্জন করা। রাসেলের মতো আরজ আলী মাতুব্বরেরও প্রশ্ন ছিল এজগতের এমন কিছু খুঁজে বের করা যা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে না। ডেকার্ট সংশয়ের মাধ্যমে দার্শনিক নিশ্চয়তা খুঁজে পেয়েছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বরও সংশয়ের আবরণ ভেদ করে সত্য জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় রত ছিলেন, আর তারই ফলে আরজ আলী যৌক্তিক বিচার বিশেষণ ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণ করতে রাজি নন। ভৌগোলিক আবহাওয়া যেমন মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে, তেমনি যৌক্তিক আবহাওয়া মানসিক স্বাস্থ্যকে দৃঢ় করে। পৃথিবীতে মঙ্গল ও অমঙ্গলের সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন পরমমূল্য ও আদর্শ স্থাপন করা। আর তার জন্য প্রয়োজন যৌক্তিক বিশ্লেষণ, যার ফলে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সমন্বয়ে সৃষ্টি হবে বিশ্বমানবিকতা, যা সমাজের সকল মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এক ঐক্যের আদর্শ স্থাপনে সাহায্য করবে। ফলে যৌক্তিক নিয়মাবলি হবে ব্যক্তিমুক্তি ও সমষ্টি নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সব কিছু যুক্তির নিরিখে বিচার-বিশেষণ করার মাধ্যমেই মানুষ একটি সমাজকে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আরজ আলী মাতুব্বরও রাসেলের মতো তাঁর দর্শনে যুক্তির নিরিখে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আলোকে একটি সুখী,সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই উপলব্ধি থেকে আরজ আলী যৌক্তিক বিচার বিশেষণ ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণ করতে চাননি। সামাজিক বাস্তবতায় আরজ আলী মাতুব্বর ও বর্ট্রান্ড রাসেলকে প্রয়োগবাদী বলে আখ্যায়িত করা যায়। মানবকল্যাণের লক্ষ্যে তাঁদের যৌক্তিকরীতি ও পদ্ধতি ছিল বৈজ্ঞানিক প্রয়োগপদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত , যার সম্পর্কে উভয় দার্শনিক জ্ঞানানুশীলন ও সত্য আবিষ্কারের কথা বলেছেন। উভয়ই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ এবং অন্ধকুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করেছেন। জীবনের মান উন্নয়নে নিরন্তর সংগ্রাম, যুক্তিভিত্তিক জীবন-জিজ্ঞাসা, সংঘাত ও প্রতিকূলতা প্রভৃতি দিক তাঁদের অনেক জীবনাভিজ্ঞতাকে মহীয়ান করেছে।

স্বাভাবিক নিয়মেই দর্শনের ইতিহাসে কোনো এক সময় পুরাকাহিনীর কল্পলোকের মোহাচ্ছন্নতা কাটিয়ে বিচারমূলক চিন্তা ও নানা বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নাবলী জর্জরিত করতে থাকে মানুষের কৌতুহলী মনকে, যেসব প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে 'অস্তিত্ব' বিষয়ক নানা সমস্যার সমাধান দেন মনীষীগন।

Dhaka University Institutional Repository

অস্তিত্ববাদের মূল বিষয় মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব । খ্রিষ্টপূর্ব যুগে দার্শনিক সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান ও আত্ম-বিশ্লেষণের মধ্যে অস্তিত্ববাদের আভাস খুঁজে পাওয়া যায় । উনিশ শতকে কিয়ার্কেগার্ড, নীট্‌শে , হাইডেগার প্রমুখ দার্শনিকগণ অস্তিত্বের স্বাধীনতা তথা মানব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে অস্তিত্ববাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন । তবে বিশ শতকে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অস্তিত্ববাদ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, ফ্রান্সের দার্শনিক লেখক ও ঔপন্যাসিক জ্যাঁ পল সার্ত্রের দর্শনে । সার্ত্রের মতে, অস্তিত্ববাদ প্রত্যেক সত্যে ও প্রত্যেক কর্মে ব্যক্তিসত্তা ও পরিবেশ উভয়কে অনুমিত করে, মানবজীবনকে যে কোনো ভাবে সম্ভব করে তোলার কথা বলে । অস্তিত্ববাদ অমূর্ত দর্শন ও সার্বিক ধারণার পরিবর্তে ব্যক্তিসত্তার উপর বেশি গুরুত্বারোপ করে । অস্তিত্ববাদীদের মতে মানুষের ভাগ্যের নির্মাতা হচ্ছে মানুষ নিজেই । অস্তিত্ববাদ নিঃসন্দেহে মানবতাবাদ । কারণ যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়; তাই এ দর্শন কর্ম ও বাস্তবের দর্শন । অস্তিত্ববাদকে অবশ্যই আশাবাদ বা মানবতাবাদ বলা যেতে পারে ।

অস্তিত্ববাদীরা যুক্তির আলোকেই মানুষের অস্তিত্বের কথা বলেন । আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তা-ভাবনায় যুক্তির আলোকে নিজেকে জানার এক আত্মপ্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় । তিনি একজন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক অভিধায় ভূষিত হন । সার্ত্রের মতো আরজ আলীর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণও মানুষের হাতে । সার্ত্রের চিন্তায় ধ্বনিত হয়েছে বলিষ্ঠ কণ্ঠের বিপ্লবী সুর । সে সুর হলো অস্তিত্ববাদীর সুর, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি মর্যাদার সুর । সে সুরের ভিত্তি হলো নাস্তিকতা যা নীট্‌শের 'ঈশ্বর মৃত' সুর থেকে আরও অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও তীব্র । 'ঈশ্বর মৃত' বললে মনে হয় ঈশ্বর কোনো এক সময় জীবিত ছিল । কিন্তু সার্ত্রের কাছে ঈশ্বর কোনো কালে জীবিত ছিল না – ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারে না বা যদি থেকেও থাকে তাতে কিছু আসে যায় না, মানুষের কাছে সে-ঈশ্বর দুর্বল, নগণ্য, নিষ্ক্রিয় ও অপ্রয়োজনীয় । আরজ আলী বর্ণিত ঈশ্বর ও প্রকৃতি অভিন্ন একাকার ।

সার্ত্রের মতো আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনেরও মূল কথা হলো, সত্তার মূল হচ্ছে মানুষ নিজে । স্বাধীন ভাবে মানুষ তার মধ্যে নিজ সত্তাকে উপলব্ধি করে । ব্যক্তি জড় পদার্থ নয় বরং সজীব ও সচেতন অস্তিত্বশীল জীব হিসেবে সে শির উন্নত করে দাঁড়াবে । এখানে সার্ত্রে মনুষদেহধারী মন বা প্রাণবিশিষ্ট 'আমি' সত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । আরজ আলী মাতুব্বরও প্রাণ ও মনের অস্তিত্ব যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ করেন মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে । আরজ আলী প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণের মাধ্যমে 'আমি' সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন । কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হলে অবশ্যই ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ থাকতে হবে । যার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ নেই তার অস্তিত্ব স্বীকার

Dhaka University Institutional Repository

করার কোনো যুক্তি নেই। এভাবেও আরজ আলী 'আমি' সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন, যা মানবিক মূল্যবোধ তৈরি করে।

সার্ত্রের মতে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। সার্ত্রে সবার উর্ধ্বে মূল্য দিয়েছেন মানুষকে, তাঁর ব্যক্তিত্বকে, স্বাধীনতাকে, মানবিক মর্যাদা ও মূল্যবোধকে। তিনি এমন একটি পৃথিবী বা সমাজের কথা চিন্তা করেছেন যা হবে ঈশ্বরবিহীন, অস্তিত্ববাদী ও মানবতাভিত্তিক। আরজ আলী মাতুব্বর ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উথাপন করেন। মানুষের মনোজগতে ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করবার ক্ষেত্রে অস্বস্তি এবং ভয় কাজ করে। তবে আরজ আলীর বিশিষ্টতা এখানে যে, তিনি এই অন্ধকার বলয় থেকে বেড়িয়ে এসেছিলেন এবং অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

পৃথিবীতে কোনো মানুষই প্রতিবাদী বা বাস্তববাদী হয়ে জন্ম গ্রহণ করে না। সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে তাঁরা প্রতিবাদী হয়। এমনি ভাবে ভিন্নধর্মী দুটি সামাজিক আঘাত আরজ আলী ও সার্ত্রের জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে জীবনমুখী দার্শনিক জ্যাঁ-পল সার্ত্রের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফরাসীদের জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণেই সম্ভবত তিনি ভাববিলাসি না হয়ে জীবন ভিত্তিক দার্শনিক হয়েছেন। অপরদিকে ধার্মিক মাতার ছেলে আরজ আলী মাতুব্বর মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিধানের প্রবল দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হন। যার ফলে ঘটে তাঁর সত্যের সন্ধানের হাতে খড়ি। ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতাকে প্রমাণ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত করা। সার্ত্রের মত তাঁরও লক্ষ্য ছিল মানুষকে তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

আরজ আলী মাতুব্বর আস্তিক্যবাদের ঈশ্বর বা সৃষ্টির ধারণাকে প্রধান হিসাবে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। আস্তিক্যবাদের মতে, এক দিকে মানুষ হলো ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, অন্যদিকে আবার অতিজাগতিক বা ঐশ্বরিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই আরজ আলী মাতুব্বরের মুক্তমন আস্তিক্যবাদের এ কথা মানতে রাজী নয়। কারণ তাঁর মতে, বোবা লোকেরও কল্পনা শক্তি আছে, মুখে কিছু বলতে না পারলেও সে বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বোবার সেই ভাবসমূহের অভিব্যক্তি ঘটে তাঁর কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে। সার্ত্রের মতো আরজ আলীও চেয়েছেন মানুষের মনে যে স্বাধীনতার বীজ লুকায়িত আছে, সে সম্পর্কে মানুষ সচেতন হোক। আরজ আলী মাতুব্বর ও সার্ত্রের চিন্তা-চেতনায় ছিল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, প্রত্যয়ী এবং দৃঢ়চেতা মনোভাব। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো ছিল তাঁদের সহজাত গুণ। উভয়ের দর্শনই ছিল দায়িত্বশীলতা ও মানবতার দর্শন। এবং জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে উভয়ই ছিলেন স্বোচ্চার। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বর ও সার্ত্রে একই সৌরজগতের এমন দুই ব্যক্তিত্ব যাঁরা হবেন অনাগত ভবিষ্যতের জন্য অনুকরণীয়।

সমকালীন কয়েকজন বাঙালী দার্শনিক তত্ত্বালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব ও জীবনমুখী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা কোনো কিছুকেই যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ না করে গ্রহণ করেননি। সমকালীন বাঙালী দার্শনিকরা মানুষের প্রয়োজনে মানব কল্যাণের কথা বলেন। বাংলাদেশে বেগম রোকেয়া, মানবেন্দ্রনাথ রায় ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ সমকালীন দার্শনিকদের মানবতাবাদী দর্শনের সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের মানতাবাদী দর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় একথা প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যেকেই জীবনমুখী ও জনসাধারণের কল্যাণার্থে কথা বলেছেন। বেগম রোকেয়া জীবনমুখী আলোচনা করেছেন নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে। মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, বিশ্বপরিস্থিতিতে মানবকল্যাণে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহাত্মক কথা বলেছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। এর মধ্য দিয়ে আরাধ্য মানবকল্যাণের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনের সঙ্গে এই দার্শনিকদের মুক্তি-অন্বেষী আলোচনা বাঙালির চেতনায় নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করবে।

সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত বেগম রোকেয়া ও আরজ আলী মাতুব্বর দু'জনেই সাধারণ লোক ও নির্যাতিত নিপীড়িত লোকের কথা বলেন। বেগম রোকেয়া এবং আরজ আলী মাতুব্বর উভয়ের লক্ষ্য ছিল মানুষকে আত্মসচেতন করা। রোকেয়ার লক্ষ্য ছিল নারীর জীবন স্ব-নিয়ন্ত্রিত করা। আরজ আলী মাতুব্বরও সমাজে প্রচলিত অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার কথা বলেন। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও মুক্তচিন্তার শক্তির মাধ্যমেই একমাত্র ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস বর্জন করার কথা বলেন।

বেগম রোকেয়া এবং আরজ আলী মাতুব্বর উপলব্ধি করলেন কায়েমী স্বার্থ রক্ষার্থে ভোগবাদী লোকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কায়েমী স্বার্থ রক্ষার্থে অদৃষ্টবাদের ভূমিকা অত্যন্ত প্রকট। তাঁদের প্রতিবাদ ছিল অদৃষ্টবাদ বর্জনের লক্ষ্যে এবং অদৃষ্টবাদ বর্জনের মাধ্যমেই তাঁরা ভাল মন্দ নির্বাচন করার ক্ষমতার ওপর আস্থা রেখেছেন। বেগম রোকেয়া এবং আরজ আলী মাতুব্বর উভয়ই নিজের চেষ্টায় জ্ঞানীগুণী হয়ে ওঠেছেন। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন। ফলে কায়েমী স্বার্থের বিরোধী হওয়া তাঁদের পক্ষে ছিল খুবই স্বাভাবিক। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ ছিল আরজ আলী মাতুব্বরের আত্মার আত্মীয়। কারণ তিনি নিজেও ছিলেন একজন কৃষক। তবে তিনি তাঁদের দলবদ্ধ করে শ্রেণী সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব, বংশগতি, সভ্যতার গতি ও বিকাশ এবং বিভিন্ন ধর্মের মতবাদ। আরজ আলী

Dhaka University Institutional Repository

মাতুব্বরও বেগম রোকেয়ার মতো, লেখনীর মাধ্যমে মত বিরোধীদের সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত ছিলেন। জনগণের সাথে সরাসরি কথোপকথনের প্রয়োজন ছিল – কিন্তু তা আরম্ভ করেই বিপদগ্রস্থ হন, উপহার পান হাজতবাস। ফলশ্রুতিতে কলমের বন্ধনেই তাঁর কথোপকথন আবদ্ধ করেন।

আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের যাকিছু অশুভ ও অমঙ্গল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। তবে বিশ্বব্যাপী যে পরিবর্তন চলছে তা' সফল করতে হলে প্রয়োজন যুক্তি এবং আদর্শ, যা সকল নারীপুরুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকা উচিত। এ প্রচ্ছন্নতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার আলোকবর্তিকা যা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি বেগম রোকেয়া ও আরজ আলী মাতুব্বরের মধ্যে। যে মানুষ জগৎ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত তীক্ষ্ণ-প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে পারেন এবং যার চিন্তার স্বচ্ছতা সব কিছুকে কাটিয়ে উঠতে পারে সে মানুষইতো অনুকরণীয়। এই দুই দার্শনিকের জীবনকর্ম সীমিত হলেও তাঁদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সৃষ্টির দিশা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি মুক্ত থাকা, ইহজাগতিকতা, বিজ্ঞান মনস্কতা ও গণসম্পৃক্ততা। বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা সমস্যার প্রেক্ষিতে তত্ত্ব-চর্চা, বিনয়, শিক্ষাগ্রহণে অকুণ্ঠ হওয়া, প্রচলিত বিশ্বাসকে প্রশ্নাতীতভাবে মেনে না নেওয়া, সহজবোধ্যতা ইত্যাদি নানা দিক থেকে আরজ আলী অনুস্মরণীয়।

মানবেন্দ্রনাথ যেমন, তাঁর (বিভিন্ন সূত্রে) বলেছেন মানুষই সমাজের মূল আদর্শ, ব্যক্তির বিকাশই সমাজ প্রগতির একমাত্র মাপকাঠি এবং ব্যক্তিমানুষের কল্যাণের মধ্যেই সমষ্টির কল্যাণ নিহিত। আরোজ আলী মাতুব্বরও এভাবে ব্যক্তিসত্তার মর্যাদার কথা বলেছেন। 'মানুষ সবকিছুর পরিমাপক' (প্রোটাগোরাস) অথবা 'মানুষই মানবজাতীর মূল' এইআপ্তবাক্যকে কেন্দ্র করে আরজ আলী মাতুব্বর ও মানবেন্দ্রনাথ রায় মুক্তবুদ্ধি, নীতিনিষ্ঠ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় মুক্ত মানুষের সমবায়ে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সমবায়িক রাষ্ট্ররূপে জগৎকে দেখতে চেয়েছেন। চিন্তাশীল মানুষই হচ্ছে এই জগতের স্রষ্টা। স্বাধীনতার বৈপ্লবিক দর্শনের কাজ হচ্ছে এ ঐতিহাসিক সত্যটির গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা। কারণ, মানুষ যদি নিজেদের সৃষ্টি ক্ষমতায় সচেতন হতে পারে, চিন্তাক্ষেত্রে নতুন নতুন অভিযানে অনুপ্রাণিত হয়, নতুন জগত গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয়ের আশা পোষণ করে, এবং স্বাধীন মানুষ নিয়ে এক স্বাধীন জগত গড়ে তোলার বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয় – তা'হলেই তৈরী হবে স্বাধীন সমাজ গঠনের অনুকূল পরিবেশ। একমাত্র ক্ষমতাবান মুক্তবুদ্ধির মানুষের পক্ষে সম্ভব গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে সকলের জন্য স্বাধীনতা আনা।

আরজ আলী মাতুব্বর ও কাজী নজরুল ইসলাম উভয়েই সব সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির উর্ধ্বে থেকে জাগতিক যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরন্তর সাধনায় রত ছিলেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে

Dhaka University Institutional Repository

জানতেন যুক্তির জগতে কোনো গোঁড়ামির স্থান নেই। যুক্তিবাদী মানুষ কখনো অনৈতিক হতে পারে না; যার ফলে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারকল্পে তাঁরা অন্যায় ও অযৌক্তিক কোনো কাজ সমর্থন করেননি। এ দুই দার্শনিক সামাজিক বৈষম্যকে কখনো মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি; সামাজিক বৈষম্য তাঁদের কাছে অত্যন্ত অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে। সামাজিক বৈষম্যের কারণে একটি সমাজ পঙ্গু ও অকর্মণ্য হয়ে যায় – আর সমাজের অস্বাভাবিক উঁচু-নিচুর কারণেই বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এ বৈষম্যের সমাধানকল্পে উভয়েরই লক্ষ্য ছিল শোষণহীন সমাজের। তাঁরা প্রমাণ করে গেছেন একটি সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত ও আলোকিত করার একমাত্র উপায় জ্ঞান। যদি বিশ্বের জনসাধারণ দার্শনিক যুক্তি দ্বারা ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং তাকে নৈতিক ও নান্দনিকরূপে গ্রহণ করে; তাহলেই মানুষ অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, ভেদবুদ্ধিও সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত হবে। তাই জীবনানন্দ দাসের একটি কথা এখানে বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য: 'নীতিকে ধর্ম মনে করতে পারলে এবং পৃথিবীকে সেইসঙ্গে মোটামুটি ধার্মিক দেখাতে পারলে তৃপ্তিবোধ করা যায়; এভাবে দর্শন নান্দনিক এবং একই সঙ্গে সুখময় হবে।' সুখ শান্তিতে বাস করার মধ্যে তৃপ্তি আছে, এই তৃপ্তিটুকু নিয়েই বিশ্বের প্রতিটি মানুষ বাঁচতে চায়, বাঁচার অধিকার চায়। এ চাওয়ার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই, লুকোচুরি নেই; আছে যৌক্তিক অনুসন্ধান।

সামাজিক বাস্তবতায় এ দুই দার্শনিককে প্রয়োগবাদী বলে আখ্যায়িত করা যায়। যেমন মানব কল্যাণের জন্য তাঁদের যৌক্তিক নীতি ও পদ্ধতি ছিল বৈজ্ঞানিক প্রয়োগপদ্ধতি ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার সমর্থনে এই দুই দার্শনিক সর্বদা জ্ঞানানুশীল ও সত্য আবিস্কারের কথা বলেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ, অন্ধকুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম, জ্ঞানের জন্য অপ্রতিরোধ্য অনুসন্ধান করে – এ দেশের জনগণের মুক্ত চিন্তার বিকাশে তাঁরা অপরিসীম অবদান রেখেছেন।

সমকালীন বাংলাদেশের সমাজ সংস্কারক ও দার্শনিক বেগম রোকেয়া, এম.এন রায় ও কাজী নজরুল ইসলামের মতো ব্যক্তিত্ব – যারা নতুন স্বাধীন সমাজ গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে যাদের আচরণ যুক্তিনির্ভর ও নীতিসম্মত; আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন নিঃসন্দেহে তাঁদের সকল উত্তরসূরি। তাঁদেরই মতো আরজ আলী মাতুব্বর সমগ্র বিশ্বকে এক মানবতাবাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ দেখতে চেয়েছিলেন।

আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয় কুমার দত্ত শতাব্দীর ব্যবধানে থেকেও তাঁদের সময়কার বাঙালির অন্তর্লোকে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছিলেন; যদিও বাংলাদেশে এবং বাঙালির অন্তর্লোকে এ দুই দার্শনিকের সুগভীর প্রভাব এবং তাঁদের চিন্তা ও মননের বিচিত্র সমৃদ্ধি সম্পর্কে তেমন কোনো অনুসন্ধান হয় নাই। তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান ধারণার অতিস্বল্পভাবে বুদ্ধি, মানবপ্রেম ও বৈজ্ঞানিক

Dhaka University Institutional Repository

চেতনার উন্মোধন লক্ষ্য করা যায়। বাঙালি জাতি তাতে বিস্মিত হয়েছেন কিন্তু তেমন একটা অনুপ্রাণিত হননি। কারণ বুদ্ধির সাথে মনের সমানুপাতিক হারে মিল না হলে বাঙালি জাতি তা গ্রহণ করতে চায় না। এ দুই দার্শনিক বুদ্ধির আলোকে বাঙালির অন্তরে বহু শতাব্দীর লালিত জড়তাগ্রন্থিকে ছিন্নভিন্ন করতে চেয়েছিলেন। সাধারণ বাঙালি এই সমাজ বিপ্লবীদের দূর থেকে সম্মান করেছেন, কখনো বা অবজ্ঞা করেছেন, আবার বুদ্ধির নিরন্তর সত্যকে লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু তবুও তাঁদের সুমহান বাণী সাধারণ মানুষ তাঁদের অন্তরে কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে বা ঠাঁই দিতে পারেননি। আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয়কুমার দত্ত সমাজের বাঙালির আজন্ম লালিত সংস্কারের ওপর বজ্রাঘাত করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সামাজিক নিগ্রহও সহ্য করতে হয়েছিল। লোকাচারের পরম শত্রু এদেরকে এক শ্রেণীর বাঙালি, অন্তরে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা জড়তাগ্রস্থ বাঙালির চিত্তে উজ্জ্বল সূর্য কিরণের মতো তীব্র বুদ্ধিবাদী চেতনাকে জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছিলেন। মুক্তবুদ্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আত্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব, বুদ্ধির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা আবিস্কার এবং বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা দ্বারা জগৎ ও জীবনকে বিচার করা। আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙালি জাতিকে এক নব্য বুদ্ধিভত্রে দীক্ষা দিতে চেয়ে ছিলেন। তাঁরা উভয়েই ধর্মীয় শাস্ত্রনিষ্ঠাকে স্বীকার না করে যুক্তিপন্থাকে মূল আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, চিন্তা ও কর্মের একমাত্র নিয়ামক হলো যুক্তিবাদ এবং সেই অনুসারে জীবনের প্রতিটি প্রতীতিকে বিচারে আগ্রহী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে যুক্তিবাদের মূল সূত্রই হলো যুক্তিসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় যা একটি আদর্শ জীবন তৈরি হতে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আরজ আলী মাতুব্বর ও অক্ষয় কুমার দত্ত যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। ধর্মচিন্তার ক্রমঅভিব্যক্তিতে তাঁদের দর্শন সরাসরি প্রকৃতিবাদী ও নিরীশ্বরবাদী হিসেবে পরিচিত। মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিজ চেষ্টায় জ্ঞান লাভ করে যে ,কত বড় হতে পারে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ হচ্ছে উপমহাদেশের এ দুই দার্শনিক। তাঁরা উভয়ই যুক্তিবাদী, সংস্কারমুক্ত, বিজ্ঞানপ্রেমী, সত্য অনুসন্ধানী এবং মানবতাবাদী; যাঁদের প্রয়োজনীয়তা সর্বযুগে, সর্বদেশে কোনোদিনই ফুরাবে না এবং যাঁদের সহনশীলতাবোধ সম্পর্কিত দর্শন ক্ষণে ক্ষণে উদ্বুদ্ধ করবে এ ক্ষণজন্ম মনীষীদ্বয়দের। তদুপরি বর্তমান বিশ্বেও যেসমস্ত পরিবারের সন্তানরা অভাব অনটনে কালাতিপাত করছে তাঁরা হয়তো এ দুই ব্যক্তিত্বের বাল্য জীবনের দিকে আলোকপাত করলে আশ্বস্ত হতে পারবে এবং সে সংগে পাবে প্রবল অনুপ্রেরণা যা তাঁদের জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিতে সহায়ক হবে। নিয়ে যাবে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষয়কুমার দত্ত মানবতাবাদের প্রমাণ করতে গিয়ে ধর্মকে যুক্তিনিষ্ঠ ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে গানিতিক সমীকরণের সাহায্যে প্রার্থনার অসারতা প্রমাণ করেন, তেমনি আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনেও এ ধরনের একটা সমীকরণ খুঁজে পাওয়া যায়, যা কেবলমাত্র মানবতাবাদেরই মূলমন্ত্র। আরজ আলী মাতুব্বর বিজ্ঞানভিত্তিক সত্যজ্ঞানের অনুসন্ধান করে ধর্মাচারের অসারতা প্রমাণ করেন এবং বাঙালি জাতিকে নতুন চিন্তা-চেতনা, মত ও পথ ইত্যাদি দিক থেকে নির্মাণ করার প্রচেষ্টা করেন। অক্ষয় কুমার দত্তের মতো আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী পুরুষ।

কালের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করে আরজ আলী মাতুব্বর ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো এ দুই দার্শনিকের শিক্ষাজীবন ছিল প্রতিবন্ধকতামূলক; বিশেষ করে আর্থিক অভাব অনটনের ক্ষেত্রে। তবুও শিক্ষার্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং জীবনদর্শন চর্চায় কেউ থেমে থাকেননি। আরজ আলী মাতুব্বর দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সমকালীন মানবতাবাদী চিন্তাধারার এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। আরজ আলী মাতুব্বর এতই দরিদ্র ছিলেন যে, কোনো স্কুল কলেজে বিশেষ পাঠ করেননি; সেকেলে গ্রাম্য পাঠশালায় দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করেছেন। স্বকীয় অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় *সত্যের সন্ধান* আর *সৃষ্টির রহস্য* নিয়ে গবেষণা করে চরম ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মতো তিনি তাঁর জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার সাথে জড়িত ছিলেন।

আরজ আলী মাতুব্বর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো হিতবাদী দার্শনিক ছিলেন। হিতবাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য হলো মানব স্বীকৃতি। হিতবাদী দর্শনের লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষ যাতে মানুষকে নিয়ে ভাবতে পারে। হিতবাদী আন্দোলনের আদর্শ হলো, শাস্ত্রীয় কুসংস্কার, অনাচার ও অবাঞ্ছিত দেশাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করা এবং সেই সঙ্গে সামাজিক নিপীড়ন ও সাধারণ মানুষকে সমাজের উচ্চশ্রেণীর অত্যাচার, নির্যাতনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। হিতবাদী দর্শনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে মুক্ত ব্যক্তিসত্তায় উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবন জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করে জীবন চর্চায় মানুষকে অন্বিত করা, যাতে মানুষের সামাজিক এবং জাগতিক সম্পর্ক ত্বরান্বিত হয়। আরজ আলী মাতুব্বর জীবনের মৌলিক বিষয়গুলোকে বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন – যা মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

অপরদিকে আরজ আলী মাতুব্বরও ইহজাগতিকতা এবং মানবতাবাদে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে সমাজ সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জীবদ্দশায় আরজ আলী মাতুব্বর স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের যোগ দেন। তিনি এতই মানবতাবাদী ছিলেন যে, মানবকল্যাণে নিজের যাবতীয় সম্পত্তি দান করে যান। অধিকন্তু নিজের চোখ ও মরদেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীদের জন্য দান করে নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এক ব্যতিক্রমধর্মী ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দেন। লানচরি গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী আরজ আলী মাতুব্বর আনুষ্ঠানিক ব্যাতিক্রমধর্মী শিক্ষাব্রতী ধর্মাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করে বিদ্রোহী হয়ে রইলেন জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত। স্বশিক্ষিত হয়েও জ্ঞানের স্রোতস্বীণী ধারায় ছিলেন অসীম শক্তির অধিকারী। মানবতার মাপকাঠিতে আরজ আলী মাতুব্বর মানবকল্যাণে নিজ দেহ ও চক্ষুদানসহ, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, কবিতা ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর রচনার জন্য তিনি মানব সমাজকে ঋণী করে গেছেন।

এ কথা সত্য যে, আরজ আলী মাতুব্বর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আগেও অনেক মানবতাবাদী বাঙলায় জন্মগ্রহণ করেছে। নবযুগের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন মানবতাবাদী। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরের লোকের সঙ্গে অবতরণ করে সাধারণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা ও ব্যথা-বেদনার সাথে নিজেদেরকে একাত্ম করার সুযোগ পাননি। যেমনটি পেয়েছিলেন আরজ আলী মাতুব্বর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করে বলেছেন:

> সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে
> মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ায় প্রাঙ্গনের ধারে;
> ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিলো না একেবারে।
> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐকতান।

এ দুই দার্শনিক সমাজের প্রতিকূল অবস্থাতেও ব্যক্তিসত্তাকে নির্বাসিত করেননি। যথার্থ মানবতাবাদী তাঁরাই, যারা ব্যক্তি-স্বাধীনতায় স্বীকৃতি এবং ব্যক্তিসত্তার প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের মূল্যায়ণ করে। আত্মমর্যাদা জ্ঞানকে তাঁরা বিন্দুমাত্রও ক্ষুদ্র হতে দেননি। এ দার্শনিকদ্বয়ের মানবতাবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো যুক্তিবাদ। তাঁরা মানুষের মনে এমন এক স্বচ্ছ যৌক্তিক চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন যে চিন্তা শক্তি হবে সহজ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন। যার ফলে মানুষ নিজে কুসংস্কারমুক্ত হওয়ার পথ খুঁজে পাবে, বেড়িয়ে আসতে পারবে অন্ধকারের বলয় থেকে, আলোকিত হবে সমাজ।

সমাজের নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মানসিকতা নিয়ে বিংশ শতকে যদি আরো কিছু বাঙালি মানবতাবাদী জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে বাঙলার নবজাগরণের ইতিহাস, নিঃসন্দেহে অন্য এক নবতর স্রোতধারায় প্রবাহিত হতো। মানবিক করুণায় আপ্লুত হয়ে এ দুই দার্শনিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। যুক্তিবাদী মনই তাঁদেরকে আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলে। এদিক থেকে বিচার করলে উভয় দার্শনিক একই সঙ্গে যুক্তিবাদী এবং বাস্তববাদী, তাঁদের কাছে সামাজিক বৈষম্য অত্যন্ত অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে। তাঁরা স্পষ্টতই

Dhaka University Institutional Repository

উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সামাজিক বৈষম্যের কারণে একটি সমাজ পঙ্গু ও অকর্মণ্য হয়ে যায়, আর সমাজের অস্বাভাবিক উঁচু নিচুর কারণেই এ বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। মানুষকে কতখানি ভালোবাসতে পাড়লে সামাজিক বিধি নিষেধের বেড়াজাল অতিক্রম করা যায় তা তাঁদের দর্শনে সহজেই প্রতীয়মান। এ দুই দার্শনিক সমাজের প্রতিকূল অবস্থাতেও ব্যক্তিসত্তাকে নির্বাসিত করেননি। যথার্থ মানবতাবাদী তাঁরাই, যারা ব্যক্তি-স্বাধীনতায় স্বীকৃতি ও ব্যক্তিসত্তার প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের মূল্যায়ণ করে এবং আত্মমর্যাদাজ্ঞানকে তাঁরা বিন্দুমাত্রও ক্ষুন্ন হতে দেয়না। এ দার্শনিকদ্বয়ের মানবতাবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো যুক্তিবাদ। তাঁরা মানুষের মনে এমন এক স্বচ্ছ যৌক্তিক চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন যে চিন্তা শক্তি হবে সহজ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন। যার ফলে মানুষ নিজে কুসংস্কারমুক্ত হওয়ার পথ খুঁজে পাবে, বেড়িয়ে আসতে পারবে অন্ধকারের বলয় থেকে, আলোকিত হবে সমাজ।

বিংশ সতাব্দীর ইতিহাসে আরজ আলী মাতুব্বর ও গোবিন্দ চন্দ্র দেব – এ দুই জ্ঞানতাপস ছিলেন অসাম্প্রদায়িক,মানবতাবাদী ও মুক্ত মনের দার্শনিক। তাঁরা ছিলেন জীবন সংগ্রামের সৈনিক এবং সেই সঙ্গে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা এবং তার সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দেশক অর্থাৎ উভয়ের লক্ষ্য ছিল জীবনদর্শন। তাঁদের দর্শনের মূলমন্ত্র ছিল এক নিরাপদ, অভাবমুক্ত, স্বাস্থ্যোজ্বল মানুষের জন্য পৃথিবী গড়ে তোলা। জনগণের মধ্যে নৈতিক, ধর্মীয় ও মানবিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে পৃথিবীকে ভবিষ্যত মানুষের জন্য বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা; যাতে সকল সুস্থ মানুষ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দ্বন্দ ও যুদ্ধমুক্ত বিশ্বে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। সেদিক থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ দুই দার্শনিকের দর্শন মানবজীবনের কল্যাণার্থে আদর্শিক হাতিয়ার হিসেবে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। এ কারণে অনাগত ভবিষ্যতে তাঁদের দর্শন ও চিন্তাধারা গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করতে সহায়ক এবং অণুপ্রেরণা জোগাবে। আরজ আলী মাতুব্বর ও গোবিন্দচন্দ্র দেব মানবতাবাদী জীবনদর্শনের লক্ষ্যেই নিবেদন করেছেন চিন্তা, চেতনা ও সমগ্র জীবন সাধনা।

বিশ্বে আজ বিরাজ করছে অশান্তি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদপুষ্ট সমকালীন মানুষ আজ হারিয়ে ফেলেছে বহুযুগের লালিত মূল্যবোধসমূহ। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আজ সব দেশের সব মানুষ অসহায়। মানুষ নিপতিত হচ্ছে সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে। এ মুহূর্তে বড়ই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এ দুই দার্শনিকের জীবনদর্শন অনুসরণ করা। তাহলে অন্তত পৃথিবীর বুক থেকে সবরকম সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটবে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ বাস করতে পারবে নিশ্চিত নিরাপত্তা ও অনাবিল সুখ-শান্তিতে। গোবিন্দ চন্দ্র দেব যেমন মানবজাতির কল্যাণার্থে বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকবাদের সমন্বয় সাধন করেছেন, আরজ আলী মাতুব্বরও পৃথিবীতে

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত সব ধর্মের স্বীকৃত যে মতবাদ মানবতা তার সমন্বয় করেছেন। তাঁর ভাষায় মানবতাই হবে আগামী দিনের মানুষের আন্তর্জাতিক ধর্ম তথা মানবধর্ম।

ওপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে,দর্শনের ইতিহাসে মানবতাবাদীর ধারা সর্বকালে সর্বযুগে বিরাজমান। জগত ও জীবন সম্পর্কিত সমস্যার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যায়, এক বিশেষ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের চিন্তা চেতনার বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে দর্শনের ইতিহাসে মানবতাবাদীর ধারা সূচিত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ট শতকের পূর্ব থেকে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে গ্রিক দার্শনিকগণ মানবতাবাদের যে ধারাটি সূচনা করেছিলেন, বিজ্ঞানের উন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীতে আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনেও সে ধারাটিরই চরমরূপ পরিলক্ষিত হয়। এ থেকে বলা যায় যে জগত ও জীবন সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় মানবতাবাদের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে। এছাড়া উনিশ ও বিশ শতকের অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, প্রয়োগবাদ, বিশ্লেষণী দর্শন, এমনকি বিশশতকের আপেক্ষিকতাবাদী বৈজ্ঞানিক মতবাদও আরজ আলী মাতুব্বরের দ্বারা উত্থাপিত মানবতাবাদী প্রশ্নকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়নি।

আরজ আলী মাতুব্বর যুক্তিবাদের জন্মদাতা নন। তবুও প্রত্যেক যুক্তিবাদী স্বীকার করবেন সমাজের চারিদিকে যেভাবে অন্যায়ের বিষবৃক্ষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাকে সমূলে বিনাশ করতে হলে আরজ আলী মাতুব্বর মতো দার্শনিকের রোপিত যুক্তিবৃক্ষর অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বের সকল মানুষের যুক্তি ও চৈত্তিক বিকাশের জন্য। কারণ সমাজ সংস্কারকের অমৃতবাণীর জীবনীশক্তি কখনো বিলুপ্ত হয় না এসং সেই সঙ্গে যুক্তি, নৈতিকতা প্রভৃতিকেও একে অপরের কাছ থেকে আলাদা করা যায় না। যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিকগণ যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানকে এক করে সঠিক তথ্য বা সত্যানুসন্ধান করেছিলেন আরজ আলী মাতুব্বরও তেমনি যুক্তি ও বিজ্ঞানকে সুসমন্বিত করে সত্যানুসন্ধান করেছেন মানবকল্যাণের লক্ষ্যে এ অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তবে এ কথা স্বীকার্য যে, যে কোনো বড় মাপের দার্শনিক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, যুক্তিবিদ ও প্রবন্ধকারকে যথার্থভাবে জানতে গেলে তাঁকে তাঁর সমসাময়িক যুগে বিচার বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ যুগ ও পারিপার্শ্বিকতাকে অগ্রাহ্য করে কোনো প্রতিভাকেই সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। তাই যুগকে অস্বীকার করার অর্থই হলো তাঁর সিদ্ধ প্রতিভার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। তাই আরজ আলী মাতুব্বরের মানবপ্রেম ও বিজ্ঞানচেতনা সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে তাঁর যুগপরিবেশ তথা তাঁর যুগধর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। অবশ্য কালজয়ী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব অতি সহজেই যুগের সবকিছুকে আত্মস্থ করতে সক্ষম হন এবং নিজশক্তি বলে যুগের প্রভাব প্রতিপত্তিকে অতিক্রম করে যুগোত্তর হয়েই অবস্থান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বশিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক আরজ আলী মাতুব্বর আপোসহীন প্রতিবাদ করে গেছেন সমাজে পুঞ্জীভূত কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। মানুষের চিন্তা-চেতনায় আঘাত করে মুক্ত চিন্তার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। বহুকাল বিস্মৃত অতীত ও স্বকালকে ব্যক্তিগত অনুধ্যানের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করে ভবিষ্যতের দিকে শুধু তাঁর প্রজ্ঞাকে নিবেদনই করেননি বরং ভবিষ্যত ও তাঁর জীবন ভাবনায় মূর্ত করে তুলেছেন এবং সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। আরজ আলী মাতুব্বরের বিচরণ শুধু দুইকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তিনকালব্যাপী। তাঁকে আমরা ত্রিকালদর্শী দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ এ কথা অনস্বীকার্য যে, কালজয়ী প্রতিভা কখনো শুধু স্বকালে বা নিজ কালের বলয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। বরং তা নিজ শক্তিবলে নিজ কালের গণ্ডি অতিক্রম করে কখনো ধূসর অতীত বা কখনো অচেনা, অদেখা, অনাগত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হয়। আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা-চেতনায় অবস্থান করে বিজ্ঞানচেতনা ও মানবপ্রেমের অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে সমানভাবে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছেন।

আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন এমন একজন দার্শনিক যিনি কোনো প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না করেও একজন যুক্তিবাদী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। সামাজিক পরিবেশের প্রভাবই তাঁকে যুক্তিবাদী ও জীবননুখী হতে বাধ্য করেছে। অন্ধকুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার বিপক্ষে ছিল তাঁর ধ্যানধারণা। আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর দর্শনে যুক্তির নিরিখে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আলোকে একটি সুখী সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। মানুষের মধ্যে সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের আদর্শসহ যুক্তির নিরিখে চিন্তার ফলই হলো বর্তমান সভ্যতা। বিংশ শতাব্দীতে আরজ আলীর চিন্তাধারার প্রতিটি স্তরে রয়েছে যৌক্তিকতার পরশ। এ কারণে বাঙালির দার্শনিক চিন্তায় তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তাধারার সৃজনশীল প্রতিভায় স্পষ্টতা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং সৃজনশীল কোনো প্রতিভাই স্বয়ম্ভূ নয়। প্রতিভাবানদের প্রতিভা উন্মেষের ক্ষেত্রে তাঁর পরিবেশ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবপরিমণ্ডলে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সৃজনশীল বিচারশক্তি এগুলো হতে তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তির মাধ্যমে সমৃদ্ধিশালী হয়ে গড়ে ওঠার ক্ষেত্র তৈরি করার সুযোগ পেয়ে থাকে। তাঁর ব্যাপকতা এবং উন্নতি যতই উচ্চ মার্গে অধিষ্ঠিত হোক না কেন, একটি বিশেষ যুগ ও পরিবেশের কাছেই মূল ঋণ হিসেবে ঋণজালে আবদ্ধ হতে হয় মনের অগোচরে। আরজ আলী মাতুব্বর মুক্তবুদ্ধির চিন্তা-চেতনায় যুগ পারিপার্শ্বিকতাকে অনেক ক্ষেত্রেই অতিক্রম করেছেন। তবে নারীর বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করতে পারেননি। এক্ষেত্রে প্রভাত কুমার

Dhaka University Institutional Repository

মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখ্য, "বংশ ও স্থানের প্রভাব আমরা যেমন সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতে পারি না, কালের প্রভাবকেও তেমনি না মানিয়া লইলে চলে না।"[১]

আরজ আলী মাতুব্বরের জন্মক্ষণে কাল-ধর্মে বিরাজমান ছিল বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত। যুগ তাঁর ব্যক্তিমানস তথা মুক্তবুদ্ধির চেতনায় নিঃসন্দেহে গভীর রেখাপাত করবে। আরজ আলী মাতুব্বরের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে। এ কারণেই আরজ আলী মাতুব্বরের মানবপ্রেম ও বিজ্ঞানচেতনা আলোকপাত করার জন্য তাঁর যুগ পরিবেশের উপর আলোকপাত করা অত্যন্ত সঙ্গত। যুগমানস তথা স্থান-কাল-পাত্র কতখানি প্রেরণা দানে সক্ষম হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত জরুরী। আরজ আলী মাতুব্বরের ব্যক্তিমানস গড়ে ওঠার ব্যাপারে গ্রহণ, বর্জন ও স্বীকরণ চলছে সারাজীবনব্যাপী। ব্যাপক গ্রহণ ও প্রভূত বর্জন আরজ আলীর চরিত্রে একটি বিশিষ্ট প্রবণতা, যা তাঁর প্রতিভা উন্মেষের কাল থেকে শুরু করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যৌক্তিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান ছিল। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই আরজ আলী মাতুব্বর জগত-জীবনকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবলোকন করেছেন। নিজ মনীষার দ্বারা মুক্তবুদ্ধির আলোকে তা মূর্ত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। আরজ আলী মাতুব্বরের মূল্যায়ণ তথা তাঁর মুক্তবুদ্ধির মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর যুগমানস সম্পর্কে অবশ্যই আলোকপাত করা প্রয়োজন। যুগ-পরিবেশ থেকে তিনি কতটুকু গ্রহণ করেছেন সে বিচারই এক্ষেত্রে মূল কথা নয়। মূল কথা হল যুগপরিবেশ তাঁকে কতখানি আন্দোলিত, উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল সেটাই এখানে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন চরম জীবনবাদী। তাই তাঁর মুক্তবুদ্ধির ভাবনা, চেতনা প্রধানত মানুষের দিকে নিবদ্ধ ছিল। তদুপরি তিনি নিজেকে বিজ্ঞানমনস্ক বলে পরিচয় দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। শোষণ, বঞ্চনা, সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর বিদ্রোহ। তিনি কোনো আধিভৌতিক শক্তিকে মানব জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। মাটির পৃথিবী আর মাটির মানুষই আরজ আলী মাতুব্বরের মনে অসীম মূল্য ও অপার মহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কারণ মানুষকে অনেক সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের প্রকৃত মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আরজ আলী মাতুব্বরের বিশ্বাস মানবজীবন – প্রকৃতি ও স্রষ্টার মতো স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ম্ভূ নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের আবির্ভাব এক চরম বিস্ময়কর ঘটনা। কারণ পৃথিবীতে মানুষ নামের এই বিশেষ জীবসত্তার আবির্ভাব না হলে বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বস্রষ্টার কোনো মহিমাই অভিনন্দিত বা স্বীকৃত হতো না। মানব জীবনকে এত মহিমান্বিত করে বিশ্বের অন্য কোনো মুক্তবুদ্ধির লোক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। জীবনের অন্তর্নিহিত বাণীকে আরজ আলী তাঁর স্বীয় হৃদয়তন্ত্রীর প্রতিটি অণুপরমাণুর অনুরণনের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

সুখ্যাতিসূক্ষ্মভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছেন। যে কারণে তাঁর মানবপ্রেম ও বিজ্ঞান-চেতনা – শিক্ষিতমহলকে শুধু মুগ্ধই করেনি বরং মন ও হৃদয়কে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলেছে।

আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর নিজ ধর্মের কোনো শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা করেননি কখনো বরং ধর্মকে তিনি শাস্ত্রীয় অনুশাসনের অনেক উর্ধ্বে রেখেছেন। মূলত আরজ আলী মাতুব্বরের ধর্মবোধ, জীবনবোধ থেকেই উদ্বুদ্ধ। যে কারণে তিনি ধর্ম ও জীবনকে এক পতাকাতলে সমুন্নত করে অবলোকন করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর কাছে ব্যক্তিজীবন ও ধর্ম জীবনের কোনো বিরোধ সংঘঠিত হয়নি। বরং একটি বৃহত্তর ও অনড় উপলব্ধি সঞ্জাত বিশ্বাসই তাঁকে একটি বিশেষ পথে পথ চলার প্রেরণা যুগিয়েছে। আর সে পথ হলো তাঁর অন্তরেরই পথ – যা মানবতার দিকে ইঙ্গিত দেয়।

আরজ আলী মাতুব্বরের ধর্ম কি? অথবা বলা যায় তিনি কোনো ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর আরজ আলী মাতুব্বরের অনুরাগী বোদ্ধা পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন। তা হলো আরজ আলী মাতুব্বরের ধর্ম বলে যদি কিছু থেকেই থাকে তবে তা হবে তাঁর 'মুক্তমনের ধর্ম', তা মানুষের ধর্ম। তাই আরজ আলী মাতুব্বর বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভাষায় বিজ্ঞানপ্রেমের সপক্ষে যে কথাটি বলার চেষ্টা করেছেন তা হলো সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যত্ব অর্জনের দীক্ষা। তাঁর চেতনায় 'অহং' মুক্ত মানবাত্মার সাফল্যমণ্ডিত রূপই তাঁর ধর্ম সাধনার মূল কথা ছিল। আরজ আলী মাতুব্বর সকল ব্যক্তিস্বার্থ ও বস্তুমোহ হতে নিজেকে সন্তর্পণে সরিয়ে নিয়েছেন এবং সত্যের সাথে একাত্ম হবার সাধনা করে গেছেন। এ কারণেই তাঁর মধ্যে ছিল বিস্ময়কর বিজ্ঞানচেতনা। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা তিনি অনেক উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যে অন্ধ-কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনা লক্ষ করে উদ্বিগ্ন হতেন। তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। তিনি মানুষের জীবনের বাহির আর অন্তর কল্পনায় স্থান দিয়েছিলেন জীবনচর্যা ও মানবপ্রেমকে। তাঁর মতে এ দুটোই ছিল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মূল ভিত। তিনি কোনো পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের উত্তরাধিকারী নন। তিনি যে পথের পথিক তা তাঁর নিজেরই সৃষ্ট পথ। আরজ আলী মাতুব্বরের মন ছিল সর্বসংস্কার মুক্ত। তাই যা কিছু অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাঁর হৃদয় ও মনকে স্পর্শ করেছে সে সম্পর্কেই তিনি আলোকপাত করেছেন। নিয়মের কড়া শাসন ও অনিয়মের উচ্ছৃঙ্খলতাকে তিনি অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছেন। কেননা তিনি জানতেন, লৌকিক সত্যের মধ্যে যেমন মিথ্যাচার থাকতে পারে তদ্রূপ মিথ্যাচারের মাঝেও সত্যের অবস্থান অস্বাভাবিক নয়। তিনি ধর্মের অনেক ঘটনাই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় রূপ দিতে চেয়েছেন। মোটকথা, আরজ আলী মাতুব্বরের ধর্ম 'মানবধর্ম', মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনে যে মানব জীবন তাই তাঁর ধর্মের মূল পরিপ্রেক্ষিত।

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বরের ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গেলে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ জন্ম থেকে ইসলাম ধর্মের প্রেরণা আরজ আলী মাতুব্বরের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে আলোকপাত করতে সহায়তা করেছে; তাঁর প্রথম প্রমাণ আরজ আলী মাতুব্বর সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ধর্ম সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় প্রমাণ তাঁর প্রাণপ্রিয় মায়ের ধর্মীয় চেতনা তাঁকে আপ্লুত করেছে। যে কারণে ধার্মিক মাতার স্মৃতি আগলে রাখার জন্য মাত্র একখানা ছবি তুলতে গিয়ে তিনি সমাজের কাছে অমানবিক আচরণের শিকার হয়েছিলেন, সে দুঃখ ও বিষাদময় ঘটনা তাঁকে যুক্তিবাদী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। উদ্বুদ্ধ করেছে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে। ধার্মিক মাতার ছেলে আরজ আলী মাতুব্বরও অধার্মিক ছিলেন না। মায়ের অবমাননা তাঁকে ভীষণভাবে আঘাত করে। এ ব্যাপারে তিনি কোনো মতেই নিজের সঙ্গে আপোস করতে পারেননি। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন: "মা! আজীবন ছিলে তুমি ধর্মের একনিষ্ঠ সাধিকা। আজ সেই ধর্মের নামেই হলে তুমি শেয়াল কুকুরের ভক্ষ্য। সমাজে বিরাজ করছে এখন ধর্মের নামে অসংখ্য অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো আমার জীবনের ব্রত হয় যেনো কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণ অভিযান, আর সে অভিযান সার্থক করে আমি যেন তোমার কাছে আসতে পারি।

তুমি আশীর্বাদ করো মোরে মা,
আমি যেনো বাজাতে পারি
সে অভিযানের দামামা।"[২]

মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তিনি ধর্মীয় বিধানের প্রবল দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হন। তাঁর মনে এতদিনের লালিত বিশ্বাস, ধারণা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রবল আঘাতে। তাঁর মনে দানা বাঁধলো একটি প্রত্যয়– সত্য বা যুক্তির। এখানেই ঘটে তাঁর সত্যের সন্ধানের হাতেখড়ি। বিষয়সম্পত্তি ও জীবিকার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপন ভাগ্যের নির্মাতা। আরজ আলী মাতুব্বরের সত্যের সন্ধানের পিছনে ছিল এক অন্যতম মহত্তর উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য হলো দেশের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার জাড্যের অচলায়তন ভাঙ্গা। আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন চিরকালীন আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক মনীষী। বিজ্ঞানমনস্কতাই তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বিজ্ঞানমনস্কতা আরজ আলী মাতুব্বরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আধুনিকতার উৎস সন্ধানে। একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ধ্যান-ধারণা সমাজে কিরূপ আমুল পরিবর্তন আনতে পারে, প্রকৃত সাংস্কৃতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারে, এই উপলব্ধি তাঁর মনে বিজ্ঞানমনস্কতার বীজ বপন করেছিল। তিনি দেখালেন কিভাবে বাষ্পীয় যন্ত্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে আধুনিক সভ্যতার ইমারত। কিন্তু এই যন্ত্র-সভ্যতার জন্ম ইউরোপে হলেও এটি শুধু ইউরোপের জন্য নয়। ছোট বড়, স্বাধীন পরাধীন সকল দেশের জন্য এর মধ্যে লুকিয়ে আছে

Dhaka University Institutional Repository

মানব জাতির অগ্রগতির সাধারণ নিয়ম। যে জাতি এই আধুনিক সভ্যতার পথ ধরবে সে-ই এগিয়ে যাবে অন্যকে ছাড়িয়ে।

আরজ আলী মাতুব্বরের কাছে বিজ্ঞানমনস্কতা ছিল যুগচেতনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে বিজ্ঞান চেতনা সঞ্চারিতকরণ ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ কারণে তিনি লাইব্রেরী স্থাপন করেছিলেন। তিনি শিক্ষার মাধ্যমেই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচারে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর কাছে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদ ছিল একই চিন্তার এপিঠ-ওপিঠ। এই যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই তিনি ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল।

আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন ঐহিক ভাবনার অনুসারী। কারণ ঐহিক ভাবনার অনুসারী না হলে বিজ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া যায় না এবং সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষবাদী হওয়া যায় না। 'রেনেসাঁস' এবং 'রিফর্মেশন' আন্দোলনের পর সবচেয়ে উলেখযোগ্য 'বৈপ্লবিক' আন্দোলন ছিল বিজ্ঞান আন্দোলন বা 'বিজ্ঞান বিপ্লব'। মানুষের নিজে ভাগ্য জয় করবার যে প্রয়াস শুরু হয় আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন বিজ্ঞান বিপ্লবের একজন অন্যতম নেতা।

রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন - এই দুই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সফল পরিণতি লাভ করে বিজ্ঞান বিপ্লবের। প্রসঙ্গত উলেখ্য মধ্যযুগে বিজ্ঞান ছিল ধর্মের করায়ত্ত, ধর্মশাসিত, সবই ছিল ঈশ্বর আদিষ্ট। ব্যতিক্রমী ভাবনা মানুষের জন্য ছিল কঠোর দণ্ডবিধির ব্যবস্থা। তাঁদের স্বর্গপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত। ধর্মভীরু, অন্ধবিশ্বাসী মানুষের কাছে স্বর্গপ্রাপ্তিই ছিল ঐহিক জীবনের অন্বিষ্ট ও পারত্রিক জীবনের মোক্ষ। তাই তাঁরা দ্বিধাশূন্য মনে মেনে নিয়েছিল চার্চ-প্রভুদের দেয়া সব প্রাকৃতিক তথ্য ও বিচার। কিন্তু পরিবর্তনশীল কাল ও সমাজে মধ্যযুগের মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল নতুন সমাজ, নতুন মানুষ ও নতুন জীবনাবেগ। জন্ম নিল নতুন শিল্প উদ্যোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, মানুষে মানুষে নতুন যোগাযোগ, নতুন মনন, নতুন চিন্তা, যার ফসল রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন। মুক্তবুদ্ধির মানুষ কিন্তু এই দুই বিপ্লব সংগঠিত করেই ক্ষান্ত হয়নি। 'মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান' এর ধারণা নস্যাৎ করে দিয়ে নতুন করে আবির্ভূত হলেন এমন সব মানুষ যারা স্বর্গটাকে দাঁড় করালেন ভূমির উপর। আরজ আলী মাতুব্বর এদেরই একজন।

আরজ আলী মাতুব্বর এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছাড়া তিনি কোনো কিছুকেই গ্রহণকরতে অনিচ্ছুক ছিলেন। জগৎ ও জীবনকে তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাই তাকে বাস্তববাদী দার্শনিক হিসেবে আক্ষায়িত করা যায়। নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে প্রচার করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর সমাজ সংস্কার – তাঁর জীবন দর্শনেরই বহির্প্রকাশ, তাঁর মানবতাবাদেরই বলিষ্ঠ প্রয়োগ। এ সমাজ সংস্কারই

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে এক মহান বিপ্লবী করে তুলেছে। তাঁর বিপ্লব কোন সশস্ত্র বিপব নয়। এ হচ্ছে মননের বিপ্লব, আর এর অস্ত্র হচ্ছে মানবপ্রেম ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন। আরজ আলী মাতুব্বরের এ বিপ্লবী চেতনা শুরু হয় মায়ের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

আরজ আলী মাতুব্বরকে মানবতাবাদী ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী হিসেবে অবিহিত করা যায়। মরিস শ্লিক (১৮৮২খ্রি.-১৯৩৬খ্রি), রুডলফ কারণপ (১৮৯১খ্রি.-১৯৭২খ্রি.) এ, জে, এয়ার (১৯১০খ্রি.-১৯৮৯খ্রি.) ও অন্যান্য যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা যুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান ও বিশ্লেষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনও ছিল বিজ্ঞান ও যৌক্তিকভিত্তির উপর নির্ভরশীল। সেদিক থেকে আরজ আলী মাতুব্বরকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী বলা হয়। আরজ আলী মাতুব্বর যুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মতো তিনি অধিবিদ্যাকে গ্রহণ করেননি বরং তিনিও যুক্তি দিয়ে অধিবিদ্যা খণ্ডন করেছেন। অবশ্য ভিয়েনা সার্কেলের সদস্যদের বহু পূর্বে গ্রীক সন্দেহবাদীরা এবং আধুনিককালে হিউম ও কান্ট অধিবিদ্যার বিরোধিতা করেছেন। এদেরকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের পূর্বসূরি বলা হয় আর এ হিসেবে আরজ আলী মাতুব্বরকেও একজন যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীর উত্তরসূরি দার্শনিক বলা চলে। কারণ তিনিও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মতো অধিবিদ্যাকে যুক্তিহীন বলে বর্জন করেছেন। প্রত্যক্ষের বাইরে কোনো সত্তাকে জানার প্রচেষ্টাই হলো অধিবিদ্যা। প্লেটো, হেগেল, ব্রাডলি প্রমুখ অধিবিদ্যাবিদরা এ পরিদৃশ্যমান জগতের বাইরে পরম সত্তার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মতো আরজ আলী মাতুব্বর এমত পোষণ করেন যে, পরম সত্তাকে প্রত্যয় বা পরীক্ষা করে দেখা বা জানার কোনো উপায় নেই। এর সত্যাসত্য প্রমাণের বাইরে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বস্রষ্টা ইত্যাদি বলার কোনো অর্থ নেই, যৌক্তিকতাও নেই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যেমন সঠিকভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়, ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্পর্কেও ঠিক তেমনি নিশ্চিত করে বলা যায় না। অধিবিদ্যা তাই অর্থহীন এবং অধিবিদ্যক জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা সময়ের অপচয় মাত্র।

আরজ আলী মাতুব্বরের মতের পেছনে নৈয়ায়িক ভিত্তির চেয়ে জীবনের প্রশ্নটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বের কোনো প্রকারেই আপ্তবাক্যকে গ্রহণ করেননি। এ জগৎ কি নিত্য না অনিত্য, সসীম না অসীম, ঈশ্বর আছে কি নেই – এ সব ব্যাপার নিয়ে তিনি কখনো মাথা ঘামাননি। আরজ আলী মাতুব্বর অধিবিদ্যাকে খণ্ডন করার পিছনে দুটো যুক্তি উপস্থাপন করেন। প্রথমত এ ধরনের প্রশ্নে প্রকৃত সত্যকে জানা যায় না। তিনি বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকেই সত্যিকার জ্ঞান বলে মনে করেন। কারণ বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে ধর্মীয় বিধি বিধান প্রত্যক্ষ যা

Dhaka University Institutional Repository

অনুমানসিদ্ধ নয়। তাঁর মতে অন্ধ বিশ্বাসের মাধ্যমে ধর্মকে সন্দেহাতীতরূপে পাওয়া যায় না। এর জন্য প্রয়োজন খাঁটি বিশ্বাস বা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান।[৩] এভাবে তিনি অধ্যাত্মবাদের অসারতা প্রমাণ করেন।

দ্বিতীয়ত সত্যকে জানার প্রশ্নের মাধ্যমে তৈরি করতে চেয়েছেন নিজ ব্যক্তিসত্তা, নিজেকে চিনেছেন তাঁর মুক্তবুদ্ধির আলোকে। তাঁর ভাষায়, 'সত্যকে সঠিকভাবে জানতে পারলে আর সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না। কিন্তু কখনো কোনো কারণে কোনো বিষয়ে সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হলে আবার প্রশ্ন উঠতে পারে।'[৪] এভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে মানবতাবোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন যা মানবকল্যাণের জন্য অপরিহার্য এবং এভাবে দেখা যায় যে, যুক্তির মাধ্যমে আরজ আলী অধিবিদ্যা অর্থহীন বলে খণ্ডন করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরের সবচেয়ে উলেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে জীবন সমস্যার সমাধানে মানুষকে তার নিজের শক্তির উপরই নির্ভর করতে হবে। তাঁর মতে ঈশ্বর বা পরমসত্তা বলে যদি কেউ থেকেও থাকে তা আমাদের জানার ক্ষমতা নেই। এবং যাকে জানা যায় না, জীবন সমস্যা সমাধানের জন্য তার উপর ভরসা না করে আরজ আলী মাতুব্বর নিজেদের কার্যক্ষমতার উপরই নির্ভরশীল হওয়ার কথা বলেছেন। আজকের মানুষের জীবন হাজারো রকম সমস্যায় জর্জরিত। এ সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে অতিজাগতিক সত্তা বা ঐশ্বরিক কোনো শক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়া নিরর্থক। আরজ আলী মাতুব্বরের মতে, আজকের সবেচেয়ে প্রয়োজন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবন ও জগতকে দেখা, বিজ্ঞানের শক্তিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা এবং জাগতিক দিক থেকে মানুষের কর্মশক্তিকে বৃদ্ধি করে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া। আরজ আলী মাতুব্বর নিঃসন্দেহে একজন যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী।

আরজ আলী মাতুব্বর একজন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিবাদমুখর চিন্তাধারায় প্রাণবন্ত ও উদ্দীপিত। মূলত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস হত্যাকাণ্ড ও তাণ্ডবলীলার বিরুদ্ধে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আবির্ভূত হয়েছে এ অস্তিত্ববাদী দর্শন। এ দর্শন ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির এক মূর্ত প্রতীক। দার্শনিক চিন্তাক্ষেত্রে বুদ্ধির ক্ষমতা অস্বীকার করে এ দর্শন যুক্তিবাদী দার্শনিকদের বিরুদ্ধে এনেছে এক বিরাট বিপ্লব। আরজ আলী মাতুব্বর এমনি বিপ্লবী মনোভাবে উজ্জীবিত। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মাচার – ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছিল তাঁর এক বড় প্রতিবাদ। বুদ্ধ যেমন নিজের মুক্তির জন্য নিজেই চেষ্টা করার কথা বলেছেন, বুদ্ধ যেমন মানুষের কাছে যা সত্য– তাই সত্য বলে গ্রহণ করার কথা বলে ব্যক্তিমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কথা বলেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরও তেমনি ব্যক্তিমর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা সর্বাগ্রেগণ্য। ফ্রান্সের বিখ্যাত অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সার্ত্রের মতে প্রত্যেক

Dhaka University Institutional Repository

মানুষই স্বাধীন; প্রত্যেক মানুষের কাছে তার আপন অস্তিত্ব ও সমস্যাই প্রধান ও বড় সমস্যা। তাঁর নিজের ভাগ্য সে নিজেই নির্ধারণ করবে এবং স্বীয় কর্তব্য কর্মের জন্য দায়ী থাকবে। সার্ত্রের মতে, প্রত্যেক মানুষ যদি তাঁর নিজের জন্য নির্বাচন করে এবং তাতে সে সবারই জন্যে নির্বাচন করে। সার্ত্রে আরো বলেন, মানুষ যেটা ভালো সেটাই সে নির্বাচন করে এবং কোনো জিনিসই ভালো না যদি না তা সবারই জন্য ভালো হয়। মানবতাবাদী আরজ আলী মাতুব্বরও মানবকল্যাণমুখী ধর্মের আলোকে মানবতাসম্পন্ন মানুষকে স্বর্গরূপ মাটির পৃথিবীতে নেমে এসে সকল জীর্ণতা ও গ্লানি অপসারণ করে পরিপূর্ণ মানবতায় পৌঁছার আবেদন জানান। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন মানুষ যখন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠে তখন সে অনুধাবন করে পরম স্রষ্টার সৃষ্টিতে সে তুচ্ছ নয়। হেয় নয় বরং শ্রদ্ধেয় মহান। এভাবে আরজ আলী মাতুব্বর নিঃসন্দেহে একজন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক যা মানবতাবাদী দর্শনের মূলমন্ত্র। মানবতাবাদের চিন্তা ও কাজ সর্বদা মানব ও তাঁর পরিবেশের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে। সমাজের অবহেলিত মানবাত্মার মুক্তির লক্ষ্যে আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে মানবতার জয়গান গেয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন মানবতার সপক্ষে একজন উঁচু মানের দার্শনিক হিসেবে। আরজ আলী মাতুব্বর জীবনের সর্বত্রই বিজ্ঞানের অবদান অবলোকন করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, মানবকল্যাণই হলো বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য, মানবতাবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজসহ প্রায় সর্বত্রই সমাদৃত। সপ্তদশ শতকে পাশ্চাত্যে যখন বৈজ্ঞানিক বিপ্লব শুরু হয়, তখন থেকেই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের ছিল প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব। খ্রিস্টান ধর্মযাজকরাই বৈজ্ঞানিক মতের বিরুদ্ধে তীব্র বাধার সৃষ্টি করেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দৃষ্টিভঙ্গি-পবিত্র ধর্মগ্রন্থের পরিপন্থী। ধর্মীয় মতবাদ বিরুদ্ধবাদীদের বিচার শুরু হয় পোপের দরবারে । ফলে জিওর্দানো ব্রুনোকে তাঁর স্বাধীন মতামতের জন্যে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হয়। বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে তাঁর বৈজ্ঞানিক মত প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়। এবং ধর্মীয় বিচারালয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু তারপরও মানুষের স্বাধীন চিন্তা তথা বিজ্ঞানের জয়যাত্রা থেমে থাকেনি।

বিজ্ঞানের সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের কোনো বিরোধ নেই – না দৃষ্টিভঙ্গির, না মতবাদগত। আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন প্রতিভাবান এবং অত্যন্ত বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্ব। আরজ আলী মাতুব্বরের বিজ্ঞান চেতনাকে বিচার করলে দেখা যাবে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব যেভাবে ধর্মের বিশ্বাসের উপর প্রভাব ফেলেছিল, সে রকম কোনো প্রভাব আরজ আলী মাতুব্বরের উপর পড়েনি। কারণ ধর্মের কাছে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ছিল ধর্মীয় পরিপন্থী। কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের দৃষ্টিভঙ্গির বা মতবাদের কোনো বিরোধ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনের ভিত্তি হলো নৈতিকতা এবং মানবতাবাদ। যেহেতু তিনি বিজ্ঞানমনস্ক সেহেতু তিনি শুধু জনশ্রুতির ভিত্তিতে কোনো কিছুকে বিশ্বাস করেননি, কোনো গুরুর বা ধর্মীয় যাজকদের প্রত্যাদেশকে বিশ্বাস করার কথা বলেননি। বরং তিনি সেটিকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন যা মানবজীবনের পথ প্রদর্শন হিসেবে গ্রহণ করবে; যুক্তি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিখুঁতভাবে অনুসন্ধান করা যায়, যা ব্যক্তির নিজের এবং সকল মানুষের কল্যাণার্থে সহায়ক হবে। এভাবে তাঁর চিন্তা-চেতনায় যে স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক মানুষের প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের রয়েছে সম্পূর্ণ মিল। কোনো কিছুকে অন্ধভাবে বা নির্বিচারে গ্রহণ না করে সবকিছুকে পরীক্ষা ও প্রমাণের মাধ্যমে গ্রহণ করার জন্য যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা আরজ আলী মাতুব্বরের অনন্য কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য। এভাবে আরজ আলী মাতুব্বরের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্তরালে অন্তর্নিহিত রয়েছে তাঁর মানব কল্যাণের চিন্তা-চেতনা।

সুষম ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর। কিন্তু আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে তেমন সুস্পষ্ট কোনো আলোচনা তাঁর দর্শনে ছিলো না। নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কথা বলার জন্য তিনি বিশ্বমানবিকতায় নন্দিত হয়ে থাকবেন। কারণ তিনি বিশ্ব ও সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বদেশ ও স্বাধিকারের চেতনায়। আরজ আলী মাতুব্বর জীবনকেন্দ্রিক ও মানবতাবাদী। স্বাভাবিক জীবন ধর্মে লালিত আরজ আলী তাত্ত্বিক আলোচনা না করে প্রায়োগিক আলোচনায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর ধ্যান ধারণার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষ, মানবকল্যাণ ও মানবপ্রেমের বিকাশ। তিনি মানুষের ক্ষমতা, শক্তি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রায়োগিক মানবতাবাদী বলে আখ্যায়িত করা যায়। আরজ আলী মানবকল্যাণের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রয়োগপদ্ধতির সমর্থনে জ্ঞানানুশীলন ও সত্য আবিষ্কারের কথা বলেছেন। তাঁর লড়াই ছিল প্রচলিত ধর্মান্ধতা ও ধর্মতন্ত্রের বিপক্ষে, ধর্মের বিরুদ্ধে নয়।

এভাবে মানবতাবাদী আরজ আলী মাতুব্বর সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহ করেছেন যাবতীয় অপশক্তির বিরুদ্ধে, ধর্মীয় শোষণের এবং জীর্ণ সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং সমাজের স্তব্ধতা ও মৌনতার বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছেন। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, দেশের জনগণের জীবনের মান উন্নয়ন, নিরন্তর সংগ্রাম, সংঘাত ও প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে আপন জীবনাভিজ্ঞতায় পরিচ্ছন্নবোধ অর্জন করেছেন মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। স্বশিক্ষিত হয়েও জ্ঞানের স্রোতস্বিনী ধারায় ছিলেন অসীম শক্তির অধিকারী। তবুও মানবতার মাপকাঠিতে আরজ আলী মানবকল্যাণে নিজ দেহ ও চক্ষু দানসহ, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত,

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর রচনার জন্য তিনি মানব সমাজকে ঋণী করে গেছেন। তাই হাসনাত আব্দুল হাইয়ের ভাষায় বলতে হয়, আরজ আলী মাতুব্বর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অহঙ্কার ও আত্মতৃপ্তিকে শক্তহাতে নাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন মানুষকে ভালোবেসে, কাজ করেছেন মানুষের মুক্তির জন্য। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে বরিশাল জেলার লামচরি গ্রামে জন্মগ্রহণকারী আরজ আলী মাতুব্বর অনানুষ্ঠানিক ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাব্রতী ধর্মাচারণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করে বিদ্রোহী হয়ে রইলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সে কারণে আরজ আলী মাতুব্বরের মানবতাবাদ অতুলনীয়। মানবাধিকার অর্জনের মহতী সংগ্রামের অগ্রবর্তী বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিকদের মধ্যে তিনি হয়ে রইলেন একজন অগ্রবর্তী সৈনিক।

তথ্য সূত্র :

১. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ জীবনী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ,চতুর্থ সংস্করণ,বৈশাখ ১১৩৭, পৃ. ১৬

২. আইয়ুব হোসেন সম্পাদিত, *আরজ আলী মাতুব্বর, রচনা সমগ্র-১*, পৃ. ৫৪

৩. ঐ, পৃ. ৫৫

৪. ঐ, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আহমদ, ওয়াকিল (সম্পাদিত) : *বাঙালীরচিন্তা ধারা: আধুনিক যুগ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৯০

আজরফ, দেওয়ান মোহাম্মদ : *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০

আহমদ, মফিজউদ্দীন ও মতীন, আবদুল(সম্পাদিত) : *দর্শন পরিভাষা কোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

আলী, মোহাম্মদ (সম্পাদিত) : *আরজ আলী মাতুব্বর: চিন্তা জগৎ নন্দিত*,ঢাকা, ২০০৭

ইসলাম, আমিনুল : *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৮

ইসলাম, আমিনুল : *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪

ইসলাম, আমিনুল : *সমকালীন পাশ্চাত দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯

ইসলাম, আমিনুল : *বাংলাদেশে দর্শনও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশন-সংস্থা, ঢাকা, ২০০৫

ইসলাম, আমিনুল : *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২

ইসলাম, মুহম্মদ সাইফুল (সম্পাদিত) : *বিজ্ঞান বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙাসমাজ*, রেনেসাঁস, কলকাতা, ২০০৬

ইসলাম, মুহাম্মদ সাইফুল (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), : *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ: অক্ষয় কুমার দত্ত*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র,ঢাকা,২০০৫

উমর, বদরুদ্দীন : *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, চিরায়ত, কলিকাতা, ১৯৮৬

করিম, সরদার ফজলুল : *দর্শন কোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১

করিম, সরদার ফজলুল (অনূদিত) : *প্লেটোর রিপাবলিক*, ঢাকা, বর্ণমিছিল, ১৯৭৪

কাদের, আবদুল (সম্পাদিত) : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (প্রণীত), *রোকেয়া রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

কুমার, রায় অমল : *বিদ্যাসাগর ও পরমহংস*, নাভানা পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৬১

কুমার, সামন্ত অমিয় : *বিদ্যাসাগর*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকতা, ২০০৪

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন : *বাঙ্গালির রাষ্ট্রচিন্তা*, ১ম খণ্ড, জি,এ, ই পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন : *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা*, ২য় খণ্ড, জি.এ.ই পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

গুহ, ফুলরেণু : *বাঙালীর সমাজ চিন্তা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭০

গুপ্ত, শুশীল কুমার : *নজরুল চরিতমানস*, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৭৭

গোস্বামী, হরিসাধন : *মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর*, ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা,১৯৮৮

: *মার্ক্সের দৃষ্টিতে মানুষ*, ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা,১৯৮৮

ঘোষ, হিমাংশু (অনূদিত) : *টম বটোমোর: মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব, বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা*, ১৯৯৩

ঘোষ, বিনয় : *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ*, তৃতীয় খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৪

ঘোষ, বিনয় (সম্পাদিত ও সংকলিত) : *সাময়িকপত্রে বাঙলার সমাজ চিত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৯৬৩

চক্রবর্তী , বসুধা : *মানবতাবাদ*, দীপায়ন,কলিকাতা, ১৯৬৭, পৃ-৪৬

চট্টোপাধ্যায়, প্রাণতোষ : *কাজী নজরুল*, শ্রীমতি সুবনা দেবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, হুগলী, ১৯৭৩

চক্রবর্তী , নীরদবরণ : *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস: প্লেটো এরিষ্টটল*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৭৯

চক্রবর্তী, নীরদবরণ : *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, লক, বার্কলি, হিউম*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৭৪

চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র (সম্পাদিত) : *দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মজীবনী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা,১৯৬২

চট্টোপাধ্যায়, ছন্দা (অনুবাদিত) ও,
মুখোপাধ্যায়, তারাপদ (সম্পাদিত) : রাহুল সাংকৃত্যায়ন: *দর্শন-দিগ্‌দর্শন*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১১২

চাকমা, নীরু কুমার : *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা*, বাঙলাএকাডেমী, ঢাকা,১৯৮৩

ঠাকুর , রবীন্দ্রনাথ : *সঞ্চয়িতা* , কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ,ঢাকা,১৯৯৮

দত্ত, অক্ষয় কুমার : *ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়* (প্রথম ভাগ), করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৯৪

দত্ত, অক্ষয় কুমার : *ধর্মনীতি*, প্রথম ভাগ ৭ম মুদ্রণ, ৫ম পরিচ্ছেদ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৮৫৬,

দত্ত, অক্ষয় কুমার : *বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* ২য় খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, ১৯৮৫, কলিকাতা

দাস, স্বদেশরঞ্জন : *মানবেন্দ্রনাথ: জীবন ও দর্শন*, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

দেব, গোবিন্দ চন্দ্র : *আমার জীবন দর্শন*, মলিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬০

পোদ্দার, অরবিন্দ : *রেনেসাঁস ও সমাজমানস*, কলিকাতা, উচ্চারণ, ১৯৮৩

বসু , রাজনারায়ণ : *আত্মচরিত*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৬১

বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ : *বিদ্যাসাগর*, কলিকাতা, কলেজ স্ট্রীট, ১৯৮৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময় : *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর*, সাহিত্য একাডেমী, কলিকাতা,১৯৭১

বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ : *অক্ষয়কুমার দত্ত সাহিত্য সাধক চরিতমালা*-১২, প্রথম খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ,১৯৪২

বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি : *বাংলা পিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ঢাকা, ২০০৩

বিদ্যারত্ন, শম্ভুচন্দ্র : *বিদ্যাসাগর: জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ*, বুকল্যাণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৪

বিদ্যানিধি, মহেন্দ্রনাথ : *শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয় কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত*, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কলিকাতা,১৩৭৬

বিশ্বাস, নকুরচন্দ্র : *অক্ষয়-চরিত*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা,১৯৮৭

ভট্টাচার্য, অসিত কুমার : *অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঊনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম ও সমাজ চিন্তা*, কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০০৭

: *বাংলা নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা*, গ্রন্থজগত, কলিকাতা, ১৯৬৪

মতীন, আবদুল (অনূদিত) : *বার্ট্রান্ড রাসেল: দর্শনের রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০

মাহমুদ, শামসুন নাহার : *রোকেয়া জীবনী*, সাহিত্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৬

মুরশিদ, গোলাম : *বিদ্যাসাগর*, বিদ্যোদয়, কলিকাতা , ১৯৭১

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : *রবীন্দ্রনাথ জীবনী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, চতুর্থ সংস্করণ,বৈশাখ, কলকাতা ১১৩৭

রহমান, আবু তাহা

হাফিজুর (অনূদিত) : *মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১

রায়, প্রদীপ : *বিদ্যাসাগর: সামাজিক ব্যক্তিত্ব* , যুক ট্রাস্ট,কলিকাতা,১৯৮৬

রায়, প্রদীপ কুমার (সম্পাদিত) : *গোবিন্দ চন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*, নিদার্তা প্রেস, ঢাকা, ১৯৯১

রাধাকৃষ্ণাণ, সর্বোপল্লি : *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা এম.সি. সরকার এ্যান্ড কোং, ১৩৬৬

: *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, এম.সি. সরকার এ্যান্ড কোং, ১৩৬৬

Dhaka University Institutional Repository

রায়, তারকচন্দ্র : *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,কলিকাতা

শরীফ, আহমদ : *বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তন ধারা*, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭

সেন, নবেন্দু : *গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭১

সেন, সুকুমার : *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪০১

সুশীল, বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাঙলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ ও নবজাগরণ*, পিরামিড প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৬

সৈয়দ, আবদুল মান্নান : *বেগম রোকেয়া*, আসর, ঢাকা, ১৯৯৬

হক, হাসান আজিজুল (সম্পাদিত) : *কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন*, খানম মমতাজ আহমেদ, মফিজ উদ্দিন আহমদ স্মৃতি সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩

হাই, সাইয়েদ আবদুল : *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ*, (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮

হাই, সাইয়েদ আবদুল : *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ*, (২য় খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮

হারুন, শরীফ : *দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পরিচিতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

হাই, হাসানাত আবদুল : *একজন আরজ আলী*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা,১৯৯৯

হায়দার, গোপাল : *প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর*, অরুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯১১

হায়দার, গোপাল (সম্পাদিত) : *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ*, ২য় খণ্ড, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা

হোসেন , আইয়ুব (সম্পাদিত) : *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০০

হোসেন , আইয়ুব (সম্পাদিত) : *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-২*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৫

হোসেন, আইয়ুব (সম্পাদিত) : *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-৩*,পাঠক সমাবেশ,ঢাকা,১৯৯৭

হোসেন, আইয়ুব (সম্পাদিত) : *আরজ আলী মাতুব্বর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩

হোসেন , আইয়ুব (সম্পাদিত) : *আরজ আলী মাতুব্বর: শতবর্ষে ফিরে দেখা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

হোসেন, কাজী মোজাম্মেল : *কাজী নজরুল ইসলাম এবং জীবনানন্দ দাসের কবিতায় রঙের ব্যবহার বৈচিত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,২০০৭

হারুন শরীফ (সম্পাদিত) : *বাংলাদেশ দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

হারুন ,শরীফ (সম্পাদিত) : *বাংলাদেশে দর্শন : ঐহিত্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, তৃতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

Blackburn,Simon : *The Oxford Dictionary of Philosophy*, Oxford University Press, New York, 1996

Banerjee H.. : *Iswarchandra Vidyasagar*, Sahitya Academy, NewDelhi,1971

Benerjee, Hiranmoy. : *Iswarchandra Vidya sagar, Sahitya Academy*, New Delhi, 1971

Dev, G.C. : *Buddha: The Humanist*, Paraminunt Publisher, Dhaka, 1969

Dutta, Abijit : *Nienteenth Century Bengal Society and the Christian Missonaries*, Minerva, Calcutta, 192.

Dev, G.C. : *Aspirations of the Common Man*, The University of Dhaka, 1963

Dev, G.C. : *Idealism: A New Defence and a New Application*, Dhaka University, Dhaka, 1958

Dev, G.C. : The *Philosophy of Vivekananda and the Future of Man*, Ramkrishna Mission, Dhaka, 1963

Edward ,Zeller. : *Outlines of the History of Greek Philosophy*, Routledge, London, 1931

Flew, Antony : *Hume's Philosophy of Belief*, Routledge and Kegan Paul, London,1961

Hume, David. : *A Treatise of Human Nature*, Penguin Books, England, 1985

Hume, David. : *An Enquiry Concerning Human Understanding*, Collar Book, New York, 1962

Huq, Hasan Azizul . (ed.) : *Works of Govinda Chandra Dev*. Bangla Academy, Dhaka, 1980, *(Aspirations of the Common Man)*

Lamont, C. : *The Philosophy of Humanism*, Frederick Unger Publishing Co. New York, 1965

Landsman, C. : *Thoughts on Humanism*, Simon and Schuster, New York, 1961

Dhaka University Institutional Repository

Mitra, S.C. : *Iswarchandra Vidyasagar*, Ashish Publishing House, Calcutta, 1975

Russell, B. : *A History of Western Philosophy*, Gorege Allen and Union, London, 1962

Russell, B. : *The Autobiography of Bertrand Russell*, Allen & Unwin, London, 1967

Russell, B. : *The Problems of Philosophy*, Oxford University Press, Ninth impression, 1980

Russell, B. : *Logic and Knowledge*, Unwin Hyman, London, 1988

Russell, B. : *Passionate Sceptic*, Allen,London, 1957

Russel B. : *An Outline of Philosophy*, Routlege, London, 1993 (Reprinted)

Runes, D.D. : *The Dictionary of Philosophy*, Philosophical Library, London, 1944 The Encyclopedia Britannica, A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and Genral Information, 11th edition, Volume XX, Cambridge University Press, London, 1911

Stokos, Eric. : *The English Utilitarianism*, Clarenda Press, Oxford, 1969

Stace, W.T. : *A Critical History of Greek Philosophy*, Macmillan, London, 1767

Sidgwick, H.. : *Outline of the History of Ethics*, Macmillan, London, 1767

Sartre, J.P. : *Existentialism and Humanilism*, trans by Phlip Mairet, London, 1970

Sartre, J.P. : *Being and Nothingness*, trans by Hazel. E. Barnes, Philosophical Library, New York, 1965

Thilly, Frank. : *A History of Philosophy*, Central Book Depo, Allahabad, 1973

Tripathi, A. : *Vidyasagar,The Traditional Moderner*, Orient Long-man, New Delhi, 1974

Titus, H. : *Living issues in Philosophy*, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1970

Dhaka University Institutional Repository

Xenophon : *Memorabilia*, trans.,and annotated by Amy L. Bonnette, with an introduction by Christopher Bruell, Coronell University, Press, U.S.A, 1994

প্রবন্ধাবলী

আহমেদ, সালাহউদ্দিন : 'মানবেন্দ্রনাথ রায় ও বাঙালী মুসলিম নবজাগরণ', বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা (সম্পাদিত), *শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, এম এন রায়, পরিবর্তন প্রকাশনী সংস্থা, ঢাকা, ১৯৮৭

আহসান, সৈয়দ আলী : 'এম এন রায় : আমার সাক্ষাৎ', বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা (সম্পাদিত),প্রাগুক্ত,

আনিসুজ্জামান : 'গোবিন্দচন্দ্র দেবের রাষ্ট্র চিন্তা' ওয়াকিল আহমেদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, নবম বর্ষ,দ্বিতীয় খন্ড, সাধারণ সম্পাদক, এসিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯১

ইসলাম, আমিনুল : 'গোবিন্দ দেবের জীবন দর্শন ও সমকালীন মানুষ', প্রদীপ কুমার রায় (সম্পাদিত), *গোবিন্দ চন্দ্র দেব ও জীবন দর্শন*, মিনার্ভা প্রেস, ঢাকা, ১৯৯১

ইসলাম, কাজী নুরুল : 'আরজ আলী মাতুব্বর: জীবন দর্শন', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর: চিন্তা জগৎ*,

উনুর, বদরুদ্দীন : 'মুক্ত মানুষ আরজ আলী মাতুব্বর' আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), আরজ আলী মাতুব্বর: *শতবর্ষে ফিরে দেখা*,

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : বৈশাখ, ১৭৭৭ সকাব্দ, ১৪১ সংখ্যা

তাহাসউদ্দিন মোঃ : 'গোবিন্দচন্দ্র দেবের মানবতাবাদী দর্শন', প্রদীপকুমার (সম্পাদিত), *গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*,১৯৯১

বসু , বুদ্ধদেব : কবিতা (ত্রৈমাসিক পত্র) নজরুল সংখ্যা, দশম বর্ষ, , কার্তিক ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩৫১, নজরুল ইন্সটিটিউট গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত

বেগম ফেরদৌসী : 'মানবতাবাদী দর্শনের আলোকে কাজী নজরুল ইসলাম',*ইতিহাস অনুসন্ধান ২২, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ*,১,উডবার্ন পার্ক, কলিকাতা , ২০০৭

: 'আরজ আলী মাতুব্বর সমকালীন প্রেক্ষাপটে', *কপুলা*, vol xxiv, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭

: 'যুক্তির আলোকে কাজী নজরুল ইসলাম', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ২০০৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

: 'নৈতিকতা ও মানবজীবন' অন্বেষণ, অষ্টম খন্ড ২০০৬, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

ভদ্র, মৃণাল কান্তি : 'বাংলাদেশের দর্শন চর্চা' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা কলিকাতা, ১৩৯২

Dhaka University Institutional Repository

মতীন, আবদুল	:	'ড.*গোবিন্দ চন্দ্র দেবের জীবনদর্শন*', প্রদীপ কুমার রায় (সম্পাদিত),*গোবিন্দ চন্দ্র দেব ও জীবন দর্শন*
মিয়া , আব্দুল জলিল	:	'ডঃ জিসি দেবের স্মরণে,' *দর্শন*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৩৭৯
রায়, প্রদীপ কুমার	:	'গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও কর্ম', *গোবিন্দচন্দ্র দেবের জীবন ও দর্শন*, নিমার্তা প্রেস, ঢাকা, ১৯৯১
সরদার ফজলুল করিম	:	'আরজ আলী মাতুব্বর: আমাদের সত্রেটিস', মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর: চিন্তা জগৎ*
স্বরাজ সেনগুপ্ত, 'বিপদের দর্শন	:	মার্কস ও মানবেন্দ্রনাথ' শরীফ হারুন (সম্পাদিত) *'বাংলাদেশ দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান'*, দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,
হাই, সাইয়েদ আবদুল (সম্পাদিত)	:	*Proceedings of Pakistan Philosophical Congress,1960*
হামিদ, মোঃ আবদুল	:	'গোবিন্দ দেব স্মরণে', *মনন*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
হোসেন, আইয়ুব	:	'সত্যসন্ধানী আরজ আলী মাতুব্বর', আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), আরজ আলী মাতুব্বর: *শতবর্ষে ফিরে দেখা,সময় প্রকাশন,ঢাকা,২০০০*
হোসেন, সেলিনা	:	'সময়ের অগ্রগামি মানুষ' মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর: চিন্তা জগৎ*
হোসেন, আমজাদ	:	'আরজ আলী মাতুব্বর : সর্বহারা শ্রেণির মানসসন্তান' মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর: চিন্তা জগৎ*